"বই মনের খাদ্য। বেশি বেশি বই পড়ুন, মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উত্তরসূরি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে

সন্ন্যাস নিয়ে প্রেমাবেশে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রম করেছিলেন তখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে তাঁর ভোজনলীলার এ চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-বিরচি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

সঘৃত-পায়স নব মৃত্কুণ্ডিকা ভরি ।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ ভরি ধরি ।।
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ লকলকি ।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি ।।
(মধ্যলীলা)

খুব ঘন জালের দুধ, অথবা দুধের পিঠে এই ছিল তৎকালীন বাঙালীর শ্রেষ্ঠ খাবার। আর এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খাবার হল :

র সো মা লা ই

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা : ব্যাঙ্গালোর

উত্তরসূরি

কার্তিক-পৌষ ১৩৮০ ॥ ২১ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ

কবিতাবলী

আলোচনা

প্রচ্ছদশিল্পী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য ॥ ৯বি-৮, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

প্রখ্যাত কবি মণীশ ঘটকের

যুবনাশ্বের নেরুদা

চিলির কবি পাবলো নেরুদার কবিতার অনুবাদ

কবিকণ্ঠ প্রকাশনী
৩২ ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা ৩২

— — — — — —

উত্তরসূরি

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ ।। ২১ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

প্রবন্ধ

কবিতাবলী

সমালোচনা

চিত্রকলা

প্রচ্ছদশিল্পী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য ।। ৯বি-৮, কালীচরণ ঘোষ রোড,

কলিকাতা-৫০

উত্তরসূরি

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮১ ॥ ২১ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

অসীমকুমার ঘোষ ॥ শিল্পবিচার

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী শিল্পকলার বিচার নির্ণয়ে দেখা যায় যে সেখানে কেবলমাত্র শিল্পীদের ভিতর কি কি গুণ বর্তমান থাকবে সে সম্পর্কে বেশী সোচ্চার। আধুনিক কালের সমালোচকদের মতন শিল্পীর কাজেরই কেবল ভাল মন্দ বিচার করা হয় নি। ইউরোপে মধ্যযুগের কলা সমালোচকেরা শিল্পীদের সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখেছেন কিন্তু শিল্পকর্ম সম্পর্কে নীরব।

ইউরোপের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলারসিক এলিক ফয়ারের ইতালির শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আর্ট, যা জীবনকে প্রকাশ করে তা বাস্তব জীবন থেকেও হেঁয়ালিপূর্ণ— সবরকম নিয়ম লঙ্ঘন করে, যেমন জীবনেও তা ঘটে থাকে।' তিনি আর্টের সার্বজনীনতার ভাব প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তিকালে ভিক্টোরিয়ান যুগে কলারসিকগণ শিল্পীদের কাজের দোষ গুণ বিচারের পন্থা দেখাবার চেষ্টা করেন। এদের পথ অনুসরণ করে পরবর্তি যুগে বিখ্যাত কলাসমালোচকগণ ক্লাইভ বেল, রজার কে, গর্ডন, ম্যারিওটি, হার্বাট রীড প্রভৃতির শিল্প-আলোচনার উপর শিল্পীদের মান মর্য্যাদা নির্ভরশীল। ফলে দেখা যায় শিল্পীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য এই সমস্ত শিল্প সমালোচকদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন। তাই লক্ষ্য করা যায় যে আধুনিক শিক্ষা-গর্বিত সমাজ শিল্পীদের রচনার বিচার নিজেরা করেন না, এঁদের নির্ভর করতে হয় সমালোচকদের বিচার বুদ্ধির উপর।

বর্তমান কালে শিল্প বিচারকদের মনোবিজ্ঞানের দ্বারা শিল্পী ও শিল্পকলার বিচার করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই যে শিল্পবিচার এর দ্বারা একটা কথা মনে

হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে এতে রসতত্ত্বের দিক থেকে শিল্পবিচার বাধা পাচ্ছে অথবা বলা যেতে পারে রসতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পবিচার প্রাধান্য লাভ করছে না। ইউরোপে শিল্পীদের প্রতিকৃতির হুবহু অনুকরণ এবং ঐতিহ্যের সকল গুণই আর্টের পক্ষে এক কালে প্রশংসা পেত কিন্তু এখন অনুকরণ এবং ঐতিহ্যের সকল গুণই আর্টের পক্ষে প্রতিকূল বলে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ রেঁণেসাস যুগে হুবহু অনুকরণ শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির সম্মান অর্জন করত।

এর কারণ বোধ হয় ফটোগ্রাফীর আবিষ্কার। ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) পর আর্টের চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। স্বাভাবিক জীবন্ত করে শিল্প সৃষ্টি করার রেওয়াজ শেষ হয়ে গেল। ক্যামেরা নিল তার ভার। এর পর শিল্পীরা শুরু করলেন নতুন করে ছবি আঁকার পদ্ধতি। এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেন যে ছবি একটি সমতল পট-ক্ষেত্র যাতে কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে রং মেশানো হয়ে থাকে। এই নতুন শিল্প সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখা যায় যে শিল্পসমালোচকদের মতানুযায়ী প্রিমিটিভ আর্ট [অর্থাৎ অর্বাচীন] — বায়জান্টাইন আর্টেও ঠিক একই জিনিষের প্রতিফলন দেখা যায়। অথচ লক্ষ্য করা যায় আধুনিক চিত্রে এই প্রিমিটিভ বা অর্বাচীন পন্থাকে অনুসরণ করা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্য কথা বলতে কি শিল্পের রসবিচার করতে হ'লে শিল্পীর কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য, মৌলিকতা, চিরস্থায়ী গুরুত্ব সম্পদ এবং অংকন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এগুলি বিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত। আর্টের সহজ বিচার বৈজ্ঞানিকদের মত কাটা ছেঁড়া না করে যদি রসতত্ত্বের সন্ধান করি তা হ'লে দেখা যাবে যে বর্তমানে ইউরোপে বৈচিত্র্যের নামে প্রাগ-ঐতিহাসিক শিল্পের ব্যর্থ অনুকরণের ফলে কোন রকম মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় না। স্থায়িত্ব সম্পদ

বলতে কিছুই পাই না কারণ শিল্পীর মধ্যে ইমাজিনেশন জোরালো না হওয়ায় ছবি দেখার পরই তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হয়। এ ছাড়া অংকন রীতিতে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা অংকন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাহাদুরী দেখানো হয়ে থাকে অর্থাৎ নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা কসরৎ দেখানোর চেষ্টা। রেখা ও রঙের বা অন্য মাধ্যম দ্বারা চিত্রকে বলিষ্ঠ করে তোলবার চেষ্টা রয়েছে। উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলির দ্বারা স্বভাবতই মনে হওয়া স্বাভাবিক শিল্পকে বিজ্ঞানের সোপানে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নানা প্রকার আকারের কারখানা করবার পরীক্ষা চলছে, শিল্প সৃষ্টির যে মূল আদর্শ রস রচনা এবং তারই মাধ্যমে যে শিল্প-পরিকল্পনা হওয়া উচিত সেই আদর্শ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাই দেখা যায় যে শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিষয়বস্তু যা বর্তমানে গৌণরূপে প্রতিভাত হচ্ছে অথচ এর বদলে আকারের বিভিন্ন কর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে; অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে শিল্পকে তাত্ত্বিক বা নান্দনিক ভাব থেকে দূরে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রকরণকে বড় বেশী মূল্য দেওয়া হচ্ছে।

সত্যিকার ললিতকলায় যা থাকা উচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তাধারা, বিন্যাস-ভেদ অর্থাৎ কমপোজিশন ও রস বিচার। কিন্তু এ বিষয়ে খুব বেশী মূল্য না দেওয়ায় আধুনিক চিত্রপদ্ধতি হ'ল খুবই সহজ। তাই আমরা দেখতে পাই বৃদ্ধবয়সে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করলেন এই আধুনিক পন্থায়। তিনি ছবি আঁকার সময় উৎসাহিত হয়ে বলেছেন, 'রূপের ছন্দময়তাই রূপের চরম প্রকাশ'; অন্যত্র বলেছেন, 'পড়েছি আজ রেখার মায়ায়। কথা ধনীর ঘরের মেয়ে, অর্থ আনে সঙ্গে করে, মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর। রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা, তার সঙ্গে আমার যা ব্যবহার সবই নিরর্থক। কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন। রেখা আমার যথেচ্ছার হাসি, তর্জ্জনী তোলে না।' রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধবয়সে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে চিত্রকলার আলংকারিক রীতির কথা বলেছেন

যথার্থভাবে, কিন্তু তাঁকে যদি ললিতকলার চর্চা করতে হ'ত তখন তিনি দেখতে পেতেন যে মুখরা ভাষার মন রাখতে তাঁকে যে চিন্তা করতে হয়েছে তেমনি রেখাকে চিত্রকলায় বিষয়বস্তুর ভাবসম্পদে মুখরা করতে হ'লে কেবলমাত্র চিন্তা নয় কঠিন শিক্ষা প্রয়োজন। তাঁর ছবিতে রসাবেশ বা ভাবস্ফূর্তির প্রয়োজন ছিল না—তিনি এঁকেছেন আলংকারিক ভাবের ছবি তাই তাঁর যথেচ্ছাচারিতা সম্ভব ছিল। তাঁর চিত্রের মধ্যে রঙের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে, কৌতুকের আমেজ দিয়েছে—কথা বা ভাবরস প্রকাশ পায়নি। ললিতকলা সম্পর্কে ভারতীয় রস বিচারের প্রকাশভঙ্গির অভাব তাঁর ছবির মধ্যে সুস্পষ্ট।

শিল্পবিচারে একথা অনস্বীকার্য যে শুধু আকার বা রং চিত্রকলার শেষ কথা নয় এমন কি প্রাথমিক কথাও বলা যায় না। বরঞ্চ গৌণ দৃষ্টিতে বিচার করা চলে। শিল্পবিচারে প্রাথমিক পর্যায় হ'ল বিষয়-বস্তু; জোরালো বিষয়বস্তু যদি প্যাটার্ণের মাধ্যমে সুষ্ঠু রূপে প্রকাশ পায় তবে সেই শিল্পসৃষ্টি হবে সার্থক, অন্যথায় কেবলমাত্র প্যাটার্ণের মধ্যে ললিতকলার সার্থক সৃষ্টি অপ্রকাশ রয়ে যায়। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। ললিতকলায় যদি বিষয়বস্তুকে মূল্য দেওয়া যায় তা হ'লে দেখা যায় যে শিল্প একঘেঁয়েমি কাটিয়ে উঠেছে। কারণ বিষয়বস্তুর সংযোজনে দেশের প্রকৃতি, মানুষ, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি এসে পড়ে; ফলে শিল্পে বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কাব্যের ছবি ফোটাতে যে শব্দচয়ন ও বাক্য-সংযোজন প্রয়োজন শিল্পী তাঁর পরিকল্পনা ক্ষমতায় কয়েকটি রেখা ও বর্ণনায় সেই কাজ সহজেই সম্পন্ন করেন। ছবিতে অল্পপরিসরে বিষয়বস্তুকে ফোটাতে হয়। কাব্যের প্রয়োজন বহু বাক্য প্রকাশের দ্বারা।

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ললিতকলায় প্রত্যেক দেশের সাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে। অথচ ললিতকলায় বর্তমানে যে প্রিমিটিভ আর্টের প্রতি-ফলনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে ভাল মন্দের তারতম্য

বিচার করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ললিতকলায় রসাবেশ আনে কিন্তু প্যাঁটার্ণ-সর্বস্ব চিত্র কেবলমাত্র মূকের মতই চেয়ে থাকে।

রসতত্ত্বের দিক থেকে এ দেশের ললিতকলার সঙ্গে অন্য দেশের ললিতকলার তুলনামূলক বিচারে সমকালীন চিত্রকলা ও তার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ইউরোপের মধ্যযুগের চিত্র-কলার (বায়জান্তাইন) সঙ্গে যদি ভারতীয় মধ্যযুগের চিত্রকলার আলোচনা করি তা হ'লে দেখা যায় যে উভয় দেশেই সমকালীন চিত্রকলা প্রধানত: মননধর্মী, বায়জান্তাইন আর্ট কেবলমাত্র মনন সর্বস্ব হওয়ার দরুণ তার আর্ট কনভেনশনাল হয়ে পড়েছিল; ফলে স্বাভাবিকত্ব হারিয়েছে। অপর দিকে ভারতীয় মধ্যযুগের চিত্রাবলী মননধর্মী হলেও রসাবেশ আরোপিত হওয়ার ফলে একটা স্বাভাবিক ভাব ও নান্দনিক সৌকর্য্য ফুটে উঠেছে।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার খসড়া দেখলে লক্ষ্য করা যায় শিল্পীর খসড়া রচনায় রেখার বাহুল্য নেই; যতখানি সম্ভব সংযত রেখায় ছবিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রগুলির খসড়া লক্ষ্য করলে অংকন দুর্বলতা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চিত্র যদি প্যাটার্ণ-সর্বস্ব হয়ে উঠে সেখানে হয়ত প্রয়োজন নানারকম রেখার খেলা বা অংকনরীতির সৌকর্য্যসাধন, জনদৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্য। নানারকমের অংকন পদ্ধতির ভেল্‌কিবাজির জোর দেখানো, প্যাটার্ণ আঁকার কালেই এর প্রয়োজনীয়তা। ললিতকলা ভাবরসের বিশেষ একটি জগতের বস্তু। কবি শিল্পী ফোটান চিত্রকলায় অন্তরের ভাববৈচিত্র্য — রীতিপদ্ধতি এখানে গৌণ।

ললিতকলায় অংকন বস্তুর যথাযথ রূপবিন্যাস ভেদের প্রয়োজন আছে। এই বিন্যাস-ভেদের মধ্যে কোন অবসর বা ফাঁক থাকবে না পুনর্গঠিত করার। কিন্তু আলংকারিক বা আধুনিক নব-আদিম প্যাটার্ণের যে কোন ছবিকে ভেঙ্গেচুরে সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে পুনর্গঠিত করা যায়। বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ বিন্যাস-ভেদে সম্পূর্ণ ললিতকলা একটি পদ্মের মত।

'ফিউচারিষ্ট' ও 'সুরিয়ালিষ্ট' ধর্মীর শিল্পীদের মতে আর্ট অবচেতন লোকের বস্তু আর মানুষের অবসর বিনোদনের জন্যই মাত্র প্রয়োজন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী মনের এই যে অবচেতন অবস্থা এটা সক্রিয় অবস্থা নয়। সচেতন মনই রুচি সৃষ্টি করে ; রুচিতে শাসন নেই —আছে অভিরুচি।

ভারতীয় দার্শনিক বিচারে ভারতীয় আর্টকে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন না। ভারতের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় তার খোলা মনের ভিতর। ভারতীয় আর্টে এর প্রতিফলন দেখা যায়। যথার্থ ভারতীয় আর্ট তাই দুর্বোধ্য নয়। কোন কোন শিল্প সমালোচকদের মতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় যৌনরসের প্রতিফলন খুবই বেশী বলে মনে করা হয়। অথচ অজন্তার চিত্রকলায় 'ধরণীর প্রাণবন্ত ধ্যানকে অজন্তার শিল্পীরা ধরে দিয়েছেন।' ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন মতে মায়াই সবরকম বন্ধন ও বাসনা আনে। এই বাসনা থেকে উদ্ভূত যে স্পৃহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত স্পৃহা চিত্রকর বা ভাস্করের চিত্রকে উদ্ভাসিত ও উল্লসিত করে তাই শিল্পী চিত্র বা ভাস্কর্যের মধ্যে রূপ কল্পনাকে ধরে রাখতে পারে। শিল্পের মধ্যে কেবলমাত্র প্যাটার্ণের কোন অবকাশ নেই। সৌন্দর্যপূর্ণ হবার বহু পূর্বেই আর্টের রূপায়ন হতে থাকে মানুষের মনের মধ্যে এবং তখনই সেটা সত্য হয়। আর মহান আর্ট নিজস্ব সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সর্বদাই অতি-সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, কেননা মানুষের প্রকৃতিকে রূপায়িত করার বিশেষ শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং তা ক্রমে ফুটে ওঠে তার কাজে প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনুসারে।

পাশ্চাত্য কলাসমালোচকদের মতানুসারে বস্তুতান্ত্রিক (অবজেক্টিভ) এবং আধ্যাত্মভাব (সাবজেকটিভ) আর্টে একই সঙ্গে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের দেশে এই ভাবনাটা অন্যপ্রকার রূপ নিয়েছিল। কেননা আধ্যাত্ম (সাবজেকটিভ) ধ্যানে বাস্তবের (অবজেকটিভ) রূপ দেন আমাদের দেশের শিল্পীরা। মডেল বসিয়ে

তার বাস্তব রূপ দেবার প্রথা ভারতীয় আর্টে ঐতিহ্য ছিল না এই খানেই ছিল ভারত শিল্পের আদর্শ।

আর্টে অভিনবত্ব দেবার শক্তি বিজ্ঞানের মত বাইরে থেকে পরীক্ষা করে আহরণ করতে হয় না। আর্টের বেলা আহরণ মানে অনুকৃতি, মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় না। অভিনবত্বের মৌলিকত্ব শিল্পীর ভিতর জাগে তার মনে প্রসাদগুণ জাগলে। সৃজনীশক্তির মধ্যে ওজ ও মাধুর্য্যের ভাব তখনই আসে যখন সৃষ্টিকর্তা নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারেন। অহং লয় হলে শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন; অহংকার সকল রকমের বিজ্ঞাপনী শিল্পের গুণ। নিরহংকারিত্ব ললিতকলার গুণ। প্রকৃত শিল্পী ছবি এঁকে খালাস— তিনি নিজের কাজের গুণ ব্যাখ্যা করে বেড়ান না।

ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে দেখা যেত যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যে-ভাব উপলব্ধি করেছেন সে উপলব্ধির ভাব ফোটানোর জন্য অনেক সময় রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এই রূপক পন্থায় দেব-দেবীর প্রতিমা রচিত হ'তো এবং রেখা বর্ণ যোজনায় প্রকট করা হত নানা অর্থ। অজন্তার চিত্রাবলী যারা দেখেছেন সেখানে দেখা যায় যে রাজা পরিজনবর্গসহ সুখাসীন ভাবে সভা উজ্জ্বল করেছেন, নর্তকীরা গীতবাদ্যে সভা মুখর করে তুলেছে— তার ভিতরও প্রত্যেক মানুষের মুখে এক বেদনা-বিধুর ভাবাবেশ মণ্ডিত আছে— যেন তাদের মন ইহজগতে নেই; অন্তর্জগতে কোথাও লীন হয়ে আছে। একটি অহেতুকী শান্ত ভাব এই সব ভিত্তিচিত্রে ফুটে উঠেছে। ভারতীয় কলা-শৈলী বহু যুগের চিন্তাপ্রসূত ব্যাপার। এর মধ্যে ধর্ম, দর্শন, মনন সব কিছু মিলিয়ে এর সম্পূর্ণতা, অপর দিকে ইউরোপীয় চিত্র-শৈলীতে অস্থিরতার ভাব প্রকট এবং এই অস্থিরতা ক্রমে বেড়েই চলেছে আর আমাদের দেশের শিল্প আন্দোলনে এর ঢেউ এসে পড়েছে। ফলে এদেশের বর্তমান-শিল্প সৃষ্টির মধ্যে অস্থিরতার প্রসার ক্রমে বেড়েই চলেছে; এর পরিণতি কোথায় কে জানে।

একথা ঠিক সত্যকার শিল্পে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশের সুযোগ নেই। কেননা রূপের মধ্যে ছন্দ বা ঐক্য রয়েছে। রূপের ছন্দ-ময়তাই আর্টের সংযত শৃঙ্খল। অতিরিক্তকে ছন্দ গ্রহণ করে না— বর্জন করে। এই শিল্পই গতিময় করে তোলে। তাই যেখানেই ছন্দ সেখানেই সুশৃঙ্খল। শিল্প সৃষ্টিতে রূপককে বিকৃত করলেই ছন্দ পতনের সম্ভাবনা। রূপ, ভাব ও লাবণ্য সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত আছে— শিল্পী ও কবি সেগুলিকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে সাজিয়ে তোলেন। এই ছন্দ ভাব রসের চিত্রকলায় বিশেষ ভাবে উল্লিখিত বস্তুকে সঞ্জীবিত করে।

শিল্পের রস বিচারে এটাই শেষ কথা যে কোন শিল্পীকে বাধা পথ কেউই বলে দিতে পারেন না। শিল্পী উপলব্ধি গুণে যেরূপ ভাবে রসাবেশ পরিবেশন করবেন তাই সকলকে গ্রহণ করতে হবে। যে শিল্পী সাত্ত্বিক প্রকৃতির তাঁর হাতে শান্ত করুণ ও বাৎসল্য ভাবের বিষয়বস্তু-সম্পন্ন শিল্প সৃষ্টি হবে। যিনি রাজসিক ভাবাপন্ন তিনি বিজ্ঞাপনী শিল্পে, অর্থকরী নিসর্গ চিত্র বা প্রতিকৃতি চিত্র সম্পর্কিত শিল্প সৃষ্টি করবেন এবং তার ভিতর বীর, শৃঙ্গার ও হাস্যরস ফুটে উঠবে, আর শিল্পী যদি গর্বিত ও তামসিক ভাবাপন্ন হন তবে তিনি সৃষ্টি করবেন অদ্ভুত রস ও রুদ্র ভাবাপন্ন শিল্প।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের নবীন শিল্পীরা তামসিক প্রকৃতির আর্টে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যস্ত। তারা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিল্প সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ শিল্পে বৈজ্ঞানিক ভাবের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পন্থার দ্বারা আর্টে নতুনত্ব আনা হয়ত সম্ভব— মৌলিকতা আনা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের ফলাফল লক্ষ্য করলেই এবিষয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অথচ ভারতবর্ষের ট্রাডিশনাল শিল্পবোধের মধ্যে যে জিনিষ আমরা পাই তাতে আছে ধ্যান পরিকল্পনার ঐতিহ্য; ধ্যানের দ্বারা শিল্পী সকল বস্তুর ভিতরের প্রাণ-মাধুর্য্য যদি চিত্রপটে ধরে না

দিলেন তবে চিত্রকলার সার্থকতা কোথায়। চিত্রে কল্পনার-মূল্য জানতে হ'লে, ভাবলাবণ্যের কথা আগেই জানা প্রয়োজন। কোন একটি বিষয়বস্তু কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের উদয় হয়। এই ভাব কখন কখন দৃশ্যজগতে ভাল মন্দ কিছু দেখার পর আসে অথবা নিজের জ্ঞান ও শিক্ষাবোধের দ্বারা আবার হয়ত কাব্য পাঠে, সংগীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অথবা অন্তরের মনঃ সংজ্ঞার দ্বারা জেগে ওঠে। এই প্রকার রসভাবই হচ্ছে ইমোশানের নামান্তর। ললিতকলায় এই রসভাব থাকে, প্যাটার্ণ বা কারিগরী তাতে স্থান নেই। এই রসভাবই চিত্রকে কথা বলায়। কোন একটি ভাবরসযুক্ত চিত্রকলা দেখে কবির মনে গীত রচনার প্রেরণা আসতে পারে কিন্তু প্যাটার্ণ দেখে রসভাবের উদয় হয় না।

সেই শিল্পই সার্থক যার মধ্যে আছে শীলগুণ যা সাত্ত্বিক গুণ তার সঙ্গে প্রসঙ্গ গুণের সংযোজন। মনকে প্রফুল্ল করলে তাকে প্রসাদ বলে। শিল্প এই প্রসাদ সাপেক্ষ। শিল্পীকে জোর করে মডার্ণ আর্টের দিকে চালনা করা বা ভারতীয় নিজস্ব শৈলীর মধ্যে আনা সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিল্পীর নিজস্ব সংস্কার ও প্রসাদগুণের উপরই আর্ট নির্ভর করে। যাতে শিল্পী আনন্দ পান।

২

শিল্পের ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য দেশে দার্শনিক বিশ্লেষণের চুলচেরা হিসেবনিকেশ এখনও চলছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব শিল্পের মধ্যে আরোপিত করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। পরিবর্তে বাস্তব ভাব ফোটাবার টেকনিক চেয়েছে; ফলে শিল্প রূপ নিচ্ছে অর্থহীন একটা আকার। সেখানে দেখতে পাই শিল্পের মধ্যে কি চিত্রকলা বা ভাস্কর্যে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং পরিকল্পনা পরিবেশন এগুলি গৌণ হয়ে উঠেছে। চিত্রকরের রূপ কল্পনার স্থান মডার্ণ আর্টে

খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হয়ে উঠেছে। শিল্পের সনাতন রীতির সংগত শিক্ষায় বলিষ্ঠ কল্পনা শক্তি অর্জন করার আর কোন প্রয়োজন রইল না শিল্পের ক্ষেত্রে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে শিল্পের এই যে রূপ এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো প্রয়োজন আছে। বায়জান্তাইন বা গথিক শিল্পে দেখা যায় যে সেখানে শিল্পীরা প্রকৃতিকে প্রকৃত ভাবে ধরে দেখাতে পারেন নি। এর পরবর্তি যুগে অর্থাৎ ইতালির রেঁনেসাসের যুগে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু হ'ল, ফলে আকৃতির সঠিক রূপ দেবার জন্য মডেল প্রথার প্রবর্তন দেখা যায়। এর পর দেখতে পাই এই বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা পারস্পেকটিভ ও আলোছায়া দেখিয়ে হুবহু দৃশ্য অংকনের প্রবণতা। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে যখন উল্লিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করে শিল্প এগিয়ে চলল ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফির আবিষ্কার হওয়ায় হুবহু নকল করার প্রবৃত্তি থেকে শিল্পীরা শ্রদ্ধা হারালো। ফলে নব পরিকল্পনা গ্রহণ করল পাশ্চাত্ত্য শিল্পীরা এবং এতে শিল্পীর কোন পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না।

স্টুডিও আবহাওয়ায় মডেলের আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসা বা দাঁড়ানোর ভাব ফটোগ্রাফির আবিষ্কারের পূর্ব্বে প্রায় সব ছবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ছবিগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ঝোঁক বিরল, আছে এক অস্বাভাবিক ভঙ্গি এবং আড়ম্বরের ছড়াছড়ি। ফটোগ্রাফির আবিষ্কার এর থেকে পাশ্চাত্ত্য শিল্পকে মুক্তি দিল বলা চলে।

পাশ্চাত্ত্য শিল্পে বিষয়বস্তুর বর্ণনা যেটুকু পাওয়া যেত সেটুকু একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে সিনেমা আবিষ্কারের পর। সিনেমার মাধ্যমে যা পরিবেশিত হয় তাকে চিত্রায়িত করলে তা কেবলমাত্র ইলাস্ট্রেশনে রূপান্তরিত হতে পারে, শিল্প বলতে বাধা পাই। পাশ্চাত্ত্য শিল্পে বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে দেখতে পাই খৃষ্টধর্মের নানা ঘটনার বর্ণনা চিত্রায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পেও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অনেক বেশী ছবি আঁকা হয়েছে। গ্রীক

পুরাণ থেকে যে সমস্ত চিত্র দেখা যায় সেখানে প্রতীকের ব্যবহার খুবই কম। ফলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলায় প্রতীকের অভাবে বিষয়বস্তু মুক্ত হয়ে যে শিল্প গড়ে উঠেছে তা কিছুই ব্যক্ত করে না —একেবারেই মূক, তাই পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় যে আধুনিক আর্টের কোন ছবির প্রদর্শনী দর্শকের মনে কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে না। অপর দিকে বলতে পারা যায় চিত্রায়িত বিষয়বস্তু যদি জোরালো হয় তাহলে রসিকজনের মনে চিরস্থায়ী ছাপ থাকবেই। আধুনিক শিল্প কেবলমাত্র দেখাবার জন্য ভাববার জন্য নয়, ভাললাগার জন্য নয়। শিল্প হয়ে উঠেছে এক অবচেতন মনের ভাবকে রং দিয়ে ভরিয়ে তোলবার প্রয়াস—এতে বোঝা বা না-বোঝার কোন ব্যাপার নেই। আধুনিক শিল্পের এই যে পরিণতি এর একটা কারণ হ'ল আণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক এবং যুদ্ধোত্তর সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। ধ্বংসমুখী জগতে সৃষ্টির প্রয়োজনের তাগিদ নেই, পরিবর্তে যা পাই তাকে শিল্প বলে আধুনিক শিল্পীদের চালাবার চেষ্টা থাকলেও শিল্প-মূল্য কতখানি তা কালের বিচার সাপেক্ষ। যুদ্ধোত্তর যুগে দেখতে পাই যে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অধিকার প্রবল হয়ে উঠেছে। এই আত্মচেতনা সব দেশেই অল্প বিস্তর দেখা যাচ্ছে। এই আত্মচেতনায় মন হয়ে উঠেছে অনুশাসনের বিরোধী। এই যে আত্মচেতনার বিদ্রোহী ভাব সমাজে সবাধিক স্তরেই লক্ষ্য করা যায়। তাই শিল্প সৃষ্টিতেও এই বিদ্রোহ সুস্পষ্ট। শিল্পীরা ব্যক্তিগত ভাবে একটা বিদ্রোহ আনতে চাইছেন তাঁদের শিল্প সৃষ্টিতে। তাই দেখতে পাই শিল্পের সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে যে নিয়ম নিগড় ছিল সেগুলি আর মানতে চাইছেন না। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে রসাভাস, সুরুচি, ছন্দ, পরিমিতি বোধ যেগুলি শিল্প সৃষ্টির আদি নিয়ম সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় শিল্পকলার মূল দর্শন হচ্ছে ধ্যান পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব। শিল্প সকল দেশেই ধর্ম, দর্শন এবং জীবনের প্রাকৃতিক

পরিবেষ্টনীর আবহাওয়ায় সেই দেশের বিশেষত্বকে নিয়ে রূপায়িত ও পুষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপটি শিল্পে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। শিল্পের এই যে বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয় বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা। এ ছাড়াও ভারতীয় শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাতে শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এক বিরাট উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে, সেখানে শিল্পের মধ্যে সৌন্দর্য্য, সুষমা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় শিল্প সৃষ্টির আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে শিল্পীদের মধ্যে এই নান্দনিক ভাবে মূল্যবোধ কমে যেতে শুরু করল এবং শিল্প আদর্শকে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে গিয়ে শিল্প সৃষ্টির মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করল, কেবল তাই নয় এই জাতীয় শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পীদের প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করতে পারছে না। আরও লক্ষ্য করা যায় যে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকেরাও এই সঙ্গে এই জাতীয় অবনতির সাথে সায় দিয়ে চললেন।

মনোবিজ্ঞানীর মনোভাব সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছে সত্যি, তথাপি বলতে হয় যে বিপ্লব শব্দটি উন্নততর পরিবর্তনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু বিপ্লব বিরূপ অর্থ সৃষ্টি করেছে। এবং শিল্পেও এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন দেখা দিতে শুরু করেছে। এখন দেখা যায় বিত্তবান, বিকৃত রুচিবানেরাই শিল্পের আসল সমাজদার। সাংবাদিকেরাই এখন উপযুক্ত কলা সমালোচক!

এ কথা অনস্বীকার্য যে কোন দেশের শিল্পে উন্নতি সে দেশের জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতির পরিচায়ক হিসাবে চিহ্নিত। শিল্পের অবনতি জ্ঞান ও ধর্মের অবনতির সূচনা করে। উল্লিখিত বক্তব্যের অনুসরণে একথা বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না যে বর্তমানে সভ্যতার অবনতি (?) ও রুচি বিকৃতি (?) শিল্পের অবনতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়। আধুনিক শিল্পে যে এ্যাবষ্ট্রাক্‌শনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা কতখানি অর্থবহ সে সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ রাখে। ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন যুগে প্রতীক চিত্রের অভাব নেই এবং সেই সকল প্রতীক ব্যবহার মনে হয় শিল্পকে

নিরর্থক করে তোলে নি, বরঞ্চ সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে বলেই মনে হয়।

চিত্তের চমৎকারিত্বের আভাস থেকেই চিত্র সৃষ্টি। চিত্রকলায় মানস কল্পনার প্রাধান্য তাই অনস্বীকার্য। কারণ যিনি শিল্প সৃষ্টি করেন এবং যিনি সেই সৃষ্টি থেকে রস উপভোগ করেন উভয়কেই মনের কারবারি হ'তে হয়। শিল্পী যখন শিল্প সৃষ্টির সময় অভেদ হয়ে নিজেকে বিষয়বস্তুতে লীন করতে পারেন তখনই সার্থক সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। আলোকপ্রাপ্ত মনের দ্বারাই সার্থক শিল্প সৃষ্টি সম্ভব, সেখানে অতিরিক্ত বা অবচেতনার স্থান থাকা উচিত নয়। প্রসুপ্ত মন নিয়ে যে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠবার চেষ্টা চলেছে কালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এবিষয়ে সন্দেহ জাগে। মানসিক বোধ হচ্ছে শিল্পীর শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ শিল্পী চিত্র-পরিকল্পনায় যে মানসবোধের পরিচয় দেয় তার মধ্যে নান্দনিক ভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয়। যে শিল্পীর মধ্যে পরিমিত নান্দনিক ভাব নেই তার পক্ষে বড় জোর রেখা ও রঙের কসরৎ দেখিয়ে একটা কিছু জমকালো রকমের চিত্র গড়ে ওঠা সম্ভব।

উল্লিখিত আলোচনায় আমি কিন্তু একথা বলতে চাইনি যে শিল্পকে সব সময় ঐতিহ্যবাহী হয়ে চলতে হবে। আমার বক্তব্য ঐতিহ্যকে জানতে হবে, তবে তার দাসত্বের প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনের একটি উক্তির অনুসরণে বলা যায়, 'অভিজ্ঞ ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান এবং ঐতিহ্যের মূল্য দুটোই খুব উচ্চ বস্তু। যদি আমরা ঔচিত্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে গিয়ে না পড়ি— যদি ছন্নছাড়া হ'য়ে যথেচ্ছায় ভ্রাম্যমান হয়ে বিচরণ না করি, আর যদি মনঃসংজ্ঞা জাতীয় অভিজ্ঞতা ও সঞ্চিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়, তাতে কেবলমাত্র ঐতিহ্যই আমাদের সহায় হতে পারে। শত শত শতাব্দীর প্রয়োজন একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে এবং স্বল্পপ্রাণ ঐতিহ্য সেই ইতিহাস থেকে সৃষ্টি হয়; তাই তাকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। কোনো

মানব জাতি তাদের প্রত্যেকের নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা একেবারে নতুন করে গড়ে উঠতে পারে না। আদিম মনোভাবকে তাই প্রত্যেকের প্রমাণ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, বিশ্বাসও জমা আছে, যা থেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি সকল কালে। কিন্তু ঐতিহ্যকে জানা এক কথা আর তার দাসত্ব করা অন্য কথা। কালের গতির সঙ্গে নিয়তই পূর্বগামীরা আমাদের আরও উর্দ্ধগামী হবার সহায়ক হ'ন। ঐতিহ্যের দ্বারাই আমরা মানব ও ঐশ্বরিক বিষয় নিয়ে আরো স্পষ্টভাবে কল্পনাকে নিয়োজিত করতে পারি।' শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কেবলমাত্র ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে' মহৎ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। পুরানো ঐতিহ্যের অনুসরণের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি প্রকট হয়। শিল্পে মৌলিক পরিকল্পনা এই কারণে একান্তভাবে আবশ্যক। প্রাচীনের অনুসরণ শিল্পে ধর্মচ্যুতি ঘটে অথচ এটাও সত্য প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা দেশের ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তার অনুকরণ না করে মৌলিকতা দেখিয়েছেন। ঐতিহ্যের মূল বীজকে নব কলেবরে নবীনত্ব দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে চাই প্রাচীন সারবাণ অভিজ্ঞতাকে বিচার করে গ্রহণ করা, নবীনতার দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে দেশের ঐতিহ্য উপেক্ষা করলে দেশের সংস্কৃতির অবমাননা করা হয়। ঐতিহ্যের প্রকৃত অর্থই হল পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা। তার অনুপ্রেরণাই কাম্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনার কথা বলা যায়। ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই দেশের আর্টকে দাঁড় করালেন অবনীন্দ্রনাথ নিজে এবং তাঁর শিষ্যদের নিয়ে। প্রাচীন চিত্রকলার মধ্যে দেশের ঐতিহ্যের বা অভিজ্ঞতার বীজ লুকিয়ে আছে একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কেবল তাই নয়, প্রাচীন শিল্পের মধ্যেও তিনি নবীনতার রস খুঁজে পেয়েছিলেন।

মানস নেত্রের দ্বারা শিল্পী সকল বস্তুর প্রাণ মাধুর্য্য চিত্রায়িত

করে সার্থক শিল্প রচনা করেন, পুঞ্জীভূত ভাবপুঞ্জকে এক একটি রূপকল্পনার মাধ্যমে রূপায়িত করে তোলেন শিল্পী। এগুলি হচ্ছে সার্থক শিল্পীর শিল্প বোধ। এখন চিত্রের মধ্যে যদি কল্পনার মূল্যায়ণ করি তবে ভাবলাবণ্যের কথা প্রথমেই মনে আসে। শিল্পী কোন কিছু সৃষ্টি করবার পূর্বে যখন বিষয়বস্তু কল্পনা করেন তখন তার সঙ্গে ভাব যুক্ত হয়; এই ভাবকেই রসভাব বা ইমোশান বলা যেতে পারে। চারুকলায় এই রসভাবই প্রাধান্য পায়, প্যাটার্ণের স্থান সেখানে গৌণ। প্যাটার্ণ দ্বারা অভিনবত্ব আশা করা যেতে পারে, কিন্তু মৌলিকতা হচ্ছে ভিন্ন বস্তু। স্টাইলের অভিনবত্বের পরীক্ষায় শিল্পকলার মূল্য বৃদ্ধি হয় না। অবনীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। 'প্রকরণের সফলতা হচ্ছে সহজকরণ। যে প্রকরণের মধ্যে আর্টিষ্টের প্রকরণ ও ক্রিয়াদির প্রয়াস ব্যক্ত হ'ল, প্রসাদ গুণ পৌঁছাল না সে কাজে প্রসন্ন হ'ল না মনই সেটা দেখে।'

শিল্পীর অংকন পদ্ধতি আয়ত্ত হবার পর সেটা শিল্পীর আর ভুলে যাবার অবকাশ নেই। স্টাইলের পেছনে ছুটে বেড়াবার আর প্রয়োজন থাকে না। এর পর যার জন্য শিল্পীকে সারাজীবন সাধনা করতে হয় তা হ'ল বিষয়বস্তু। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নির্বাচনের ভিতর, পরিবেশনের স্ফূর্তির ভেতর। রসমাধুর্য্যের ভাব প্রকাশের মধ্যে যেমন কাব্যের গুণাবলি প্রকাশ পায় তেমনি চিত্রকলায় তা প্রকাশিত হয়। টেক্‌নিকের বাহাদুরীর প্রয়োজন 'বিজ্ঞাপনী শিল্পে', ললিতকলায় তার কোন প্রয়োজন নেই।

ক বি তা ব লী

অরুণ ভট্টাচার্য

সময় অসময়ের কবিতাগুচ্ছ

১.　শ্লেটে যেমনই ছবি আঁকি
সব আমারই প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়।

ঘুমঘোর থেকে জেগে উঠি, সামনে টাঙানো
বন্ধুর ছবি
অবিকল আমারই মনে হয়।
যেদিকে তাকাই সব
আমারই মতন, সাজপোষাকে রঙিন।

স্বপ্নভঙ্গে মনে হয়
এ পর্যন্ত যত ছবি আমি এঁকেছি সবই
বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে।

২.　মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়
সারাবেলা তোমার বাগানে আমি ফুল ফোটাই।

কখন বসন্ত গেল ফুল ফুটলো না।

তোমার বাগানকে নয়, সম্ভবত তোমাকেই
সাজাতে চেয়েছিলাম।

তোমার বাগান অথবা তুমি
কিম্বা ফুল ফোটাবার মেলা
আমি স্থির করে উঠতে পারি নি, কাকে যে নিশ্চিত চাই

অথচ বসন্ত গেল, ফুল ফুটলো না।

৩. বাইনোকুলারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
নানাবিধ দৃশ্য দেখা যায়
গাছগুলো সামনে ঝাড় হয়ে দুলতে থাকে,
বাড়িটার ঝুলবারান্দা
আমারই পায়ের সামনে চকিতে মিলায়;
সমস্ত দৃশ্যাবলী যেন আমারই করতলে। তাকে ইচ্ছে হয়,
ধরে রাখি চিরকাল।

বাইনোকুলারের পৃথিবী আমার অচেনা, তাই চিনতে পেরেও
তৃষ্ণা মেটে না।

খালি চোখে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে সিগারেট ধরাই,
এবং বাসি খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পড়তে থাকি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

দু'টি কবিতা

এক : মাইরি

হয়তো সেই অসম্ভব কপালই, একটা নয়, দু-দুটো ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে পারব আজ, অর্থাৎ আবার নিঃস্ব হওয়ার আগে, ন্যাবার রোগীর মতো চোখে আশপাশ নিসর্গের দিকে যখন তাকানো এলিয়ে পড়া রুক্ষ মাটির বুকে, এক বিন্দু জল কে বহন করে আনে না-আনে দেখতে ঘাড় ফেরানো, ও নিঃশ্বাস পড়তে থাকবে কামারের হাপর থেকে বেরোনো হাওয়ার মতন, দমকা-দমকা, আগুন-আগুন, এবং যেহেতু ওদেরও টেনে এনেছি আমারই কোমবেব সঙ্গে বাঁধা রজ্জুতে, ঐ যত আড়াই-পয়সার যাত্রার দল, কারুর বগলে এক তারা কারুর কাঁধের পেটিকায় মুখে মাখার রঙচঙ, নানা আকারের তুলি, ও যারাও লাফায়-ঝাঁপায় বেহালা বেজে উঠলেই, যদিও সকলেই হাঘরে-হাভাতে কোটরে-ঢোকা-চোখ, তবুও প্রাণ, এত প্রাণ তাদের শুধু সেই খেল্‌-টার নেশাবই দরুণ, এবং

যাদের জীইয়ে রাখে এই সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আশাও যে হেন মায়ারই সৃজনে পেরিয়ে যাওয়া চলে দুর্ভিক্ষের একটার-পব-একটা গ্রাম, শেষে পৌঁছনো অনিবার্য সবযুর তীরে, সঙ্গীতের সমাপ্তিতে, তাই নিশ্চয় তারাও হাজির হয়েছে, শুধু কে কেমন হাঁপাচ্ছে খোঁজ নেওয়ার আমারই শক্তি নেই।

এই যদি সত্যিই হয় কপাল তো কান পাতলে হয়তো শুনব উৎসাহের অজস্র বেজে-চলা করতালি, দামামা আকাশে-আকাশের গভীরে লুকানো অরণ্যে-অরণ্যে, কিম্বা ঈর্ষার চাউনিও বুঝি কোথাও-কোথাও, এমন-কি ঠোঁটে হাত চেপে কেউ কোথায় অভিশাপের মন্ত্র পড়তেও প্রস্তুত, যেন বলতে "না-না-না, দুটি কেন, একটি ঘাঁটিও নয় আজ ওদের, রাত্রি-রাত্রি-রাত্রি নামুক, শীতে ও সাপের হিস্‌হিস শব্দে জড়ভবত হোক ওদের গোড়ালি," অর্থাৎ উৎসাহ বা ঈর্ষা, দুটোই সমানই থাকতে পারে,

তবু আপাতত আমরা যেহেতু মাতাল সম্ভাবনার মদটিতেই, অন্তত আমার মনে তো সুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা, এই যেমন কোন্ পালাটা করব প্রথম ঘাঁটিতে বা দ্বিতীয়টিতে অন্য কোন্‌টি, সকলের সব পার্ট মুখস্থ থাকবে কিনা বা অসিগুলোতে আশা করি মরচে ধরেনি, এবং সবার উপর, এত ক্লান্তির পরে দু-দুটো পালা একই দিনে কতটা যুক্তিযুক্ত হবে না-হবে।

এক কথায়, অনেক ভয় অনেক আনন্দ অনেক দ্বন্দ্ব-হতাশা, তবু পালার পর পালা শেষ করে যখন পৌঁছোব সরযূর তীরে, অর্থাৎ যদি পৌঁছোই-ই, এবং পৌঁছে যদি ভালো না লাগে, মনে হয় ফেলে-আসা দুর্ভিক্ষের গ্রামগুলো সুখকর না হলেও হয়তো আরো সত্যকারের বস্তু ছিল, তখন কী-অন্ধকারের দাঁত-মুখ-খেঁচানো দানব আমাদের টুঁটি টিপে ধরবেই,

ওরে বাবা, সে-গোলমেলে প্রশ্নটা তো একেবারেই তুলছি না এই যখন, মাইরি, শুধু কী ঘটতে পারে না-পারে সেই আলো-আঁধারেরই ক্ষণ, কারণ আসলে আজকের চলাটাও এখনো আরম্ভ হয়নি।

দুই : ছুতোর মিস্ত্রীর সাধনা

আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানে বিশ্বাস করি বলে ঘরে ঢুকেই হাত ধুয়ে ফেলেছি।

এবং ঢুকেই দেয়ালে তাকিয়ে নিলাম, কোথাও কালির আঁচড় রয়েছে কিনা, বা ধুলোর সামান্যতম কণিকাও মেঝেয় বা ঘ্রাণে, খসখস করছে কিনা গা, চুলকানি বা কুঁচকিতে এতটুকু অস্বস্তি। না, সব পরিষ্কার, ঝকঝকে, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস। দেখলাম তোমার পাতা-আসনটিকে, তোমাকেও, এবং এক-মুহূর্তে মনে-মনে আওড়ে ফেললাম অনেক দিনরাত্রি ধরে মুখস্থ-করা কর্তব্য-অকর্তব্যের পাঁচালিটাকে, এই যেমন কোন্-কোন্ প্রলোভন বর্জন করবই,

কতখানি রিক্ততার শুভ্রতায় আচ্ছাদিত হবে যেখানে যা-কিছু চোখে পড়ে। এবং সবই এক আশ্চর্য আয়ত্তের মধ্যে দেখে প্রসন্নতায় ডগমগ হব কি-হব-না ভাবছি, পরেই যেই মনে হওয়া না-না-না আত্মনিয়ন্ত্রণ এখানেও দরকার, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে সৌম্য যেন ক্রীতদাস জুড়ে বসে কপাল, ভ্রূ তথাগতের।

পরেই তোমার কোলের এদিকে-ওদিকে সযত্নে-বিছানো ছোটবড় তিনটে রকমারি কাঠের-খোপেও তৃপ্ত চোখটাকে একটিবার ঘোরানো, ঝালিয়ে নেওয়া এক-একটা খোপের তল বা ছাদ সমান করায় করাত-হাতে আমার সেই ছুতোর-মিস্ত্রীর সাধনার স্মৃতি, এবং কোন্ খোপে কী ধরাব না-ধরাব সেই সংকল্প, যেমন একটা আমার দুঃখ তোমার দুঃখ, দ্বিতীয়টায় আকাশ-বাতার-পশু-পাখি-ইত্যাদি, তৃতীয়টায় যমজ ভাইবোনের মতো স্বপ্ন-স্বপ্নের মৃত্যু, এবং আরো যেন কত কী-কী আছে সব ভাবব-ভাবতে চাইব, ওল্টাব-পাল্টাব-নাড়ব-গোছাব, এবং তাইতো ঠোঁটে মন্ত্রটা টানারও আগে যজ্ঞারম্ভে হাতটি ধোওয়া।

এক কথায়, এই যখন মুহূর্ত, তখন দাঁড়াও-দাঁড়াও, ঠিক বলছি কি না-বলছি সেটাও তো ভেবে দেখার দরকার, হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক বলছি, অতএব শোনো হে আকাশ-বাতাস-যমজ ভাইবোন পাতা-আসন তুমি তিনটে খোপ,

দ্যাখো দ্যাখো কেমন বেঁকে যাচ্ছে আমার আঙুলগুলো, ধোওয়া হাতে সহসা এ কী কুষ্ঠব্যাধি, পোকা ঘোরে কিলবিল, নাকি অসংখ্য নাগিনীর মতো রক্ত ছোটে খুনেরই ইচ্ছায়, অসহ্য অসভ্য অশ্লীল উন্মাদনা জাগে তোমার যোনিতে পেচ্ছাব করে দিতে, অদম্য ঘৃণায় ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যেতে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির তীরে, নাম-না-জানা অন্ধকারের হাহাকারে, মনে হয় এত বাক্য ভাব-ভাবনা উঃ কী মারাত্মক জোচ্চোর, অনেক দেবে বলে ইশারায় গলির মুখে ডেকে এনে হঠাৎ খুলে দেখিয়েছে তার উপদংশের বিকট পুরুষাঙ্গ—

চেনা-জানা শব্দগুলো তু'খান-তিনখান হয়ে ভেঙে পড়ছে, আমার আর প্রার্থনার সাহস নেই, এবং যারা চিরকাল আমাতে আস্থা রেখেছে, বাড়ী গেলে হেসে কথা কয়েছে, মিষ্টি দিয়েছে, না-না-না, আজকের এমন আকস্মিক ব্যবহারের দরুন তাদেরও কাছে ক্ষমা আমি চাচ্ছি না।

জানি মুখ থুবড়ে পড়ছি নির্ঘাৎ, এই পড়লাম বলে, তারপর আবার চোখ মেলার সময় হবে যখন, দেখব তুমি তখনো আছো কিনা বা না থাকলে নতুন কী-করনীয় ঠিক করি না-করি।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

দুপুরের নদী

চোখে যদি একবার লেগে যায় দুপুরের নদীর সুষমা
বাড়ী ফিরতে রাত হলে, মনে হবে, পথের দুধারে
ফুটে আছে অজস্র টগর।
একঝাঁক সারসের একখণ্ড রুপোলী আকাশ
হবে নিদ্রামগ্ন নীল অন্ধকার ঘর।

নির্ভার

যেখানে রেখেছি হাত, হাত ভ'রে গেছে;
সুখের মসৃণ মুখ ছুঁয়ে আছি বড়ো দীর্ঘ দিন।
মাঝে মাঝে মনে হয় শূন্যে করতল পেতে রাখি;
দুপুরের আসক্তিবিহীন
আকাশ আমাকে নিষ্কাশিত ক'রে নিক্,
নির্ভার শরীরে একা চ'লে যাই সায়াহ্নের
ধাঁরে অপস্রিয়মান অস্পষ্ট পথিক।

ধ্বনিপুঞ্জ

উৎসারিত যত শব্দ সব নাকি সারাদিন শূন্যে ধাবমান?
আকাশ কী ক'রে ধ'রে রাখে
এ বিশাল ধ্বনিপুঞ্জ!
না কি সবি সমুদ্রের মতো
তরঙ্গিত করে বুকে দিনরাত্রিদিন,
মাঝে মাঝে সিক্ত ক'রে আজন্মবধির
নির্মম কঠিন মূক নক্ষত্রমালাকে?

আনন্দ বাগচী

সুখী

একেই কলে সুখী মানুষ শ্যাওলাদামে জড়িয়ে থাকা
স্রোত হারানো প্রাচীন জলে নিমজ্জিত
সুখে দুখে মগ্ন মানুষ, সাত পাঁচে নেই
উল্টোপাল্টা হাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য
সন্ধি বলুন সমাস বলুন আপোষ রফা
চতুর্দিকের হজ্‌বরল উজান ভাঁটায়
পরিচ্ছন্ন সমীকরণ।

আহা লোকটা সুখীই বটে মানিয়ে গেছে
জামায় জুতোয় চোখের মাপে একই আছে
চুলের ডগায় পায়ের নখে উসখুসানি
ঘুমে জাগায় চল্‌তি কথায় কোথাও কিন্তু শ্রিংক করেনি
ক্রীজ ভাঙেনি, পালিশ-ফালিশ রং চটেনি
অ্যালার্ম ঘড়ির ইঁদুর কলে ভোররাত্তির
রোজ সকালে দুধের বোতল, সেফ্‌টি রেজার, মাছের থলে,
দুই নম্বর চায়ের সঙ্গে কাগজ চুমুক
সিগারেটের বন্ধু সুলভ প্রাতঃকৃত্য
পিক আওয়ারের একটু আগে গর্মিভাতে দুটি সেদ্ধ
গিন্নী ভাষ্য টীকা শ্রব্য, আহা তেমন নয়কো খেদ্য
আধলা কানে তারই সঙ্গে আকাশবাণীর রাগপ্রধানী
খনিক পরে দিনের দৌড়, দৌড় শেষে
বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে শখের নাটক।

দিনগুলো

কে আর রেখেছ কানে টুকরো কথা, ক্যামেরাও ভুলে যায়
মানুষের চোখ
দর্পণের চেয়ে কিছু বেশী ধ'রে রাখে না কখনো
তার ছবি
ঝরে যায়, শুধু সাক্ষী ফুটপাথের বন্ধুজনোচিত বৃক্ষগুলি
জারুল বকুল জাম যারা ধ'রেছিল ছাতা রোদে জলে
দিয়েছিল ফুলের স্তবক
সাক্ষী এই কলকাতার টুকরো ভাঙা অসম্পূর্ণ চাঁদ
আমাদের হাসি গল্প হেঁটে যাওয়া
ক্লান্ত হয়ে পথের কিনারে
ঘেরাটোপে মুখোমুখী চায়ের পেয়ালা ছুঁয়ে আকাশ কুসুম
বেহিসেবী দিনগুলো চ'লে গেছে এমনি করে
সন্ধ্যাতারা ভালবাসা মুছে।

মানস রায়চৌধুরী

ব্যক্তিগত বিদেশ

১. দৃশ্য

পাখী কথা বলে অগাষ্টের ডালে ডালে
নীলিমা-মাতাল সব পাখীদের উষ্ণ প্রস্রবণ
তার ঠিক নীচ দিয়ে দেড়শো মাইল বেগে ছুটে যায় ট্রেন
ট্রেনের জানলার ধারে স্তম্ভিত পথিক ভাবে
পৃথিবীর সব পাখী একই ভাষা ঠোঁটে ধরে আছে···

বিস্তৃত গমক্ষেত আর সয়াবীন গুল্ম-এর ভিড়ে বিদেশী বিকেল
সর্বত্রই সবুজের অভিন্ন জটলা
বৈদ্যুতিক তারে পাখী নীলিমার নীল সহচর
দেড়শো মাইল বেগ পথিককে ক'রে তোলে সন্ন্যাসীর মতো
সঙ্গহারা।

এরপর স্টেশনের আগ্নেয় সংকেত
ছাতা খুলে যে বালিকা উঠে আসে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই করিডরে
তাকে মনে হয় এক স্বর্গীয় চিঠির মতো
রৌদ্র নেই, ঘাম নেই, নিকোনো নিপুণ সিঁথি বয়স মাখে নি
স্বপ্নেও মানুষী বুঝি এরকম হয় না, অলৌকিক
দ্রুত ট্রেণ ছেড়ে দিলে আবার পাখীর গান
ঈথারে ঈথারে কম্প্র অনন্ত সচ্ছল
পথিক উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সময় দ্বিখণ্ড করে
ব্যক্তিগত ভূমণ্ডলে ছুটে চলে ট্রেণ।

২. সে

এতো সহজেই হবে সমস্ত দরজা খোলা, নীচে
ঘূর্ণমান জনস্রোত বিপনন কেনাবেচা ইত্যাদি ইত্যাদি·

হঠাৎ থমকে ভাবো কার মুঠো ধরে রাখে চাবি ?
খুলে দেয় কে তোমার সমস্ত দরজা
এই যে ভিন দেশে বসে চলচ্চিত্রে দেখো চলচ্ছবি
কাঁচের আধারে পাও মদির পানীয়
অথবা রসনা ভরে ক্ষুধার অমৃত
সবই তার দাক্ষিণ্যের ফল
যে কোথাও নিজে যায় নি তোমাকে দিয়েছে
ছাড়পত্র — ঘোরো, ফেরো তার কথা একবার
মনে ভাবো স্বার্থপরতায় এই সচ্ছল বিদেশে
মনে ভাবো কার মুঠো ধরে আছে ভ্রামামান চাবি
হঠাৎ খুলেছে দরজা আসা-যাওয়া সবই তার নিহিত নির্দেশে

৩. সংগোপন

যন্ত্রণায় বৃষ্টিপাত হয় রক্তপাত হয় না এখন
এমন সুন্দর দ্বীপ আকাশ উজাড় সারারাত্রি বৃষ্টিপাত হয়
দেওয়ালে দেওয়ালে লাগে জলের মমতা
বালিশ আঁকড়ে ধরে ঘুমঘোরে মমতার আর্দ্র মুখ দেখি।
অসংকোচে ভাবি
সারা সন্ধ্যা যে রমণী সাহচর্য দিলো
তার চোখ এখন ঘুমের মধ্যে কার বাহু খোঁজে
সুনিশ্চিত অন্তরাল — নীতির কুয়াশা ছিঁড়ে
নিশ্চিত আমার সূর্যোদয়
চলচ্ছক্তিহীন ঘুমে বৃষ্টিকে মেশাই আনন্দের
লতাগুল্মে, পাথরে মাটিতে বাজে আসন্ন শরৎ
কণ্ঠলগ্ন থাকা ভালো, তারো চেয়ে ঢের ভালো, ঢের
এমন বুভুক্ষা নিয়ে ঘুমঘোরে একা সংগোপন।

ডবলু. এইচ. অডেন ॥ বিজয় দেব

কোন এক সময় কোন একটি কবিতায় অডেন লিখেছিলেন: 'যা কিছু আমার একান্ত নিজস্ব তা হলো একটি মাত্র স্বর।' সেই স্বর আর ধ্বনিত হবে না ইংরেজী কাব্য জগতে।

১৯৭৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর হৃদরোগের আক্রমণে এযুগের অন্যতম প্রধান ইংরেজ কবি ডবলু. এইচ. অডেন পরলোক গমন করেন। টি. এস এলিয়টের মৃত্যুর পর অডেনই ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে প্রবীনতম। ইংলণ্ডের ইয়রকে ১৯০৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। বৈচিত্র্যময় জীবনে অডেন কখনো অক্স্ফোরডের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আবার কখনো টমাস মানের পরিবারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রাখেন। টমাস মানের কন্যা এরিকাম্যানকে তিনি বিয়ে করেন। অবশ্য কয়েক বছর পূর্বে একদা বান্ধবী এবং পত্নীর মৃত্যু হয়। অডেনের ব্যক্তিগত জীবন চর্চ্চার অবকাশ কম। কারণ তিনি কোথাও সে সুযোগ রেখে যান নি। বরং সর্বক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতেই তৎপর ছিলেন।

গত চল্লিশ বছরের ওপর তিনি যে সব কাব্য সৃষ্টি করেন তার মধ্যে অধিকাংশই উচ্ছ্বসিত, দীপ্তিমান এবং চোখ ধাঁধানো রীতিতে সমুজ্জ্বল। যদিও প্রথমদিক থেকেই তিনি তাঁর কাব্যে যা সম্প্রসারিত করে রাখেন তা হলো সুর এবং মেজাজের বৈশিষ্ট্য। যা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অতি শিগ্‌গীরই অডেনেস্ক বলে পরিচিতি করে তোলে। যদিও তখন থেকেই তাঁর রচনার মধ্যে যে সব বিষয় জড়িত হয়ে আছে তা হলো প্রেম, সংজীবন, মনোহর অবস্থান স্থল, ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা এবং সামাজিক গোষ্ঠী। এই সব মিলেই তাঁর রচনার বৈচিত্র্য এবং উর্ব্বরতা সম্প্রসারিত।

অডেনের কবিতার প্রতি নিজস্ব অভিগমনকে যা মুখ্যত: স্পষ্ট করে তা হলো প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতার অনুভূতি। যদিও প্রথমদিকে তিনি তাঁর কবিতাকে 'হালকা' বলে চিহ্নিত করে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তার সমর্থন খুঁজেছেন। আবার অতি সম্প্রতি দেখা যায় ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করতে। অডেন এখানে কাব্য সম্বন্ধে 'জ্ঞানের অভীষ্ট বস্তু'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং ধর্মীয় এবং দার্শনিক পরিভাষায় তার যথার্থতা আবিষ্কারে তৎপর হয়েও ওঠেন।

কাব্যে 'অনুসন্ধান' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর 'দি ডায়ার্স হ্যাণ্ড' এর ৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: "প্রতিটি কবিতা···হলো নন্দনকাননের অনুরূপ যা মুক্ত এবং নিয়মে, শৃঙ্খলায় এবং গঠনতন্ত্রে যেন ঐকতানে সংযুক্ত। প্রতিটি সার্থক কবিতাই স্বপ্নরাষ্ট্র সদৃশ। আবার দেখা যায় অনুরূপতা অনুকৃতি নয় বরং সেখানে ঐকতানই একমাত্র সম্ভব এবং তা একান্ত শব্দগত।"

সংজ্ঞীবন, মনোহর অবস্থানস্থল সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের যে সব রচনা তা যেন গত চল্লিশ বছরের মধ্যে অডেনের ধারণায় অনেক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। উপরিগত এবং চূড়ান্তভাবে তিনি আবার মতবাদ সংক্রান্ত কবি বলেও চিহ্নিত হয়ে পড়েন। অডেন সেখানে নিষ্পত্তিমূলক প্রক্রিয়া এবং দাবীপূর্ণ বিবৃতির প্রতি আসক্তি বোধ করেন যা সংক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সহজবোধ্য বলে মনে হলেও মূলত: তা নয়।

আবার দেখা যায় অডেনের চিন্তাজগতে 'রাজনীতি থেকে ধর্মীয় ধারণায়' পরিবর্তন। যেমন ফ্রয়েডীয়, মার্ক্সীয় জগৎ থেকে কির্কেগার্ডিয়ান খ্রীষ্টধর্মের মনোভাবে অবগাহন। কাব্য সংক্রান্ত দিক পর্যালোচনা করলে সহজেই চোখে পড়ে যে তিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং অভিমতকে এখানে চিন্তার বহির্ভূত বলে সরিয়ে রেখেছেন। এবং এই ধরনের পরিভাষাও এখানে যথাযথ নয়।

অক্‌স্‌ফোর্ডের স্নাতক কোর্সের ছাত্র অবস্থায় অডেন টি, এস, এলিয়টের রচনা প্রথমে আবিষ্কার করেন। এবং যা অতি দ্রুত এবং স্থায়ীভাবে তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি তখন তাঁর 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড' অথবা 'ল্যাণ্ড, কাট অফ' এর বিশ্লেষণ সুরু করেন। সেখানে প্রত্যক্ষ করেন যে ইংল্যাণ্ড তাঁকে ঘিরে রয়েছে তা যেন সেই ইংল্যাণ্ডের 'মনোরম অস্থান স্থলের' বিরোধাভাস। [১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'পোয়েম্‌স্‌' এর অন্তর্গত]

"এখন ঘরে ফেরো, হে বিদেশী, তারুণ্যের বংশ নিয়ে তুমি গর্বিত,
বিদেশী, আবার প্রত্যাবর্তন করো, বিক্ষুব্ধ করো, ব্যাহত করো;
এই ভূমি, বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগে নিস্পৃহ,
সহযোগী হবে না, অবিভক্তে পরিতৃপ্ত
বহুমুখের জন্য এলোমেলো বরং এখানে সেখানে
তোমার গাড়ীর আলোর রশ্মি শয়নগৃহের দেয়াল অতিক্রম করে
সেখানে নিদ্রিত জাগেনা, শুনতে পাবে বায়ু
অজ্ঞানতা সঞ্জাত সমুদ্র হতে উত্থিত হয়ে
আঘাত হানে শার্সির কাঁচে, এল্‌মের বল্কলে
উত্থানকে প্রাণরস ব্যর্থ করে না, বসন্ত এলেও
কিন্তু কদাচিৎ, তোমারই সন্নিকটে তৃণ থেকে দীর্ঘতর
কর্ণ সিদ্ধান্তের পূর্বাহ্নে বিপদের আভাসে ভারসাম্য রক্ষা করে।"

(অনু: বিজয় দেব)

বিদেশী এখানে মুহূর্তেই যা প্রত্যক্ষ করে তাহলো শিল্প সংক্রান্ত অর্থনীতির গতির প্রতীক যা ধ্বংসের মঞ্চ। মনস্তাত্বিক অস্থিরতাবোধ যেন সেই ধ্বংসের অনুসঙ্গী: সেখানে যে জগতে মানুষ বাস করে তাহলো উদ্ভাবনশক্তিহীন, 'ব্যাহত করা এবং জ্বালাতনকর বিষয়'।

১৯৩০ সালে, প্রকাশিত 'পোয়েমস' এর অন্তর্গত 'পেইড ইন্‌ বোথ সাইডস্‌' এর অডেন নিজেকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেন তা যেন অনেকটা সংকটের ভূচিত্রের উপলব্ধি অভিজ্ঞতা-সদৃশ। এখানে যে উচ্চতা বিরাজমান তা যেন 'বাজপাখী··· অথবা শিরস্ত্রাণ পরিহিত

বৈমানিকের নির্জনতায় নিরীক্ষণের জন্যে। অতি নিম্নে যে বিশ্ব বিস্তৃত সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে ধ্বংসের অস্তিত্ব, ব্যর্থপ্রায় শিল্প, পরস্পর যোগাযোগ-বিহীন গ্রামগুলো, অজ্ঞতা এবং ভীত ব্যক্তি-সত্তা। ঐকতানের প্রতি রয়েছে প্রতিটি একক প্রচেষ্টা, যা সমষ্টিগত দিক থেকে সমাজের অন্তর্ভূক্ত সদৃশ হয়ে পড়ে। সেখানে ব্যক্তি ভালবাসায় আবিষ্ট হয় শান্তিতে যুগ্ম হৃদয় ব্যর্থতায় বিপন্ন বোধ করে। তারপর স্বরের পরম্পরা নিয়ে অংশ গ্রহণকারী অথবা ভাষ্যকার জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পৃথিবী থেকে জেগে ওঠে, বিশ্লেষণ করে, নির্দেশ দান করে। অসুস্থ সমাজের চূড়ান্ত এবং হিংসাত্মক পরিণতির শেষে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

এই কবিতার উৎস যেন ইশারউডের 'লায়নস্ অ্যাণ্ড শ্যাডোর' মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

১৯৩২ সালে প্রকাশিত অডেনের পূর্ণাবয়ব রচনা 'দি ওরেটরস' যেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমনি চূড়ান্তভাবে হয়ে উঠেছে কৌতুকপূর্ণ। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় এই রচনা সামগ্রিক দিক থেকে উপলব্ধির অসাধ্য।

'দি ওরেটরস' পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথমেই প্রস্তাবনা। এই সীমারেখায় ক্রমবর্দ্ধমান শিশুর উপকথাসম ইতিহাস। সরল এবং সুন্দর হলেও সে শিশু। মাতাসদৃশ এবং জন্মভূমিসদৃশ যে প্রতিমা তার প্রতি সে অনুরক্ত। ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে সানন্দে সে গৃহত্যাগ করে কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় সে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর তিনটি বৃহৎ অংশের মধ্যে 'দি ইনিশিয়েটস্' এ প্রাইজ ডে'র বক্তৃতা, বিতর্ক, বিবৃতি এবং আহতদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখিত। অবশ্য সব কিছুই গদ্যে রচিত। দ্বিতীয় অংশ গদ্যে 'বৈমানিকের জর্ণাল'। সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে অংশবিশেষ ছন্দে রচিত। তৃতীয় অংশ 'সিক্স ওডস্' ১৯২৭, ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে অদ্ভুত বৈচিত্র্যের ছন্দে রচিত। তা ছাড়া 'দি কাট্রি রেন' গাথার

রীতিতে সমগ্র কাব্য সুসংবদ্ধ। এখানে আবার দেখা যায় এক বলিষ্ঠ বীরোচিত প্রস্থান।

এই রচনা বাগ্মীদের কণ্ঠস্বরে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে থাকে বিতর্ক, সনির্বন্ধ মিনতি যা উচ্চগ্রামে প্রতিধ্বনিত। এই সব বাগ্মীদের দেখা যায় কোন এক সমতলে যেখানে জনগণের এবং রাজনীতিবিদদের 'আমাদেরই ইংল্যাণ্ড' এসঙ্গে জড়িয়ে পড়তে।

"এবং নিরাবেগ য়ুরোপে মধ্য শরতে
ধ্বংস
ক্রিস্টোফার দণ্ডায়মান, মুখ তার বেদনায় সংকুচিত
অজ্ঞতায় সম্মুখে কম্পিত সে: 'ইংরেজকে বলো'
'মানুষ মাত্রই স্বাধীন'।"

[অনু: বিজয় দেব]

যেসব রচনা ইংরেজ কবি অডেনের খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করে তা হলো ১৯৩৩ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী যেমন 'দি ড্যান্স অব ডেথ' 'এনাদার টাইম'। 'দি স্পেক্টেটর' এ প্রকাশিত তাঁর সমালোচনায়, ফিলিপ লারকিন অডেন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে 'অডেনের শক্তি নিহিত রয়েছে তাঁর সময় এবং স্থানের সঙ্গে চাপা উত্তেজনাকে অঙ্গীভূত করার মধ্যে। তখনই তিনি ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন যখন চাপা উত্তেজনা হারিয়ে যায়।'

অডেন কখনো 'বয়স্কের ভারে পীড়িত কাব্য রচনা করেন নি। বরং এলিয়ট তার কুড়ি বছর বয়সে তা রচনা করেছেন। জীবনব্যাপী গভীর আত্মস্থ অভিজ্ঞতা অথবা সভ্যতা যেন অডেনের কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত; ষ্টীফেন স্পেণ্ডার মন্তব্য করেন: 'তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি যেন অডেনকে নিজের অতীতকে বর্জন করতে সাহায্য করে। অথবা যে কোন প্রকারেই হোক তিনি তাঁর অতি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গের সঙ্গে অতীতের অংশকে গ্রহণ করেন।'

অডেনের প্রতিভা এই সময় কালে যেন খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো। যেমনি বৈচিত্র্যে তেমনি উৎকর্ষতায়। তখন তার দুখণ্ডের কাব্য প্রকাশিত হয়, যেমন 'লুক, ষ্ট্রেঞ্জার'এবং 'এনাদার টাইম'। এবং ক্রিষ্টোফার ইশারউডের সঙ্গে একযোগে চারখানি নাটক রচনা করেন। যেমন 'দি ড্যান্স অব ডেথ,' 'দি ডগ বিনীথ দি স্কিন,' 'এসেন্ট অব এফ সিক্স' এবং 'অন দি ফ্রনটিয়ার'। তাছাড়া দুখানি ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। 'লেটার, ফ্রম আইসল্যাণ্ড' লুই ম্যাকনীসের সঙ্গে এবং 'জার্নি টু ওয়র' ঈশারউডের সঙ্গে রচনা করেন।

'লুক্ ষ্ট্রেঞ্জার' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। সম্ভবতঃ এ ধরনের সাংস্কৃতিক গুণ সম্পন্ন, সার্থক এবং জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ অডেন খুব কমই রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থের সার্থকতার স্পর্শ যেন উৎসর্গপত্র থেকেই চোখে পড়ে:

'প্রত্যক্ষ বিশৃঙ্খলা এবং অসংযম
দুঃসাহসী সীমান্তে—পরাবাস্তব পুলিশ
সত্য কি সঞ্চিত সম্পদ অথবা হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ
কিন্তু যেন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা।'

(অনু: বিজয় দেব)

এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতা বিভিন্ন মেজাজে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত। যেমন দুই বিশ্বের সম্মুখে হাজির হতে হয়—'প্রত্যক্ষ বিশৃঙ্খলা' এবং সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা সেখানে সততা এবং কর্মশক্তির প্রচেষ্টায় তিনি সহজেই কৌতুক রসবোধকে আশ্চর্য ভাবে সংযুক্ত করে রেখেছেন। 'লুক্, ষ্ট্রেঞ্জার' যেন সনির্ব্বন্ধ কামনা থেকে রচিত হয়েছে। তাই যেন মনে হয় অবিরাম ব্যক্তিগত স্বপ্ন থেকে বাস্তবতায়, আশাপ্রদ প্রতারণা থেকে সত্যে। সম্বন্ধ-সূচক অভিলাষী থেকে প্রেমে অনুক্ষণ গতিশীল।

'সমুদ্রের তলদেশে রাত্রি ব্যাপী যাত্রা সুরু
কর্মপ্রবাহ পশ্চিম থেকে উত্তরে সৌধ প্রতিষ্ঠায়।

'এনাদার টাইম' এর বিখ্যাত কবিতা 'সেপ্টেম্বর ১, ১৯৩৯'। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামায় আতঙ্কিত বিশ্ব। এই কবিতায় দেখা যায় অডেনকে নতুন করে। তিনি যেন সর্বহারাদের তীব্র বেদনার অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে যান। এখানে যে সংগ্রাম তা ব্যক্তিগত এবং সাধারণের মধ্যে। এবং কবি সেই সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছেন সংগঠিত ঐক্যতানের প্রতি। তা ছাড়া রচনাশৈলীর সাফল্য যেন সুনিপুণ মন্তব্য এবং বুদ্ধিকে উপস্থাপিত করে। যাকে মনে হয় প্রাক্ বিচারের অভিজ্ঞতা সদৃশ। কিন্তু সেই সঙ্গে যে দূরত্ব গড়ে ওঠে তা হলো কবি নিজে এবং তাঁকে ঘিরে যে বিশ্ব বর্তমান তার মধ্যে। অথচ আশ্চর্যভাবে যে সেতু তৈরী হয় তা হলো স্বর সজ্ঞাতানুযায়ী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্কার।

অডেনের 'দি ড্যান্স অব ডেথ' নাটক মূলতঃ এলিয়টের 'স্যুইনি এগোনিষ্টেস্'র রীতি অনুসরণে রচিত। এর বক্তব্য ঘোষকের প্রশস্তি এবং আকর্ষনীয় মর্যাদার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়ে:

'আমরা এই সন্ধ্যেয় আপনাদের সামনে অবক্ষয়-প্রাপ্ত শ্রেণীর ছবি তুলে ধরছি। তাদের সভ্যরা কি করে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। তা ছাড়া তারা গোপনীয় ভাবে আবার পুরাতনকে কামনা করছে। কারণ সেখানে তাদের অভ্যন্তরে রয়েছে মৃত্যু। আমরা এখানে মৃত্যুকে নর্তকী হিসেবে হাজির করছি।'

> কোরাসের শেষে যেন:
> সত্যনিষ্ঠ হও তোমার আত্মায়। অরণ্যে অবসর গ্রহণ করো
> রক্তের কামনাই একমাত্র শুভ।...
> নর্তকী এখানে সামান্য রহস্যের অভিজ্ঞতার সময় অতিক্রম করে চলে:
> 'নিঃসঙ্গতা থেকে অন্য একাকীত্বে।'

[অনু: বিজয় দেব]

'দি ডগ বিনীথ দি স্কিন' মূলতঃ উদ্ভট কল্পনাশ্রিত বিদ্রুপাত্মক এবং কৌতুক-রসাশ্রিত রচনা। এই রচনা রাজনৈতিক এবং সামাজিক

স্যাটায়ার হলেও 'ভিলেজ অন্ দি হার্টে' এর উপকথার প্রভাবে রচিত। সমগ্র নাটকটি যেন ভূমিকার কোরাসকে নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। এখানে তরুণ নায়ক অ্যালেন নরমান। সে নিরীহ সদুদ্দেশ্যপূর্ণ, পশুর প্রতি বন্ধুত্বপরায়ণ, সরল। সে ভালবাসার সন্ধানে বেরিয়ে দীর্ঘ যাত্রার শেষে দেখতে পায় যে কুকুরটি তার সঙ্গী সে ছদ্মবেশে সমগ্র গ্রামের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

এই ধরণের লোককথার উপকরণকে অডেন তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন।

অডেনের আন্তরিক ধারণায় যে 'সংযত ভালবাসা' তা যেন সৎ মানুষ, সৎ বন্ধু এবং সুব্যবস্থাকেই সৃষ্টি করে চলে। যা একমাত্র উপকথার ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

তারপর, ভালবাস, দাঁড়িয়ে থাক
রূপকথার প্রান্তে
দাবী কর তোমার পুরস্কার।'

অনু ঃ বিজয় দেব]

এখানে ডগ / উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস তার গ্রামের দুর্নীতিকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করে। তা ছাড়া মাননীয় লীডার যে সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা খুব নীচু তলা থেকে। কুকুরের অসূয়ক দৃষ্টি দিয়ে সমাজের প্রতারণা অসারতাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রেমিকদের সবাইকে মার্জনা করা হয়েছে
সব স্বপ্ন মৌলিক মায়ায় সুচিন্তিত
প্রচুর এবং স্বাভাবিক আলোয় পরিভ্রমন
তাদের আংশিক স্বর্গের আনন্দ
আসবাব এবং ঐক্যতানে,
প্রতিটি প্রয়োজন তার ক্ষমতার।'

[অনু ঃ বিজয় দেব]

'দি এসেন্ট অব্ এফ্ সিক্স' উচ্চাকাঙ্ক্ষার নাটক। 'দুই অঙ্কে ট্র্যাজেডি' আন্তরিক ভাবে প্রতিরোধী মানব মাইকেল র‍্যানসমের

ধ্বংসের বর্ণনা এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তরুণ ইংরেজ, খেলোয়াড়, পণ্ডিত এবং দার্শনিক মাইকেল র‍্যানসম—

'এশিয়া মাইনরে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে ককেশাসে উপস্থিত
দ্বিমস্তক শোভিত 'উশবা'র ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন।
'নেন' এর গহ্বরে প্রাচীন বাতচক্র
গ্রীষ্মে কনফুসিয়াস অনূদিত
অবিবাহিত, কুকুর ঘৃণার্হ, বীণা বাজাও
গয়ার ওপর যেন বুঝি বা বিশারদ।'

খ্যাতিমান পর্বতারোহী র‍্যানসম সব আবেদনকারীকে অগ্রাহ্য করে। অবশেষে মায়ের জন্যেই 'এফ সিক্স' আরোহন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ আন্তর্জাতিক সংকটে ইংল্যাণ্ডের মানের প্রশ্ন সেখানে প্রধান। ইংল্যাণ্ডের আশা কামনা, ব্যর্থতা সঙ্গে নিয়ে র‍্যান্‌সম্‌ অনুসরণকারীসহ উঁচুতে ওঠার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। পর্বত শিখরে আবির্ভাব ঘটে সন্ন্যাসী এবং অপদেবতার। তারা তখন মনস্তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। একের পর এক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তারপর র‍্যানসম যখন শিখরের অতি সন্নিকটে তখন যেন মুহূর্ত্তেই অপদেবতাকে দেখতে পায়। যে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে ঘুম পাড়ানী গানের গায়িকা মাতারূপে। এই নাটকটি যেমনি স্যাটায়ার তেমনি ট্র্যাজিক। এখানে যেন ব্রেখ্‌টের কথা মনে পড়ে; 'আমরা আমাদের বৃদ্ধা স্নেহময়ী মাকে হারিয়ে বসে আছি।'

এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে যে র‍্যানসম্‌ মানুষের পৃথিবীর তুচ্ছতাকে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখিয়েছেন যে 'কর্মদক্ষতা' এবং 'জ্ঞান' ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার ছদ্মবেশমাত্র যা দিনের অবলুপ্তির সঙ্গেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'ন্যু ইয়ার লেটার' 'পত্রে' সনেট অনুক্রম দেখা যায়। 'দি কোয়েষ্ট' প্রস্তাবনা এবং উপসংহারসহ রচিত। 'দি লেটার' দীর্ঘ চিন্তাশীল কবিতা।

প্রগাঢ় করো পিয়ানো অথবা সন্দেহে
সব কিছুই আমাদের প্রতিবিম্ব ফেরাও
সাধারণ ধ্যানশীল আদর্শ নমুনা।'

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'ফর দি টাইম বিইংগ' এ নিজের প্রণালী নিয়ে অডেন উভয় সংকটে পড়েছেন। এখানে যেন যিশুর জন্মের খ্রীষ্টের উপদেশাবলীর বিবরণের টীকা। যার মধ্যে সমালোচনার অস্তিত্বের পরিকল্পনা রয়েছে। সুচিন্তিত উদ্বোধী আধুনিকতা এখানে আকস্মিক নয় আবার দুর্ঘটনাও নয়।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'দি এজ অব দি এংজাইটি'র মধ্যে যেন অডেন সেই স্থানীয় পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘটনাস্থল ন্যু ইয়র্কের এক পানশালা। তখন কবি আমেরিকার নাগরিক। এই পানশালা সম্ভবতঃ পলাতক দ্বীপের প্রতিস্থাপন হিসেবে কাজ করে। এখানে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অপসয়মান অনুসন্ধান নিয়ে দেখা করছে কৃত্রিম সঙ্গমস্থলে। পানশালায় মানুষ সাধারণতঃ নিঃসঙ্গতা বহন করে জড়ো হচ্ছে। যেমন 'ব্যারোক একলোগ'।

"যুগমণ্ডল পানশালা সংলগ্ন
সাধারণ দিবসে আসক্ত
আলো কখনো বেরিয়ে পড়েনা
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা অনুক্ষণ থাকে
সমগ্র প্রথা যেন চক্রান্ত করে
বাণিজ্য কেন্দ্রকে গ্রহণ করে
গৃহের আসবাব
দেখা যাক কোথায় আমরা
হারিয়ে গিয়েছি অভিশপ্ত অরণ্যে
শিশুরা রাতের আতঙ্কে ভীত
যারা কখনো সুখী নয় সুস্থ নয়।"

[অনু : বিজয়·দেব]

অডেনের পরবর্তী রচনা 'ননস্,' 'দি শীল্ড অব একিলিস' এবং

'হোমেজ্ টু ক্লিও'। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠায় যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো কবির শিল্পকলা দুর্লভ প্রাচীন বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এবং সেখানেই যেন আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। এখানে দেখা যায় অডেন যেন এক নিপুন প্রয়োগবিৎ। যে অডেন আকস্মিকভাবে কখনোই পেছনে তাকান নি তিনি যেন কখন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্থির হয়ে রয়েছেন—যখন দেখা যায়: 'ওয়ন সেপ্টেম্বর থার্সডে টু ইংলিশ সাইক্লিষ্ট।'

"......তরুণতর
(যার প্রতিভা যে কেউ ধরে নিতে পারে ফলপ্রসু হবে না)
গীর্জার বক্তৃতার টেবিলের জন্য ভগ্নপ্রায় আসন শ্রেণী
বন্ধুকে তার আনন্দে মগ্ন করা—অনুকৃতি যেন
বুঝি বা যাজকের স্বাদবোধে দৃঢ় আবদ্ধ।"

'ধর্মগত' কবি হিসেবে অডেনকে দেখা যায় তিনি যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের লোককথাই বহুল পরিমানে ব্যবহার করেছেন। যদিও তাদের পরিভাষা ভিন্নরূপ। বিভক্ত উদারতা হয়ে ওঠেছে কির্কেগার্ডীয় বিভাজ্য মন রূপে। যার একান্ত কামনা 'উইল ওয়ন থিংশ।' পরিশেষে অনুসন্ধানই তীর্থযাত্রা হয়ে ওঠেছে:

"সেই বৃদ্ধ রাজপথ ছেড়ে দেন
তাদেরই কাছে যারা এর উদ্দেশ্যহীনতা জেনেও কম ভালবাসে না,
যারা কখনো এর ইতিহাসে কৌতূহলী নয়
সুতরাং জেনে থাকলেও বিরত হতো না
ধৃষ্ট এক স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রন যেন অগ্রাহ্য
অস্বীকৃত এর কর্মশক্তি, তারা মুক্ত ভাবে অতিক্রম করে।"

[অনু: বিজয় দেব]

আলোক সরকার

চিত্রকল্প

খরগোসের চেয়ে দ্রুত এই চৈত্রের মরাপাতা
লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ফুর্তি ধরছে না শরীরে
লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ঠিক কোথায় চলেছে ?

বিকেল শেষ হয়ে এলো অন্ধকার গিলে খাচ্ছে দিগন্ত
এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ থাবা গিলে খাচ্ছে বনবাদাড়
অশত্থগাছের উঁচু বটগাছের বিস্তীর্ণ।

লাফিয়ে চলেছে মরাপাতা অন্ধকার চিরে চিরে লাফাচ্ছে
অন্ধকার লাফিয়ে নামছে ঘাড়ে অন্ধকার চিরে দিচ্ছে মরাপাতা
ফুর্তি ধরছে না শরীরে অনিঃশেষ রতিবিহারেয় সময়।

চৈত্রমাসের মরাপাতা আর এই নিঃশব্দ থাবার অন্ধকার
উৎসবেরর নিস্তব্ধ ঘণ্টা ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি দিকদিগন্ত—
লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে লাফিয়ে নামছে নিঃশব্দ থাবা।

লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, ঠিক কোথায় চলেছে ?
শূন্যময় বিস্তীর্ণতায় থমথম করছে অর্থহীনতা—
অন্ধকার লাফিয়ে নামছে ঘাড়ে অন্ধকার চিরে দিচ্ছে মরাপাতা।

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

একা, দোকা, তেকা

একা, দোকা, তেকা,
'রাজার ঘর কিনব বলে'
অন্ধকার জেগে আছ তো ?
কেঁপে ওঠো তো
দেখি কেমন !
চু······কিত কিত, চৌকো ঘরে
ভুবন ঘোরা

ঘর কাটব রাজার ঘরে
অন্ধকার দেহে আছ তো
একাকার—দুঃখ নিয়ে
মন কি বলে ? মন কি বলে

শান্তিকুমার ঘোষ

এ সীমান্ত

লাফ দিয়ে লাল ফুলের সারি,
খাটো চীনা বাঁশের ঝাড়, কাঁটাতার
অনায়াস টপকে
পাবে তুমি কুঞ্জের গোপন :
আপন মনে যেখানে ঘাসের সমান নীচুতে
চিকির মিকির নেমে আসছে
অচিন পাখি, চেনা ভোমরা ;
কুলু কুলু জলের বুক বরাবর
পাথরের উপর
ঊর্ধ্বমুখ পরী তার এক হাতে তুলে ধরেছে
লরেল শাখা।

চিরসবুজ এই কোনটাতে হ'তে পারে বোঝাবুঝি
ছিটকে-আসা দুজনার
বনের মাঝে কি মনের মাঝে
লাগবে তো রাগিনী,
জানা যাবে এই প্রান্তে এত কাছে
কত দূর ছোঁয়া যায়,
এ সীমান্ত—এর বেশী নয় :
দুই দাহ্য অস্তিত্বের
আঙার ছাই হ'য়ে ছড়িয়ে যাবার আগে
শূন্য থেকে মহাশূন্যে ॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

শুধু ছুঁতে গিয়ে

শুধু ছুঁতে গিয়ে স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন
শুধু আগুন আর শীতলতা
কেউ কি জানে
পদ্মের কোরকে ভ্রমর চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত নিয়ে বসে থাকে ;

মুখরিত সৌরভে দীঘি দুলে দুলে ওঠে ;
অসীম আকাশ শুধু আপনার গুণে
অকম্পন ছায়া মেলে ধরে,

দু'হাত বাড়িয়ে ঢেউ অতঃপর
নীল হয়ে যায়॥

প্রদীপ মুন্সী

আয়নার ছবি

আয়নার ছবি সরে সরে যেতে চায়
আমার কুকুর সারা দুপুর একলা ঝিমোয়
রাত্রে বন্য চোখে দেয়ালের চারধারে
সবুজ আশ্রয়ের খোঁজে গজরায়
আয়নার ছবি দূরে থেকে দূরে সরে যায়
জ্যোৎস্নায় নিয়ন্ত্রণ সাদা বালুর বিছানায়
প্রগাঢ় সংগম ডাক দিয়ে টেনে নেয়
মায়াবিনী নীল গাই জলে লুটোপুটি করে
আয়নার কাচ খান্ খান্ হয়ে ভেংগে পড়ে
আমার কুকুর আক্রোশে গজরায়
তোমাকে বলি নি
রোজ রাতে আমার মুখে লোনা রক্ত ঝরে।

আশিস সেনগুপ্ত

ঢেউ তোলে নিস্তরংগ সমুদ্র

এইতো কিছু দিন আগেও তুমি আমাদের কর্মসূচীকে
দানাপানি দিয়ে বলেছ—
বেশ তো শুয়ে থাকবো সারারাত ময়দানে
যথাযথ গুণে দেবো আকাশের তারকামণ্ডলী
কিম্বা মধ্যরাতে ট্রেন ফেল করে হাওড়া ষ্টেশনে
কাটাব সারারাত
মানুষ গুণে টুকে রাখবো খাতায়
তারপর সেই আমাদের চিরকালীন ভোরে
দাঁড়াব গিয়ে হাট করে খোলা হাওড়া পোলের নগ্ন নির্জনে অলিন্দে
এক দুই করে জাহাজ গুনবো ডিঙি নৌকার সারি
কিম্বা খড়ের বিশমনি নৌকা—
কি ভাবে দাঁড় পড়ে দাঁড় ওঠে
ঢেউ তোলে নিস্তরংগ সমুদ্র······

দেবী রায়

বাহিরে থেকে

কেউবা সুখী আর কে যে দুঃখী
বাহিরে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় কি,
ক্লান্ত পদক্ষেপে আমরা যখন বাড়ি ফিরি;
মাথায় তখন হাজারো দুঃখের বোঝা—
প্রায়শঃ করি ভাবের ঘরে চুরি!

কিংবা সুখ, যেনো সেই বর্ষার ফালি হাসি, রোদ
আর দুঃখ'ত গরীব ঘরের আইবুড়ো—
চিরটা কাল খোঁটা খাওয়া, পোড়ার মুখী!!

সরদার আমজাদ আলী

আমার পৃথিবী তুমি

আলো কিংবা রঙ আর রূপ কিংবা বর্ণালী-মিছিল
পরিপূর্ণ এ যুবতী বহুকাল জৌলুসে ঝিলমিল
শান্ত কোন শিবিরের নিভৃতে নির্জন সহবাস
ফুল কুঁড়ি কচি পাতা নীল চোখ সম্ভোগ বিলাস
হাজার বছর ধরে এই ঢেউ কেটে চলে দাগ
জান্তব, জৈবিক কিংবা অত্যন্ত সজীব এই যুবতীর
পূর্ব অনুরাগ
তুমিও হারাবে পথ—কারণ এই শষ্পাকীর্ণ বনে
কোথাও প্রবল রোদ ছায়া কুঞ্জে ঘুঘুর নির্জনে
কখনো মদির চোখে ডাকে কাছে অসহ্য উদ্‌গ্রীব
কখনো প্রচণ্ড ক্লান্ত/ঘৃণ্য কিংবা রিরংশায় বীতশ্রদ্ধ জীব

আলো কিংবা রঙ আর গন্ধ কিংবা বর্ণের সম্ভার
পূর্ণ দেহে ধরে আছে এ যুবতী বহুকাল তার
নিটোল দেহের গন্ধে পথের মানুষ আসে তাই
কারণ এখানে দুঃখ-ব্যথা-প্রেম-স্নেহ শান্তি পাই।

গোকুলেশ্বর ঘোষ

ফাটল

ফুল ফুটবার সময় আকস্মিক পতন
ডবল ডেকার—প্রথম শ্রেণীর টিকিট নিরাপদ—
জঞ্জাল স্তূপ, কিছুতে মানে না মন,
কেমন করে ভীষণ বর্তমান,
আদি ভৌতিক—

নির্মম কাঁটা, স্থিতিস্থাপক,
শ্যাওলা জল, ক্ষয়িষ্ণুতা
আসামী হাজত বাস, মৃত্যুঘন ব্যর্থতা
মানুষের অকৃতার্থ ঘর।

সময়ে ফুটলে সাজান যেত
জীবন্মৃত ঘর—
দুপুর গড়িয়ে যেতে বেলা পড়ে আসে
নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তি, অবসাদ—
বুকের উপর চেপে থাকা নিরেট পাথর
ধৈর্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা—
পারে না আপন করে নিতে
এবং না পাওয়া বেদনা অশ্রুমুখী হতে
পাথর গড়িয়ে পড়ে পাটল।

রণজিৎ দেব

শিশুবৃক্ষ

সোহাগী লতার শরীর দর্পিত দুই হাত শিশুবৃক্ষ

জ্যোৎস্নার পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে প্রলয় প্রয়োধি স্রোতে
শিখর ও শিকড় খোঁজে হাওয়া আর মাটি
নিতান্ত বেঁহুস না হলে ছড়ায় না ধুলো
শাখা প্রশাখায় দেয় না হাত

"মানিকরে কামড়াইছে সাপে" মায়ের কাতর কান্না
বৃক্ষমূলে দারুণ আঘাত
নিতান্ত বেহুস না হলে শিশুবৃক্ষের পিঠ ছিড়ে নেওয়া
"মানিকরে কামড়াইছে সাপে" মায়ের ভিক্ষার হাত

ভেঙে দিচ্ছে সহজতর নদী
দারুণ স্রোতের রাজ্যে
জ্যোৎস্নার পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে

শিশুবৃক্ষ
সোহাগী লতার শরীর দর্পিত দুই হাত

অজয় দাশগুপ্ত

তোমাকে

সোনার অক্ষরের জেনেছি প্রিয় নাম
যখন ভালবাসা চিনেছে তোমাকেই।
তুমিতো জল ভরা মেঘের মতো আহা
হৃদয়ে বরষার ভুলেছ ঢেউকেই।

তাকিয়ে থাকি তাই, সুদূর আগামীতে
যখন পাপিয়ারা গাহিছে মৃদু গান—
যখন মিলনের মধুর বাঁশি বেজে
উঠিবে জীবনের মায়াবী কলতান

জানি না সেই দিন আসিবে কিনা আর,
আমি যে খালি তাই স্বপ্ন এঁকে রাখি।
অধরা তুমি বলো, আঁধার শেষ হলে
আমাকে বেদনাতে দেবে না শুধু ঢাকি॥

মঞ্জুভাষ মিত্র

ডিডো

লুপ্তপ্রায় নগরীর কুহকিনী ডিডো
তোমার শরীরে যেন হাসে
শোনো সখী এই খানে আমার লিবিডো
এই স্বচ্ছ ঘন ঘাসে।

অস্থিসর্বস্ব ছায়া ফেলে আমার জাহাজ
তোমার বন্দরে
ঢেউ ঢেউ এ শীষ দিয়ে ছুটে যায়
সময়ের দুরন্ত নেকড়ে।

একা পড়ে থাকে শতাব্দীর অন্ধকারে
তোমার সৈন্যরা, ডিডো—
যুবতী-শরীর গেঁথে ফেরে চীৎকার;
আর আমার লিবিডো

কেঁপে ওঠে জ্যা-মুক্ত তীরের মতন,
নরম শরীরে বিঁধো
সেই তীর। ছায়াময় দুটি পায়ে কে আবার ফিরে এলো
সে কি তুমি আর সেই সম্রাজ্ঞী ডিডো?

সুকুমাররঞ্জন ঘোষ

ঠিক সেই মতো

খোয়া ভাঙ্গানোর শব্দে শক্ত শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওরা
এখনো পাহাড়ময়, শ্রবণী-তরঙ্গ আসে প্রান্তরের
প্রতিধ্বনি যায়—হতাশা ছড়িয়ে রেখে,
দূরত্ব কমিয়ে নিঃস্বতার সাতশূন্যে ফোয়ারার মুখ
ফুরায় না সেই নাম—নিরলস গন্ধে জাগে টান
শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওরা গান গায়
ঠিক সেই মতো হাসে ভাঙ্গমের গান।

মাটি খুঁড়ে অন্তরঙ্গ জন্মের সন্ধান
কি করে বোঝানো যায় অদৃশ্য মুঠোতে
হতাশা ছড়িয়ে রেখে সুর ধরে
সমবেত প্রার্থনার কুয়াশারা ঝরে পড়ে।
সুর মিলিয়ে সূর্য ওঠে—
অন্ধ মেয়েটির কোলে,
এখনো অতৃপ্ত সুখ অঝোর কান্নার
আশৈশব প্রতিধ্বনি
শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওরা চলে যায় ঠিক সেই মতো।

বিমল ভট্টাচার্য

একটি ধান ঘরে যায়

রোদে পুড়ে ধান মেলছ ঘুরে ঘুরে
পায়ে পায়ে ঘোরাচ্ছ উঠান, বাড়ী ত্রিভুবন
আমি কার পায়ে ধরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত ছায়া
আমার ? তোমার ? তাঁর ?
কে ঘোচায় ?
আমি ? তুমি ? তিনি ? কে ?
এখনো জানা যাবে না
এখনো রোদ উঠে যায় নি
শুধু তুমি ধান মেলে ঘরে গেলে
পায়ে পায়ে একটি ধান ঘরে যায়
তুমি রোদ থেকে ঘরে গেলে
ঘরে যায় তোমার আঁচল ধরা ছায়া।

শিশিরেন্দ্র ভট্টাচার্য

তিলোত্তমার প্রতীক্ষায়

"কে কোথায় যায়, যেতে পারে!" : (অরুণ ভট্টাচার্য)

রক্তের ভেতর প্রতীক্ষা ওত পেতে বসে আছে
মনের ভেতর প্রিয় মান অন্তঃসার বাসা বেঁধেছে
হাসি কান্নার বিয়োগান্ত নাটক মঞ্চস্থ পৃথিবীর মঞ্চে।
তিলোত্তমা নেই! আসে নি কখনো! আসবেও না আর
সমস্ত বাতাস বাতায়ন ঘিরে উত্তালতার
'বন্ধ সার্সির' পরে করছে আঘাত।
বন্ধ দরজা! ভেতরে আমি বন্দী!

সময়ের হাতে চাবি কাঠি, তার অট্টহাসির উত্তাল ঢেউ
আমার কানে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে বলছে
আমি তার বন্দী, একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী !
যদি থাকে এমন কোথাও কেউ
বন্দীর বন্দীত্ব যদি ঘোচাতে পারো
বিনিময়ে আমার রক্তের অঞ্জলি দেব তার পায়ে !
এ কঠিন শীতল আর্তনাদ যদি কেউ মনে করো
আঁজলা ভর্তি তপ্ত শোনিতের উষ্ণতা তাহলে পরখ কোরো
বন্দীর বন্দীত্ব, তিলোত্তমার প্রতীক্ষার উত্তাপ
মিথ্যে নয়, আজ করুন অভিনয় অভিনীত এ মঞ্চে !

চুনী দাশ

পাখি তোমায়

পাখি তোমায় দিলেম ছুটি
তবু কেন আবার এলে
খাঁচা তোমার এতোই প্রিয় !
আর এসো না, যাও উড়ে যাও
আকাশের ঐ নীল ছাড়িয়ে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ঘন-সবুজ বনের ভিড়ে
যাও উড়ে যাও।

পাখি তোমার অমন দুটি ডানা আছে
তবু তুমি ভাবছো এতো !
ঘরকে তুমি পর ভেবো না
ঘরকে কে না ভালোবাসে।
খাঁচায় তুমি আর এসো না
যাও উড়ে যাও।

জয়ন্ত সান্যাল
বিনিময়ে পেলি কি

কিছুতেই বোঝাতে পারি না আমারই ভেতরে কিভাবে পুড়ে
যায় বহু যত্নে তৈরি খড়কুটোর বাসা আমেজ ভরতি মিষ্টি
সুখের বুদবুদ। যতোই সোচ্চার শব্দে চেঁচাই 'সত্যি বলছি
সত্যি বলছি বিশ্বাস কর', সবাই মিলে ধমকে ওঠে 'চুপ
কর্ মিথ্যেবাদী'।

অথচ যখন জেনে শুনে ক্রমাগত মিথ্যের জাল বুনি তখন
তারা কেউ বোঝে না মিথ্যের ভেতর মিথ্যে সাজিয়ে
কতো উঁচু হতে পারে আমার ইমারত, তার ভেতরে
জ্বলতে পারে নীল প্রদীপ। দূরাগত বিস্ময়কে ডেকে
ডেকে সে আপন করে, জলের নীচে চিক্ চিক্ করে
ওঠে তার ছায়া, ছায়ার বুকে কান্নার বিন্দু জমে জমে
স্তূপাকার হয়ে গেলে নিজের ভেতরেই সে গুমরে ওঠে :
শালা, সতী হওয়ার এত চেষ্টা? বিনিময়ে পেলি কি?

মধুমাধবী ভট্টাচার্য
ইন্দ্রজাল

১. বিশ্বাস হারিয়ে যেতে
আবার এগোনো যায়;
ফিরে আসতে বারবার
দু'দণ্ড দাঁড়াতে হয়
মরীচিকা জানলেও বুঝি
থেমে থাকতে হয়
অবশ আঁধার ভারে।

২. সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চলে যাও
পাহাড়-চূড়ার পথ দেখ্‌তে পাবে।
দু'পাশে তাকিও না,
কৃষ্ণচূড়ারা হাতছানি দিয়ে ডাকবে।
আর শোন ; কখনো যদি ফল্গুধারা শুনতে পাও—
মুখ দেখো না ;
শেষ রাতের স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

৩. কে তাকে বলেছে ভাসাতে
উজানের পালতোলা নৌকাটিকে
ধীরে ধীরে মিলে যাবে জলের ইন্দ্রজালে।

সিক্ত সীমন্তে এখনও তুমি স্থির, প্রমীলা
পলক কাঁপলে ঝরে পড়বে
বুঝি তীরে বাঁধা অশ্রুনীর।

শুধু যে জানো না,
সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে
ফেরানো যাবে না শেষ খেয়া।

কুমার শংকর রায়শর্মা
ফুলময় উদ্যানের মধ্যে

কোন কিছু করার মধ্যে যে আন্তরিকতা
অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন ধারণার
কোন ভাবনার
কোন ধ্যানের
যোগ্য কোন মানসিকতা
আমার ছিল

এখন তোমাকে পেয়ে কোন ফুলময় উদ্যানের মধ্যে
কোন মতেই আমি নিজেকে বিকিয়ে দিই না
বরং
আমার গতিবেগ ক্রমশই গুণিত হচ্ছে
অথচ এ' সাফল্যের কোন জাত নেই
বলতে পার
একটা লক্ষ্য

তুমিও না একদিন বলেছিলে
বাতাসের মধ্যেও আমার উপস্থিতি ভেবে
ধন্য তোমার জীবন-যাপন ॥

মানসী দাশগুপ্ত

পসারিণী

অবেলায় হাটে এসে দিতে হলো খাঁটি আর মেকী
সমস্ত সোনাকে এক দরে।
যে নিল, সে জিতল, না, হারল ?
বসো তো, হিসেব করে দেখি।

পা চালিয়ে সাথে এসেছিলে
ছড়িয়ে পা বসো একপল,
ফের ধরা যাক সেই বাজি :
কোন্‌টা ভারি, ফেনা, না উপল।

বিশুদ্ধ বিবেক ছিল স্থির,
যা ঘটে নি, শুদ্ধ বেহিসেব।
বিন্দু নয়, এই তো রুধির,
নিষণ্ণ সত্তার অবলেপ।

ছিন্ন স্মৃতি, সুপ্ত মনস্কাম।
ভালবাসা কি স্বপ্নেরই নাম ?

শান্তা চক্রবর্তী

পলাতক বিকেল

হঠাৎ সময়টা যেন ঘুরপাক খায়।
পায়ে পায়ে ঘরময় ঘুরছে ফিরছে।
সেই সঙ্গে আমি ঘুরি ফিরি উঠি বসি।
বিকেলটা ছাদের আলসেয়
আহা কি নরম রোদে তার পিঠ সেঁকে।
তবু পরিতৃপ্তি কই!

দরজায় খুট করে শব্দ হলে
অবিরাম চোখ ছুটে যায়।
হয়ত বা বিড়ালটা তার তীক্ষ্ণ নখে
শান্তিকে ছিন্ন করে উধাও হাওয়ায়।

ঘড়িতে সময় দোলে,
দুলে দুলে শরীরের অনুভূতিগুলো ম্লান করে।
চোখে দোলে রোমান হরফগুলো;
এক দুই তিন চার—
তারপর অন্ধকার।
হাতের মুঠিতে কিছু ধরা আছে ভেবে
খুলে দেখি সময় পালিয়ে গেছে,
বিকেলকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় কখন!

আ লো চ না

'শেকসপীয়র ও বাংলা'

উত্তরসূরিতে শ্রীযুক্ত হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'শেকসপীয়র ও বাংলা।' প্রবন্ধটি অলংকৃত ভাষামাধুর্যে এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য প্রনিধানযোগ্য। লেখক নিজে সাহিত্যিক এবং যথার্থ বলেই প্রবন্ধটিকে নিছক গবেষণাধর্মী না করে রসাস্বাদনমূলক স্মৃতিচারণে পরিণত করেছেন।

কিন্তু নাম 'শেকসপীয়র ও বাংলা' হওয়াতেই আমাদের মতো পাঠকের প্রত্যাশার বহরটা বেড়ে যায়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মহাকবি শেকসপীয়রের যে গভীর প্রভাব পড়েছে তার একটা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের জন্য আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। লেখক বিশেষ করে কয়েকজনকে কেন্দ্র করেই শেকসপীয়র-সাহিত্যের প্রভাবকে দেখিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মোহিতলাল মজুমদার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূপেন্দ্রনাথ সেকালের দিনে সুখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তিনি লেখকের পিতা। মোহিতলাল সুপরিচিত কবি ও সমালোচক। তিনি ছিলেন লেখকের শিক্ষাগুরু। এ-দুজনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে যে তথ্য লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন তার মূল্য কম নয়। শেকসপীয়রের পাঁচ শত জন্মবার্ষিক উপলক্ষে যে সমস্ত আলোচনা কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে হয়েছে, তাতে এ-দুজনের কথা শোনা যায় নি। সে হিসেবে হীরেনবাবুর লেখকটি মূল্যবান। তথাপি বাংলার আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতিতে শেকসপীয়রের প্রভাবের কথা এই কজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে অনেক অকথিত থেকে যায়।

বিশেষ করে যখন ভাবি উনিশ শতকের সাহিত্যে শেকসপীয়র কতখানি স্থান অধিকার করেছিলেন তখন অবাক হয়ে যেতে হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার আগে থেকেই কলকাতায় শেকসপীয়রের নাটক অভিনীত হয়ে এসেছে। হেনরি ড্রামনডের ধরমতলা একাডেমিতে ডিরোজিও পড়াশোনা করেছিলেন ; ডিরোজিও

নিজে অভিনয় করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। হিন্দু কলেজের ইংরেজি-পড়া ছাত্ররা শেকসপীয়র সাহিত্যের রসে ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। শেকসপীয়র তাদের চিন্তায় সংলাপে রচনাভঙ্গিতে নাট্যাভিনয়ে প্রায়শঃই দেখা দিতেন। ইনডিয়া গেজেট পত্রিকায় তার বিবরণ মাঝে মাঝে চোখে পড়ত। এখানে তার বিষদ ইতিহাস দেবার প্রয়োজন দেখি না। উৎসুক পাঠক দুটী বই দেখতে পারেন, কিছুকাল পূর্বে তারা বেরিয়েছে। তাদের একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ডক্টর অমলেন্দু বসু সম্পাদিত Calcutta Essays on Shakespeare। এতে মহীমোহন বসু, অরবিন্দ পোদ্দার, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী, সিতাংশু মৈত্র এবং পল্লব সেনগুপ্ত রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় বইটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত স্মারক গ্রন্থ। এই বইতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বাংলার অধ্যাপক টি ডবলু ক্লার্ক লিখিত Shakespeare and Bengal প্রবন্ধটিতেও অনেক সংবাদ সংকলিত আছে। এছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশে শেকসপীয়র-চর্চার নানা বিবরণও বেরিয়েছিল। তার মধ্যে দেশ পত্রিকায় অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

তখন বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্পাদক সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি, ইংরেজি সাহিত্যেও রোমানটিক যুগের প্রভাব এদেশে তেমন ভাবে এসে পৌঁছয় নি। সুতরাং শেকসপীয়র ছিলেন নব্যশিক্ষিতের কাছে প্রধান চর্চার বস্তু। এই চর্চাকে শুধু ফ্যাশন হিসেবে নিলে ঠিক হবে না। শেকসপীয়র সাহিত্যের রস নাট্যাদর্শে তো বটেই জীবনবোধেও প্রাণ সঞ্চার করেছে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের রচনাতেও শেকসপীয়রীয় জীবন মহিমা বাংলা সাহিত্যকে অভিনবত্ব দান করেছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁদের যৌবনকালে শেকসপীয়রের নাট্যাদর্শই ছিল একমাত্র আদর্শ। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল—এই কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত শেকসপীয়রের নাট্যকলার আদর্শই আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে

ভিন্নতর নাট্যকলার প্রবর্তন করলেও 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে' মূলত অনুসরণ করেছিলেন শেকসপীয়রকে।

কিন্তু শেকসপীয়র শুধু নাটকের বহিরঙ্গ আদর্শে নয়, শেকসপীয়র প্রবেশ করেছেন বাংলা কাব্যসাহিত্যের মানবতন্ত্রী কল্পনায় মধুসূদন বঙ্কিমের কাব্যে উপন্যাসে। মেঘনাদবধের নায়ক-কল্পনায় মিলটন যেমন ছিলেন তেমনি ছিল শেকসপীয়রের রেনাশাঁস-যুগের ট্র্যাজিক হীরো। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শেকসপীয়রীয় জীবনরস যেমন ফুটেছে বাংলা সাহিত্যে আর কোন লেখাতেই তেমন প্রকাশ পায় নি —একথা বলেছেন মোহিতলাল। বহুস্থলে তিনি বঙ্কিমের কল্পনার সঙ্গে শেকসপীয়রের কল্পনার তুলনা করেছেন। নায়কচিত্রের দুঃখমহিমা, দ্বন্দ্ব, নিয়তি ও পৌরুষধর্মের জটিলতা, সৎএর অপচয় (waste of good)—এ সমস্ত দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে প্রাণতপ্ত বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বা আর কারো রচনায় তার তুলনা পাওয়া শক্ত। মোহিতলাল তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে'র শেষ অধ্যায়ে শেকসপীয়রীয় জীবন কল্পনায় সঙ্গে বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনকল্পনার সূক্ষ্ম তুলনা (অবশ্য ব্র্যাডলির মধ্যস্থতায়) করেছেন। তার একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ নাটকীয় কল্পনাকে আমি যে শেকসপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সহিত তুলনা করিয়াছি, তাহা যদি কোন অংশে যথার্থ হইয়া থাকে, তবে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, এত বড় মর্যাদা বাংলা সাহিত্যে আর কোন কাব্য দাবী করিতে পারে না।

জীবন-তত্ত্বের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে শেকস্পীয়রের সমধর্মী একথা শুধু মোহিতলাল কেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যদুনাথ সরকার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সমালোচকই মনে করেন। 'শেকসপীয়র ও বাংলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্য বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুল্লেখ একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

তা ছাড়া আর একটি কথাও এখানে স্পষ্টতঃ বলা ভালো। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য শেকসপীয়রের সঙ্গে তাঁর তুলনা

করতে আমরা ভালোবাসি। এটাও কতদূর সঙ্গত সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেকসপীয়রের মিল বস্তুত তেমন বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে শেকসপীয়র সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন, তার থেকেই এর প্রমাণ মেলে। রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়রের সৃষ্ট চরিত্রের সর্বজনগম্যতার (Universality) প্রশংসা করেছেন কিন্তু শেকসপীয়রীয় জীবনবোধ—নিয়তি, পৌরুষ, দ্বন্দ্ব, বিনাশ, কর্মফল, ব্যর্থতা, মৃত্যু—এসব সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি। শেকসপীয়র যে সব কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনে এই জীবনবোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাও তাঁর কাছে আতিশয্যপূর্ণ অবলম্বন বলে মনে হয়েছে। জীবনস্মৃতির 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়টি পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের শান্তরসাস্পদ প্রাজ্ঞ মন এই আবেগ এবং উত্তেজনাকে সহ্য করতে পারছে না। শকুন্তলা মিরান্দার তুলনাতেও তাঁর সেই মনোভাব সুপ্রকট। এক্ষেত্রে বঙ্কিমকেই বরং কালিদাসের চেয়েও শেকসপীয়রের প্রতি দেখা যায় অধিকতর অনুরাগী। ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ওথেলোর উপসংহার শিল্পনীতিকে লঙ্ঘন করেছে।

'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়রের উদ্দেশ্যে যে-প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা সুপরিচিত। মহাকবির কবিপ্রতিভা স্বয়ম্প্রভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম শেকসপীয়রের ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন বস্তুত তখন থেকেই আমাদের সাহিত্যে শেকসপীয়রের সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। শেকসপীয়র আমাদের দেশে নামী অধ্যাপকদের অধ্যাপনায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে স্থান নিয়েছেন। সাহিত্যের চরিত্র-সৃষ্টিতে কাহিনী-বৈশিষ্ট্যে, জীবন রহস্যভাবনায়—কোনো দিকেই শেকসপীয়র আমাদের কবি-লেখকদের উদ্বোধিত করেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রমনীয় কল্পনার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ও সব বিদেশী জিনিস পড়ে তাঁর ভালো লেগেছিল, তাই তিনি লিখেছিলেন। নইলে ও সব আমাদের জীবনে অবাস্তব।

একথা যদি বলি যে 'শেকসপীয়র ও বাংলা' বলতে মূলত উনিশ শতকের বাংলাকেই বোঝায় তবে কি খুব অনুচিত হবে ?

ভবতোষ দত্ত

এ বিষয়ে আমরা আরো আলোচনা প্রকাশে উৎসাহী।

সম্পাদক : উত্তরসূরি

উত্তরসুরি

মাঘ-চৈত্র ১৩৮০ ॥ ২১ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ

আলোচনা

কবিতাবলী

প্রতিবেশী সাহিত্য

প্রচ্ছদশিল্পী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য ॥ ৯বি-৮, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

রামমোহনের দৃষ্টি : পরিমল চক্রবর্তী

[রামমোহনের প্রসঙ্গে মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ সংখ্যায় বিতর্কিত লেখাটিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে নিরঞ্জন ধর আলোচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি রাজার অন্য একটি দিককে প্রকাশ করেছে। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

'Rammohan Roy inaugurated the Modern Age in India." নবভারত নির্মানের রাজা-কারিগর রামমোহন রায়ের যথার্থ ঐতিহাসিক ভূমিকাটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে গিয়ে বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ একদা এই আপাত-সরল অথচ গূঢ়ার্থগভীর বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন। রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেও একটি ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করে গেছেন, কারণ রামমোহন রায়ের মতো বিরাট এক যুগন্ধর পুরুষের শুভ আবির্ভাবের পশ্চাৎপটটি তিনি যতোখানি মগ্নতার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন, তার সমকক্ষ মগ্নদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের সংখ্যা নেহাৎই অঙ্গুলীমেয়; এবং এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক, কারণ আমরা জানি যথার্থ প্রতিভাবানদের যোগ্য মূল্যায়ন এবং তাঁদের জীবন সাধনা ও কর্মকৃতির ওপর অপাক্ষিক ও অবিমুগ্ধ আলোকপাত করা একমাত্র যথার্থ প্রতিভাবানদের পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রামমোহনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস এই সিদ্ধান্তের সত্যতাকেই প্রমাণ করেছে।

রামমোহনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমিকার স্বরূপটি কেমন ছিলো? একজন আধুনিক কবির ভাষায় এই প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ততম উত্তর হচ্ছে "অন্ধকার, সে তো অন্ধকার।" আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তখন পদে-পদে বাধা, বাধার জগদ্দল প্রাচীর মিথ্যা দম্ভে গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে; সহস্র লোকাচার, নিষ্প্রাণ প্রথাপরায়নতা

মিথ্যাশ্রয়ী সংকীর্ণতা, অর্থহীন আত্মকলহ, মূঢ় স্ব-বিরোধ, মৃত পৌত্তলিকতা, শ্বাসরোধী কুসংস্কার, দৃষ্টিনাশী অশিক্ষা ও কুশিক্ষা এবং সর্বোপরি জীবন জিজ্ঞাসাহীন আবিল গড্ডল জীবনস্রোত তীব্র তরঙ্গ-ভঙ্গে ধ্বংস ও মৃত্যুর মোহনায় আমাদের সর্বস্বকে প্লাবিত করে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিলো। তখনকার দিনের ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন কোনো একক মানুষের পক্ষে কিংবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তির অধিকারী একাধিক মনুষ্যসমষ্টির পক্ষে সেই সর্বগ্রাসী পর্বত-প্রমাণ বিরুদ্ধশক্তির বিরোধিতা করা বোধ হয় অসম্ভবের চেয়েও অধিক দুঃসাধ্য ছিলো। কিন্তু সমাজ জীবনের স্তরে-স্তরে সঞ্চিত সেই সর্বতোব্যাপ্ত বিরুদ্ধ শক্তির ভীষণ দর্শন করালদংষ্ট্রা রামমোহনকে এতোটুকুও ভীত করতে পারলো না, বরং তিনি সমাজদেহের সেই বিষাক্ত দন্তপংক্তির প্রতিটি বিষদন্তকে উৎপাটিত করতে চরম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। সেই সর্বনাশা সর্বপ্লাবী তামসী প্লাবনকে প্রতিহত করবার জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর হলেন এবং বলতে পারি, প্রায় সর্বস্ব পণ করে তাঁর জীবন-সাধনার সারাৎসার হিসাবে তাঁর নব্য মানবিক জীবনদর্শন গড়ে তুললেন এবং অকুতোভয়ে পরমবিক্রমে সেই জীবনদর্শনকে জাতিগঠনের মহাব্রতে নিয়োজিত করলেন। সেই প্লাবনের তমসার বিরুদ্ধে রামমোহনই হচ্ছেন প্রথমতম আলোকসেতু যিনি আমাদের তদানীন্তন জাতীয় জীবনের সব ক'টি দিক থেকে অন্ধকারকে শুধু নির্বাসিতই করলেন না, একটির পর একটি দীপকে জ্বালিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে সহস্র প্রদীপ আলোকমালার স্নিগ্ধোজ্জল রমনীয়তাও দান করেছিলেন।

রামমোহন আমাদের জন্য কী করেছিলেন? কী করেছিলেন সেই মহাতাপস যেজন্য তাঁর জন্মের দীর্ঘ দু'শ বছর পরেও তাঁর কথা আমরা ভাবছি, তাঁকে আমরা নতুন করে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছি, তাঁর জীবনের ধ্যানকে অনুধ্যান করে নিজেদের ধন্য বলে অনুভব করছি? এ-প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র এটুকু বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে তিনি আমাদের মৃতকল্প জাতীয়দেহে নতুন প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি

করেছিলেন, আবৃত চৈতন্যের উন্মোচন ঘটিয়ে আমাদের যথার্থ স্বরূপটিকে তিমি আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়েছিলেন, সমাজজীবনকে তিনি নবজন্মের সৌধশিখরে উত্তীর্ণ করেছিলেন। তখনকার দিনে আমাদের জীবনে যে-কটি স্পর্শবিন্দু ছিলো, রামমোহন সেই সব ক'টি বিন্দুকেই স্পর্শ করেছিলেন আপনার সৃজনীপ্রতিভার অঙ্গুলীস্পর্শে। শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহে, সমাজকে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে পূর্ণগঠনের প্রয়াসে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে জন্মলগ্নে ও প্রথম শৈশবে মাতৃপ্রতিম স্নেহমমতায় পরিবর্দ্ধনে, ধর্মকে অন্ধ ও ঘোর তামসিক আচার সর্বস্বতার নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বিশ্বমানবিক মূল্যবোধ থেকে নব মূল্যায়নে, রাজনীতিকে ব্যক্তিক বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে গঠনের পরিবর্তে ধ্বংস করা এবং এক মহান উদার প্রগতিশীলতায় আস্থাপরায়ণ বিশ্বগঠনের শুভ প্রয়াসের অবলম্বন হিসাবে আশ্রয় করার সতর্কবাণী উচ্চারণে, নারীকুলকে অহেতুক অত্যাচার অবিচার ও ব্যভিচারের কবল থেকে মুক্ত করে জননী-সুলভ মানসম্ভ্রম ও মর্যাদায় সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠিত করায়, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তাবাহী দূত হিসাবে বিশ্বের সুদূর দেশবিদেশে পর্যটনে,—এক কথায় আমাদিগকে যথার্থ 'আমরা' হয়ে ওঠার ব্যাপারে রামমোহনের যে-অবদান, তার তুল্য অবদান এককভাবে অদ্যাবধি অন্য কোনো ভারতবাসীর আছে বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু কেমন করে সম্ভব হ'লো রামমোহনের পক্ষে এই অসাধ্যকে সাধ্য করে তোলা? কেমন করে সম্ভব হ'লো রামমোহনের পক্ষে একজন মাত্র মানুষ হয়ে একটা গোটা দেশ এবং জাতিকে সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগীয় তামসিকতার বর্বর অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ করে আধুনিক জীবনদৃষ্টির যা বীজমন্ত্র সেই 'লিবের‍্যাল হিউম্যানিজম' বা উদার মানবিকতার আদর্শে উদ্দীপ্ত উনিশ-শতকী রেঁনেশাঁসের আলোকপ্লাবিত প্রভাততোরণে পৌঁছে দেয়া? উত্তরে রামমোহনের দৃষ্টি বা 'vision'-এর কথাই মনে আসে। রামমোহনের দৃষ্টি, যা নাকি সুদূর

ভবিষ্যৎকেও অদূর বর্তমানে রূপান্তরিত করতে পারতো, এক আশ্চর্য দূরযানীতায় সমৃদ্ধ ছিলো। সেই দূরদৃষ্টির স্বচ্ছ আলোকে তখনকার সমাজজীবনের প্রতিটি দিক, প্রতিটি দিকের অজস্র জটিল-কুটিল হিংস্র-বক্র-ও-তির্যক সব সমস্যাগুলিকে তিনি শুধু দর্শকজনোচিত নির্লিপ্তিতে অবলোকনই করেন নি, আবিষ্কারকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে প্রতিটি সমস্যার উৎস পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেছেন। এটা তিনি করেছেন এবং যথেষ্ট অনায়াসেই তিনি এটা করতে পেরেছেন কারণ তাঁর prophetic purity of vision' তাঁকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম ব্যবহারিক ব্যবধানকে অতিক্রম করে অনন্ত কালপ্রবাহকে এক অখণ্ড ও অখণ্ডনীয় সমগ্র সত্তা হিসাবে দেখার Gestalt-বাদী সুলভ দুর্লভ ক্ষমতা উপহার দিয়েছিলো এবং এই ক্ষমতায় তাঁর অধিকার যথেষ্ট ছিলো বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিলো ঐ সব সমস্যা সমাধানের দিঙ্‌নির্ণয় করা। তখনকার সেই তমসার প্লাবনে পরিপ্লাবিত দিনে সেই কাজ যে কী-অমানুষিকরূপে দুঃসাধ্য ছিলো তা এখনকার দিনে কল্পনা করাও বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

কিন্তু, তবু, এতদ্‌সত্ত্বেও রামমোহন নিরস্ত্র হলেন না; মহাতাপস ভগীরথের মতো মৃতপ্রায় ভারতবর্ষের মুমূর্ষু সগরসন্তানদের মুক্তিসাধনের মহাব্রতকে তিনি ব্রহ্মের আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করলেন। প্রথমেই তাঁর নজর পড়লো ধর্মাচরণের নামে তখনকার দিনে হিন্দুসমাজে যে নির্মম বিভীষিকা ও প্রাণহীন আচারসর্বস্বতা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিলো তার আত্মহননতুল্য দিকটির ওপর। পরম সভয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে ধর্মের নামে সমাজে যে-সমস্ত ব্যাপার সাড়ম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেগুলির সাথে বিশ্বসংসারের অন্য সব কিছুর ষোলো আনার জায়গায় সতেরো আনা যোগ থাকলেও যে-জিনিষটির সাথে সে-সমস্ত ব্যাপারের এক আনা যোগও নেই তা হচ্ছে শাশ্বত হিন্দুধর্ম। ফলে, অতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বর্বর মধ্যযুগীয় ভূতের ভয়, অদ্ভুতের অনুশাসন, অকারণ অনুজ্ঞা, পঞ্জিকার প্রাচীর ও পরিখা, আধিভৌতিক তাগা-তাবিজ-মাদুলী-

হিংটিংছট এবং আরো ঢের বেশী মর্মান্তিক ও পৈশাচিক সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে প্রথম সন্তান বিসর্জনের প্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রথা এবং এই ধরণের অর্থহীনতাসর্বস্ব মূঢ়তাপ্রসূত ও হৃদয়হীনতার অক্টোপাসবাহুর মৃত্যুবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে হিন্দুধর্মকে তার প্রকৃত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য তিনি যা করলেন এবং যা না করলেন তার উভয়ই প্রায় অতিমানবিক। জন্মলগ্নে প্রাপ্ত পিতৃকুলের বৈষ্ণব ও মাতৃকুলের শাক্ত উত্তরাধিকার, কৈশোরিক পৌত্তলিকতাবিরোধী মনোভাব এবং সত্যাশ্রয়ী ধর্মানুসন্ধিৎসাকে আশ্রয় করে তিনি শাশ্বত হিন্দুধর্মের আকর-গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করে বৈদান্তিক ধর্মচিন্তার যে অমৃত-সম্পদ আহরণ করলেন, তারই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : ভারতীয় ধর্মচেতনার সারাৎসার যে বৈদান্তিক ধর্মবিশ্বাস তার সঙ্গে যুগে-যুগে প্রবর্তিত ও প্রক্ষিপ্ত স্বার্থবুদ্ধি ও বিদ্বেষ-প্রণোদিত লোকাচার এবং দেশাচারের কোনোই সম্পর্ক নেই; তিনি সোচ্চারকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : চিরায়ত ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে হিংসাদ্বেষ-ঘৃণা, অত্যাচার-অবিচার-অনাচার-ব্যভিচার, দেশাচার-লোকাচার কিংবা ধর্মকে নিছক অন্ধ পশুশক্তির অধীনস্থ করার কোনো যুক্তি বা সমর্থন বা স্থান নেই; তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : একমাত্র তা-ই অকৃত্রিম ভারতীয় যা সকল মানুষকেই সম্মানযোগ্য বলে গ্রহণ করার মতো উদার, শুভ ও মঙ্গলবুদ্ধিপ্রণোদিত। তাঁর এই সপৌরুষ ঘোষণা তদানীন্তন সমাজদেহের ঘুনে-ধরা রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বজ্রবিষাণের মতো নির্ঘোষ তুলেছিলো; ফলে, তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোবার সরণি কিছুটা আলোকিত হয়তো হ'লো, নির্বিঘ্ন হ'লো না; বরং তাঁর এই আত্মপ্রত্যয়ী ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় রাতারাতি তাঁর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুকুলের সংখ্যা অবিশ্বাস্যরূপে বেড়ে গেলো। আশ্চর্য, তবু স্বাভাবিক। কিন্তু যথার্থ অনুশোচনার বিষয়টি হচ্ছে এই যে রামমোহনের শত্রুরা, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত এবং দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি নির্বিকার হয়ে যদি মাত্র নিজেদের গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র

স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে না করতেন, যদি তাঁরা রামমোহনের ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে একান্তভাবেই অন্ধ শত্রুতায় লিপ্ত না হয়ে যুক্তিভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত ও বাস্তব সচেতন বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তাহ'লে হয়তো ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তখন থেকেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'তে পারতো।

তাঁর হৃদয়-অনুভূত ধর্মমত ব্যাখ্যা ও প্রচারের পথে রামমোহনকে প্রধানত দু'টি বিরোধী শিবিরের শত্রুতার মুখোমুখী হ'তে হয়েছিলো ; একটি তাঁর স্বদেশী ও স্বধর্মী গোঁড়া পণ্ডিতকুল, যাঁরা ছিলেন তদানীন্তন হিন্দুসমাজের ন্যায়-অন্যায়ের নির্ণায়ক ও সমাজের বিশুদ্ধি বজায় রাখার ভারপ্রাপ্ত একমাত্র কর্তাব্যক্তিগন। রামমোহন কর্তৃক হিন্দুধর্মের এই পরিমার্জিত নতুন ব্যাখ্যা তাঁদের চিরাচরিত কায়েমি স্বার্থের পক্ষে মৃত্যুবান হয়ে দেখা দিলো। ফলে, তাঁরা শুধু ক্ষিপ্তই হলেন না, তাঁদের ক্ষিপ্ততা প্রকাশের ব্যাপারে হলেন যথেষ্ট ক্ষিপ্রও। তাঁদের সঞ্চিত ও সংহত ক্রোধ নিয়ে রামমোহনকে পর্যুদস্ত করতে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ মিত্রের রক্ষণশীল নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হ'লেন। কিন্তু রামমোহন এই বাধার সম্মুখীন হয়ে নিরুৎসাহ তো হলেনই না, বরং বর্দ্ধিত উৎসাহে প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করে এঁদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এই সময় ১৮৩৫ সালে তিনি "বেদান্তগ্রন্থ" ও "বেদান্তসার" নামে দু'টি বৈদান্তিক গ্রন্থ এবং তলবকার, ঈশ, কঠ ও মাণ্ডুক্য এই চারিটি উপনিষদগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এছাড়া ব্যক্তিগত উত্তর-প্রত্যুত্তরের উত্তাপ অজস্র পুস্তিকা প্রণয়ন ও পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিকীরণ করে চলেছিলেন। শুধু তা-ই নয়। সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে প্রথম সন্তান নিক্ষেপের নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে তিনি রক্ষণশীলদের ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি ও রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগিতায় যে-প্রচণ্ড আন্দোলনের বন্যায় সারা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বন্যার স্রোতে এ-দেশ রক্ষণশীলতার সব ক'টি নির্ভিত্তিক দুর্গই তাসের মতো ভেঙে পড়লো আর সেই সঙ্গে

অনেক-অনেক অন্যায় আর অবিচারের জঞ্জাল তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেলো চিরদিনের মতো। ফলে ১৮২৯ সালের অন্তিমপর্বে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর শাসনকালে এদেশের মাটি থেকে এই ধরণের নারকীয় অন্ধ প্রথার মূলোৎপাটন করা সম্ভবপর হ'লো। এইভাবে দেশজোড়া পণ্ডিতসমাজের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রায় একক সংগ্রাম সুরু করে দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককাল পরে রামমোহন তাঁর অন্যতম ঈপ্সিত অভীষ্টে পৌঁছোতে পেরেছিলেন এবং এই দীর্ঘদিন ধরে এই চিন্তাই ছিলো তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, একথা আজ যখন ভাবি তখন স্বভাবতই আমাদের দেহসর্বস্ব মাথা শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অবনত হয়ে আসে এই সিংহচেতা পুরুষ শ্রেষ্ঠের পায়ে।

ধর্ম বিষয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় শত্রুশিবিরটি গড়ে উঠেছিলো এদেশের মাটিতে নবাগত বিধর্মী ইংরেজ পাদ্রীদের দ্বারা। এই খ্রীষ্টান ধর্মব্যবসায়ীরা এদেশের নিরন্ন অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের মধ্যে খ্রীষ্টিয়করণের মাধ্যমে মুক্তির অমৃতবাণী প্রচারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করে এদেশের মাটিতে প্রথম পা ফেলেন। তাঁদের এই 'মহৎ কর্তব্য' সম্পাদনের পথে রামমোহনের ধর্মসংস্কার বা রিফর্মেশন আন্দোলন এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করলো। ফলে, এঁদের সঙ্গেও রামমোহনকে বাধ্য হয়েই মসীযুদ্ধের মাধমে তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হ'তে হয়েছিলো। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে খ্রীষ্টের বাণী ও জীবনীর ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করেই এই তর্ক ও বিতর্কের চাকা আবর্তিত হয়েছিলো। এই যুদ্ধে রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রধান যিনি ছিলেন তিনি বিখ্যাত "Serampore Trio"-এর অন্যতম নায়ক ডঃ মার্শম্যান। মার্শম্যান ও তাঁর সহপাদ্রীরা যীশুখ্রীষ্টের জীবনী ও সমুদয় বাণীকে অলৌকিক বা অতিলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বলে প্রচার করতে সুরু করলে রামমোহনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সর্বপ্রকার অতিবাস্তবতা ও অলৌকিকত্বের মিথ্যা আবরণ উন্মোচিত করে যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও কার্য্যবলীকে প্রকৃত বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে পুনর্বিচারে বদ্ধপরিকর হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২০ সালে "প্রিসেপ্ট অফ জিসাস্—দ্য গাইড টু পীস

অ্যাণ্ড হ্যাপীনেস" নামে একটি পুস্তিকা এবং মার্শম্যানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক প্রসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্নোত্তর-পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রিকায় মার্শম্যান পর-পর অনেকগুলি সংখ্যা জুড়ে রামমোহনকে আক্রমন করেছিলেন আর প্রতিবারই রামমোহন পর-পর "অ্যাপীল টু দ্য খ্রীশ্চিয়ান পাবলিক ইন ডিফেন্স অফ দ্য প্রিসেপ্ট অফ জিসাস" নামক পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত পুস্তিকায় সেগুলির উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। আজ একথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে রামমোহনের মতো যুগস্রষ্টা ধর্মসংস্কারককে এই সব বৈশ্যমনোবৃত্তিসম্পন্ন ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা কতো ভাবেই না আক্রান্ত হতে হয়েছিলো! এমন কি যে 'ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস'-এ রামমোহনের খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক পুস্তিকামালা ছাপানো হচ্ছিলো, পাদ্রীরা সেই প্রেসকেও রামমোহনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও রামমোহন দমিত হলেন না; বাদানুবাদ-পর্বের মধ্যপর্যায়ে সেই প্রেস তাঁর পুস্তিকা ছাপাতে অস্বীকৃত হওয়ায় রামমোহন নিজেই কলকাতার ধর্মতলায় 'ইউ-টিলিট্যারিয়্যান প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা খুলে তাতেই নিজের পুস্তিকাগুলি ছাপাতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে, এতো বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে "হিদেন" রামমোহনের সমস্ত বক্তব্যকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং তারই প্রমাণ হিসাবে আমরা দেখেছি যে ১৮২৪ সালে লণ্ডনের "ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটি" রামমোহনের এই পুস্তিকাগুলিকে একত্রিত করে "দ্য প্রিসেপ্ট অফ জিসাস অ্যাণ্ড থ্রী অ্যাপীলস্" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কী-দুরন্ত প্রাণশক্তি, প্রতিজ্ঞার কী-একাগ্রতা, কী-অগাধ আত্মপ্রত্যয় একজন মানুষের মধ্যে থাকলে তাঁর পক্ষে এই দুস্তর বাধাকে অগ্রাহ্য করে, এমন কি প্রাণকে পর্য্যন্ত পণ করে, স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব, তা, আশা করি, রামমোহনের জন্মের দীর্ঘ দু'শ বছরের ব্যবধানে আমরা সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

আমার এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সল্পায়ত পরিসরের অনুপাতে রামমোহনের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনাটা ইচ্ছা করেই

একটু দীর্ঘ করলাম; তার কারণ আছে। আমি ভেবে দেখেছি রামমোহনের যে-কোনো সংস্কার-আন্দোলন, তা সমাজ সংস্কারই হোক, কিংবা শিক্ষা সংস্কারই হোক অথবা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারই হোক, তারই কেন্দ্রে রয়েছে এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন কারণ তিনি সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়ে ধর্মসংস্কার করতে চান নি বরং ধর্মসংস্কারের আন্দোলনকে অবলম্বন করেই সমাজজীবনের অন্যান্য দিকের সমস্ত সংস্কার কর্মগুলি সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো শতসহস্র দেশাচার ও লোকাচারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ধর্মকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। সমস্ত জীবন ধরে তিনি যে উদার, ব্যাপ্ত বিশ্বমানবিকতার স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে সত্যিকারের ধর্মচেতনা, যা দেশকালের কৃত্রিম গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়, বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিলনমন্ত্র হয়তো রচনা করতে পারবে। যথার্থ ভারতীয় ঋষির মতো ধ্যাননেত্রে তিনি বহুর মধ্যে সেই 'একম্, অদ্বৈতম, অদ্বিতীয়ম'-কে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই পরবর্তী জীবনে পরিণত জ্ঞানের সঞ্চয়ে অনায়াসেই তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন "ইউনিভার্স্যাল রিলিজিয়ন"-এর মতো মহাগ্রন্থ। আর এই কারণেই প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ Monier Williams তাঁর কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত সার্থকভাবেই বলেছেন "He was perhaps the first earnest minded investigator of the science of Comparative Religion that the world has produced."

কেউ কেউ সমাজসংস্কারক রামমোহনকে ধর্মসংস্কারক রামমোহনের চেয়েও উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন; কিন্তু এটা বোধ হয় ঠিক নয়, কারণ রামমোহন তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ধর্মকে যদি আমূল সংস্কার করা যায় তবে তদানীন্তন সমাজের অধিকাংশ গলদ থেকে সমাজকেও সহজেই মুক্ত করা সম্ভব হবে, কারণ তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিলো যে ধর্মীয় অনাচার থেকেই সকল প্রকার সামাজিক অত্যাচারের জন্ম। কাজেই তিনি সমাজসংস্কারের অঙ্গ হিসাবেই ধর্মসংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন, ধর্মসংস্কারের জন্য

সমাজসংস্কারে নয়। তবু সমাজসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের অবদান বোধ হয় সবচেয়ে মূল্যবান নারীজাতির মুক্তি-আন্দোলনে। এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র এটুকুই বিশেষভাবে বলবো যে তিনিই প্রথম এদেশে নারী-সমাজের মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং পরবর্তীকালে প্রধানত তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখরা এদেশে নারীমুক্তির আন্দোলনকে আরো বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অস্তায়মান যে-যুগের অবসানে ও উদীয়মান যে যুগের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম, বিপরীতধর্মী সেই দুই যুগের আদর্শ ও মূল্যবোধগত সংঘাতের পরিণতি হিসাবেই রামমোহনের চরিত্রে আমরা এক আকর্ষণীয় বৈপরীত্যের সন্ধান পাই। পলাশীর মাঠে রক্তের দাগ তখনো ভাল ভাবে শুকায় নি, তখন মুঘল যুগ ও আদর্শের নাভিশ্বাস উঠেছে এক দিকে আর অন্যদিকে ভারতের পুণ্যভূমিতে ইংরেজ জাতি সাম্রাজ্যের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের স্বপ্ন দেখছে—ঠিক এমনি এক যুগসংকটে তাঁর আবির্ভাব। শিক্ষার জগতে তখন চলেছে মক্তব-মাদ্রাসা টোল-পাঠশালার গতানুগতিক বদ্ধগ পদ্ধতির আবর্তন; আরবি-ফারসী-সংস্কৃতই হচ্ছে সেই শিক্ষার বাহন আর শিক্ষার বিষয়বস্তুও হচ্ছে একান্তভাবেই মান্ধাতা আমলের। রামমোহন নিজেও জীবনের প্রথম দিকে এই পুরানো ব্যবস্থাতেই বড়ো হয়ে উঠেছেন; তাঁর আরবি-ফারসীর পঠনপাঠন আরবি-ফারসী চর্চ্চার পীঠস্থান পাটনাতে আর হিন্দুধর্মের পবিত্রভূমি বারাণসীতে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন; ফলে, হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের মিশ্রধারায় তাঁর ব্যক্তিত্বের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ইংরেজ যখন এদেশে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নতুন সম্পদ। জীবন জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল রামমোহন প্রলুব্ধ নয়নে সেদিকে তাকালেন এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানভাণ্ডার ও সভ্যতার মূল উৎস সন্ধানের তাগিদে গভীর তন্ময়তার সঙ্গে প্রথমে ইংরেজী ও পরে গ্রীক ল্যাতিন ও হিব্রু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করলেন। ফলে যে-রামমোহন একদা প্রাচীন শিক্ষাধারাতেই সন্তুষ্ট

ছিলেন, তিনিই ধীরে ধীরে ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে শুধুমাত্র অতীতের প্রতি মোহ-পরায়ণতায় কালহরণ করলেই চলবে না, অনাগত ভবিষ্যতের দিকেও সন্ধানী দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হবে। মনে প্রাণে এ-সত্যটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে অন্তঃসারশূন্য ও অপস্রয়মান হিন্দু ও মুসলিম ভাবধারা ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থার সার্থক সমন্বয়ের গভীরেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ-ভারতের নবজাগরণ ও মুক্তি।

ঠিক এই ধরণের এক উপলব্ধিজাত প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড়িয়েই রামমোহন শিক্ষাসংস্কারের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলনে নেমেও তাঁকে কম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয় নি। রক্ষণশীলতার প্রতিভূর দল প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর সঙ্গে শত্রুতায়, এমন কি তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্তে পর্যন্ত লিপ্ত হয়েছিলো। এদেশে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে, ইংরেজী না আরবি-ফারসী-সংস্কৃত? শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটিতে যাবে, না মক্তব-মাদ্রাসা-টোল-পাঠশালায় যাবে? শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থ নব্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়িত হবে, না পুরনো শিক্ষাধারাকে টিঁকিয়ে রাখায় ব্যবহৃত হবে?—এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে তখনকার দিনে আমাদের দেশে চিন্তাশীলদের মনে যে অজস্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয় দেখা দিয়েছিলো, রামমোহনই ছিলেন সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্রষ্টা, মুখ্য প্রবক্তা নায়ক। ধর্মসংস্কারের মতো শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন দুর্জয়প্রতিজ্ঞ এবং শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনকেও তিনি এমন এক প্রচণ্ড শক্তিতে প্রবাহিত করেছিলেন দিকে-দিকে যার ফলে শেষ পর্যন্ত বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার সামান্যতম উৎসাহও তখনকার দিনে কোথাও পাওয়া যেতো না, সেই ভারতবর্ষের মাটিতেই ইংরেজী শিক্ষাধারার বীজ রামমোহন সযত্নে সহস্তে রোপণ করলেন;

এ-দেশে ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগলো এবং ১৮৩৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত লর্ড মেকলে সাহেবের "Minute on Education"-এ সুস্পষ্টভাষায় যখন লিপিবদ্ধ হ'লো যে এদেশে প্রাচীন শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের স্থির সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন, তখন এবং শুধুমাত্র তখনই রামমোহন শিক্ষাসংস্কার থেকে সরিয়ে এনে তাঁর বুদ্ধি, মেধা ও শারীরিক শক্তিকে অন্য দিকে নিয়োজিত করার মতো সাময়িক অবসর খুঁজে পেলেন।

ভাবতেও অবাক লাগে যে-যুগে আমাদের দেশে স্বদেশ-প্রেমের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণাই ছিলো না, সে-যুগেই রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে নিজের দেশের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা স্বদেশ-ভক্তিরই একটা বিশেষ দিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আপন-আপন সাহিত্য ও মাতৃভাষার সযত্ন অনুশীলন ব্যতীত বিশ্বের সাংস্কৃতিক দরবারে কোনো জাতিই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই বিশ্বাসের প্রেরণাতেই রামমোহন নিজেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবকরূপে নিয়োজিত করলেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন রামমোহনের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একেবারে শৈশব-দশাই চলছিলো। রামমোহনের চেষ্টাতেই সেই শিশু ধীরে-ধীরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখেছিলো। অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করে রামমোহন বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে একটি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় গড়ে তুলতে চাইলেন। তাঁর পরিশ্রমের ফসল হিসাবে আমরা পেলাম বিখ্যাত "গৌড়ীয় ব্যাকরণ," যে-গ্রন্থে তিনি অনেকটা তর্কবাক্য-সম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাকরণকে গড়ে তুলেছেন; আর পেলাম তখনকার দিনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ। গ্রন্থ দু'টি প্রণয়নের পাশাপাশি তিনি রচনা করলেন প্রথম বাংলা অভিধান।

শুধুমাত্র এ-দুটি ব্রত উদ্‌যাপন করেই তিনি যদি বিশ্রাম নিতেন তাহ'লে তা-ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনকে চিরজীবী করে রাখতো, সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি বিশ্রাম গ্রহণের পরিবর্তে আরো

শ্রম-সাপেক্ষ কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বাংলা গদ্যের দিকে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করলেন। বাংলা গদ্যে তখন পর্যন্ত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বলতে প্রায় কোনো কিছুই নেই; তখনকার দিনের বাংলাভাষার ভাণ্ডারে গুটিকয় শিশুপাঠ্য নীতি উপদেশকণ্টকিত কথা-কাহিনী ও সামান্য কিছু অনুদিত বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর কোনো সম্পদই ছিলো না। রামমোহন যেন এই দৈন্যতায় লজ্জিত হয়েই বাংলা গদ্যের প্রবন্ধ শাখার অনুশীলন সুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পেলাম ইসলাম ধর্মবিষয়ক 'তুয়োফাৎ উল-মুয়াহ্‌হি দিন'-এর মতো গ্রন্থ,পেলাম 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তন ও নিবর্তনের সম্বাদ'-এর মতো সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক গ্রন্থ, পেলাম হিন্দুধর্মাশ্রিত গ্রন্থ 'গায়ত্রীর অর্থ' এবং অন্যান্য বহু প্রবন্ধগ্রন্থ। রামমোহন-রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলির উপজীব্য অনেক ক্ষেত্রেই গোঁড়া হিন্দু ও ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁর ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদ। প্রবন্ধগুলির ভাষা কোনোক্রমেই আধুনিক অর্থে গীতিময় কিংবা প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু প্রবন্ধগুলির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিন্তার পরিচ্ছন্নতা এবং যুক্তির শৃঙ্খলা। বাংলা গদ্যে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত যে-ধারাটি রামমোহন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবর্তন করেছিলেন, সে-ধারাটিই পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রে এসে ক্রমপরিণতি লাভ করে-ছিলো।

এ-প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যে রামমোহনের একটি সাংবাদিক ও সম্পাদক জীবনও ছিলো যা সংক্ষিপ্ত হলেও সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক। রামমোহন নিজে প্রত্যক্ষভাবে কোনো সংবাদপত্র সম্পাদনা না করলেও সেকালের অনেকগুলি সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন" ও "বেঙ্গল হেরাল্ড", বা লাভাষায় প্রকাশিত "সম্বাদ কৌমুদী" এবং ফারসী ভাষায় প্রকাশিত "মিরাত-উল-আমবর"। এ ছাড়া দ্বিভাষী "ব্রাহ্মণ সেবাধি" এবং ত্রিভাষী "বঙ্গদূত" পত্রিকার সঙ্গে তিনি তো একজন প্রধান কর্মকর্তারূপেই যুক্ত ছিলেন।

সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসাবে রামমোহনের ক্রিয়াকলাপের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরে পড়ে। সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসাবে রাম-মোহনের প্রতিটি কাজের সঙ্গে একদিকে যেমন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রেরণা জড়িয়ে আছে, অন্যদিকে এসব কাজকর্ম থেকেই আমরা সম্পাদক হিসাবে তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাবের এবং তাঁর নির্মোহ রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে থাকি। সমগ্র জীবনে যিনি স্বাধীনতাকেই আরাধ্য দেবতার বেদীকায় বসিয়ে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন, তিনি যে সাংবাদিক হিসাবেও স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী হবেন, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সাংবাদিক হিসাবে রামমোহন মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের অবাধ ও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কারণ এই মৌলিক স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে সভ্য ও উন্নত জীবনের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না তিনি। সেজন্যই আমরা দেখেছি ১৮২৩ সালে নতুন আইন রচনার মাধ্যমে ইংরেজ সরকার যখন মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচনে উদ্যত হয়েছেন, তখন এই পুরুষসিংহ কী প্রচণ্ড নাদে এর বিরুদ্ধে গর্জন করেছেন যার প্রতিধ্বনি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কর্ণকুহরকে পর্যন্ত বিদীর্ণ করার উপক্রম করেছিলো। অ্যাডামস্-প্রবর্তিত নিপীড়নমূলক 'রেগুলেশনস্'-এর বিরুদ্ধে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে লিখিত যে-প্রতিবাদলিপি তিনি পাঠিয়েছিলেন, তখনকার রাজনৈতিক অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে তার যথার্থ মূল্যায়ন করা এখনকার দিনে অত্যন্ত কঠিন, এমন কি ঐ প্রতিবাদলিপির বিপ্লবী তাৎপর্যের কথা মনে রেখে যদি তাঁকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের "Areopagitica" বলেও আখ্যাত করা হয়, তাহ'লেও বোধ করি খুব কমিয়ে বলা হবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার নির্ভীক সংগ্রামে তিনি কোনো কারণেই কোনো আপোষ রফা করেন নি; এজন্য অনেক ক্ষতি ও দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এমন কি এ-আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি তখনকার ভারতবর্ষের শিক্ষিত শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'মিরাত-উল-

আমবর'-এর প্রকাশ পর্যন্ত সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই ত্যাগস্বীকার ব্যর্থ হয়নি, কারণ তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পরে চার্লস্ মেটকাফ্-এর শাসনকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আবার স্বীকৃতি লাভ করে। রামমোহন যদিও জীবদ্দশায় তাঁর এই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় দেশবাসী আজও এ-আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তাঁকে স্মরণ করছে যেহেতু তিনিই এদেশে প্রথম 'ফ্রী জর্ণালিজম'-এর তাৎপর্যকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

যে-ক'টি পত্রপত্রিকার সঙ্গে রামমোহন নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, সেগুলিতে ঠিক যে-ধরণের সংবাদ ও তথ্যাদি পরিবেশিত হ'তো, তা থেকেই সমকালীন স্বদেশীয় ও বৈদেশিক সমস্যা ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রিকা গুলিতে যেমন স্থান পেতো ভারতবর্ষের অশিক্ষিত ও দারিদ্রপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক সংকটের কথা, তেমনই পরিবেশিত হ'তো সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির জলন্ত খবরসমূহ, —যেমন দূরপ্রাচ্যের চৈনিক সমস্যা, ইউরোপখণ্ডে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, আয়ারল্যাণ্ডে দরিদ্র কৃষককুলের আত্মপ্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ প্রচেষ্টা, স্প্যানিশ আমেরিকার রক্তাক্ত বিপ্লব ইত্যাদি। এর থেকেই বোঝা যায় রামমোহন একজন চিরকালীন আধুনিকের মতো তাঁর দৃষ্টিকে স্বদেশীয় অঙ্গন পেরিয়ে বিশ্বপ্রাঙ্গনের সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কেও রামমোহন যথেষ্ট ভাবিত ছিলেন। অর্থনীতি সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাধারা বিশেষভাবে বিশ্বমুখীন ছিলো, সেজন্যই বাংলাদেশের বিশেষ কিংবা ভারতবর্ষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলীকে তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের আর্থিক সংকটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেই বিচার করেছেন। আধুনিক বিশ্ববীক্ষা ও মানসিকতার সুযোগ্য অধিকারী হিসাবে এ-সত্যটি তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক জগতে ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই বেঁচে থাকতে হবে,

বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সেজন্যই ইংলণ্ডের 'শিল্প-বিপ্লব'-এর উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি তিনি সধৈর্যে লক্ষ্য করেন এবং এ-ধরণের অর্থ নৈতিক বিপ্লবের গুরুত্বকে অনুধাবন করে এ-দেশের বুকেও এ-ধরণের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে এদেশের গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থ নৈতিক জীবন গড়ে তোলার ওপর মূল্য আরোপ করেন। স্বদেশের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে কেবলমাত্র চিন্তা করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি, সংকট-মোচনের পন্থা হিসাবে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন, ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে অধিকতর মনোযোগী হওয়া এবং সর্বোপরি কায়িক শ্রমের ওপর মর্যাদা আরোপের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভাবতে ভালো লাগে, একান্তভাবে তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ না হয়েও রামমোহন তাত্ত্বিক ও ফলিত অর্থনীতির মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্রটি দেশবাসীর চোখে কী-রকম সুস্পষ্ট-রূপে দৃশ্যমান করে তুলে ধরে ছিলেন!

রামমোহনের স্বাধীনতাস্পৃহা যে কতোখানি অগাধ ছিলো তার অজস্র প্রমাণ অদ্যাবধি আমাদের স্মৃতিতে রূপকথার মতো অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছে। ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে, স্বদেশে-বিদেশে যেখানেই যখনই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় বা পরাজয়ের বার্তা শুনতেন, সেখানেই তখনই তিনি আনন্দবেদনার অংশীদার হয়ে সশরীরে উপস্থিত হ'তে না পারলে যেন হাঁপিয়ে উঠতেন, এমনই গভীর ছিলো তাঁর স্বাধীনতাপ্রেম। ভারতবর্ষের মাটি থেকে বহু সহস্র যোজন দূরের দেশ স্পেন-এ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুখবর যেদিন তাঁর কানে পৌঁছোলো, সেদিন তিনি কলকাতায় বন্ধু বান্ধবদের ভোজে আপ্যায়িত করে প্রাণের উল্লাস ব্যক্ত করলেন, ইউরোপ যাত্রাপর্বে ফ্রান্সের পথে যখন তিনি মার্শাই বন্দরে উপনীত হলেন, তখন একটি জাহাজে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বিজয়-পতাকা সগর্বে উড্ডীন দেখে আনন্দের আতিশয্যে বালকের মতো আত্মহারা হয়ে স্বাধীনতার বার্তাবাহী সেই পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন তিনি, আবার অন্যপক্ষে নেপলস্-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতা ও গণতন্ত্রের পতন তাঁর প্রাণে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিলো!

এমনই ছিলেন আমাদের রামমোহন, নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রাণ পুরুষ রাজর্ষি রামমোহন রায়।

আমার প্রবন্ধ শেষ হয়ে এলো; এতোক্ষণ ধরে এই দীর্ঘ প্রবন্ধে আমি রামমোহন রায়ের বৈচিত্র্যময় জীবনের বহুমুখী কার্যকলাপের ওপর ভিন্ন-ভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলে-ফেলে তাঁর সুউচ্চ জীবনাদর্শ ও উদার জীবনদর্শনের মূল বক্তব্যটি উজ্জ্বল করে ফোটাতে চেয়েছি। আমি বোঝাতে চেয়েছি যে তাঁর কালের বাংলাদেশে, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে তিনিই ছিলেন একমাত্র মানুষ যিনি আধুনিক মনন ও মানসিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক যুগের যথার্থ স্বরূপ ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; এবং সেই উপলব্ধিকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে সংক্রামিত করে জাতীয় চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটিয়ে ধ্বসে-পড়া প্রতিক্রিয়াশীল পুরোনো সমাজকে একেবারে ধূলিসাৎ করে ফেলে সেই জায়গায় সবুজ প্রাণশক্তিতে ভরপুর প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী এক আদর্শ নতুন সমাজ সৃজন করতে তিনি তাঁর সমস্ত জীবন ধরে যে-দুরুহ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, যে অসীম আত্মত্যাগ করেছেন, যে চরম অন্যায় ও অবিচারের শিকার হয়েছেন এবং সবচেয়ে বড়ো কথা যে অনমনীয় তেজস্বিতা ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার ফলেই তাঁর পবিত্র আসনটি আমাদের অন্তরের একেবারে অন্তঃস্থলে দেবমহিমার ঐশ্বর্য ও সৌরভে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

আমাদের ইতিহাসের এক চরম সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে শাশ্বত মানবতার বাণীকে অন্তরে ধারণ করে তিনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঘোর সামাজিক মাৎসন্যায় ও তামসিকতার অমাবস্যার অন্ধকার অন্ধ প্রহরে প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা হাতে পথ প্রদর্শন করে নবজন্মের ঊষালগ্নে আমাদের মৃতকল্প জাতিকে তিনি উত্তীর্ণ করে দিয়ে গিয়েছেন; বিশ্বনাগরিক, ভারত-পথিক, নব্য জীবন সাধনার হোতা রামমোহনের কাছে আমাদের ঋণের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আধুনিক ভারতবর্ষ নির্মানের মহাসংগ্রামে তিনি যেন প্রায় শহীদের

মৃত্যুই বরণ করেছিলেন। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ অতি যথার্থই বলেছেন "Rammohan suffered martyrdom in his life and paid the price of his greatness." তিনি ছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। যে প্রেম-তিতিক্ষা-ক্ষমা ভারতবর্ষকে মহত্ত্ব দান করেছে, যে বোধ-বোধি-নিভৃতচারিতা ভারতীয় জীবনধারাকে সর্বদিদৃক্ষু করে তুলেছে, সেই প্রেম-তিতিক্ষা-ক্ষমা এবং বোধ-বোধি-নিভৃতচারিতা ছিলো তাঁর জীবন-সৌধের সোপান বিশেষ। আবার এই রামমোহনই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্যসূত্র অন্বেষণ করেছেন, ইউরোপের সঙ্গে আমাদের মানসিক সেতুবন্ধ রচনা করেছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মানসিকতা ও জীবনধারায় আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন; আশ্চর্য, কি আশ্চর্য!

আবার বলি, প্রবন্ধের প্রারম্ভে ইতিপূর্বে যা বলেছি, রামমোহনের জীবনের সমস্ত কিছুরই মূলে ছিলো তাঁর দৃষ্টি, তাঁর দূরভেদী দূরযানী দৃষ্টির স্বচ্ছতা, তাঁর "Prophetic purity of vision." ॥

ক বি তা ব লী

অরুণ ভট্টাচার্য

সময় অসময়ের কবিতা

১. তোমাকে নারী ভাবাও যা পাথর ভাবলেও তাই
যতই আঘাত হানি, বুকে দাগ পড়ে না কোন।

তোমাকে নারী ভাবাও যা নদীর জল ভাবলেও তাই।
যদি ডুব দিতে যাই প্রাণ শীতল হয় না, শুধু টুপটাপ
শিশির হয়ে ঝরে পড়ে শরীর বেয়ে।

বস্তুত নারী পাথর বা নদীর জল মূলত একই, হৃদয়হীনা।

২. সারাবেলা তোমার জন্য বসে থাকি, কখন তুমি ডাকবে
মেঘের দুয়ার খুলে কখন তোমার শাড়ির আঁচল দেখা যাবে।

শূন্যে ভাসলে সব পাখি ঘরে আসবে। তাই
বসে আছি তোমার জন্য,
কখন তুমি ফিরে আসবে ঘরে।

৩. অস্থিরতা, তোমাকে নিয়ে সারাদিন ঘর করি।

পাহাড়চূড়ায় হাওয়ার ঝড় মাথার উষ্ণীষ উড়িয়ে নিয়ে যায়
অরণ্যানী দুলে ওঠে, দুই পায়ে
ভর করে দাঁড়ালে
সমুদ্র গর্জে ওঠে। অস্থিরতা,
তোমাকে নিয়ে সারা জীবন কেমন করে ঘর করি!

কল্যাণ সেনগুপ্ত

মহাকাশ

পাখি, তুমি কতদূরে যাবে ?
সব দিক্‌চিহ্নগুলি—পর্বত প্রান্তর নদী—হয়ে গেছে চেনা ?
ডানার পালকপুঞ্জ শূন্যের ঘর্ষণে ক্ষ'য়ে একে-একে সমস্ত হারাবে।
আকাশ তবুও ফুরোবে না।

আশ্বিনের সকাল

বৃষ্টি, কী অঝোর বৃষ্টি, আকাশ প্রতিমা ধুয়ে যায় !
খুকুর নিটোল মুখ থমথমে কান্নায় মেদুর :
স্থির ধ্রুব নীলাকাশ, প্রাণবন্ত ভোরের রোদ্দুর
কোনদিন ছিল নাকি ?
এ-মেঘের মহাদেশ পার হয়ে
এখন কোথায় ?

সংযুক্তা

দশ বছর ধরে আমি দ্বিধাগ্রস্ত কুণ্ঠিত প্রেমিক
তোমাকে ভেবেছি নিত্য স্পর্শাতীত, অস্পষ্ট, অধরা।
হঠাৎ সে এলো দৃপ্ত পদক্ষেপে, প্রত্যয়ে নির্ভীক ;
মুহূর্তের করস্পর্শে হলে তুমি মুগ্ধ স্বয়ংবরা !

রিক্তা

তোমার অঞ্জলি থেকে হৃৎকমল যার পায়ে স্বেচ্ছায় স্খলিত
তার বুক ঠাণ্ডা হিম ? তার নাকি পাথরের মুখ ?
চিন্ময় কুসুমটিকে ছিঁড়ে ফেলো, তরঙ্গে ভাসাও,
যেদিকে দুচোখ যায়, যাও ;
অর্পিত সর্বস্ব ? জানি। তবু কেন হবে
নিষ্প্রাণ বিগ্রহ ছুঁয়ে তর্জনীচিহ্নিতা
ত্রিকালের বিপন্ন কৌতুক ?

দেবী রায়

পরাহ্নবেলায়

ফিরে-যাওয়া ব্যতিরেকে আর কি আছে, কোনো উপায় ?
তল ঘেয়ে সে নেমে যাচ্ছে—নেমে যাচ্ছে নিচে
বাতাসে তার উড়ছে চুল, উড়ে যাচ্ছে আঁচল
তার সমস্ত অবয়ব, তাব চলমান ভঙ্গিমা, দিগন্ত কাঁপিয়ে
হাসি, সূর্যাস্তে একবার
শুধুমাত্র চোখের নিমেষে দেখা—বুকের গভীরে
রেখে যায় এম্নি স্বতেজ দাগ
কখনো কি জেনেছি আমি ? অন্ধকারে, চোখ মেলে
কাকে যে চেয়েছি নিরন্তর, অবিরাম বুকের শব্দে
দু'কানে বাজে
দু'চোখে ঝলকায় তার সমস্ত অবয়ব,
তার চলমান ভঙ্গিমা
দিগন্ত-কাঁপিয়ে হাসি······ ··

এবার একদিন

এবার একদিন ছেলের হাত ধ'রে
ভোরবেলার কুয়াশামাখা রাস্তায়
বেরিয়ে পড়েছি এরকমি আমার আমি-কে
দেখ্‌তে খুউব ইচ্ছে করে, অবিরাম টিকটিক
বাজে সময়,······যেনো ইচ্ছা, মৃত্যু, এসবি স্বাভাবিক
শারীরিক বেঁচে থাকাটাই অলৌকিক—
মনে হয় কখনো-কখনো, পিছিয়ে পড়া—
আর্তস্বরে, 'বাবা-আ' বলে ডাকে
আজ সে দোষারোপ করবে কাকে
স্বয়ং নিজেই নিজেকে
কিংবা, নিষ্ঠুর সেই নিয়তিকে

অনন্ত-আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, ভেঙ্গে-পড়া স্বরে,
দু'হাত তুলে, বলবে কী এবার :
'সে যে কী ভীষণ দীন দরিদ্র,' অসহায় !!

দুঃখ যে কাকে বলে

একমাত্র'ত বোঝে সেই
চিরন্তন
দুঃখ যে কাকে বলে ।

কাউকে কি বোঝে কেউ ?
এ জীবন—
রা-কাড়ে না, কোনো ছলে !

আয়, মন বেড়াতে যাবি :
দ'লে দিয়ে বুক
চ'লে গেছে যে—
কপাল ফেরে,

হোস্ না তুই বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া
ঘুরপথে 'নয়—যা
সোজা যা
দণ্ডের ভয়ে, রইবি কি তুই
দূরে দূরে ;
মনপ্রাণ এক করে' চা—

সর্বাগ্রে'ত বিশ্বাসের দাবী !!

জীবনানন্দ ও ইংরেজী কাব্য

আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যে জীবনানন্দ দাশ এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। চিন্তার মৌলিকতায়, কল্পনা এবং ভাবের বৈচিত্র্য ও প্রসারতায়, ছন্দ ও শব্দচয়নের অভিনবত্বে তিনি রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে অতুলনীয়।

গ্রামবাঙ্‌লার বর্ণাঢ্য রূপায়ণে জীবনানন্দের কবিতা স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। সেখানে কবির নিজস্বতা পুরোপুরি বর্তমান। যদিও তাঁর হেমন্তকালীন বাঙ্‌লার রূপ-বর্ণনায় আমরা বিদেশী সাহিত্যের আমেজ অনুভব করি, তবু আমরা জানি যে কবি মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী! বিদেশী সাহিত্যের ভাবে ও ছায়ায় লেখা কবিতাকে তিনি বিশেষ সম্মান দিতেন না। কিন্তু এও আমাদের মনে রাখতে হবে যে কবি ছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বিদগ্ধ এক ইংরেজী অধ্যাপক। হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই বিদেশী কাব্যের সুর ও ভাব তাঁর কবিতায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর এতে তো দোষের কিছু নেই। বরং এর দ্বারা বাঙ্‌লা সাহিত্য দেশ ও কালের পরিধি পেরিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর এরই জন্য হয়তো বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে বাংলা কাব্যের মূল্যায়ন করতে আমরা বেশী প্রয়াসী হই।

আধুনিক কবিতায় এ-যুগের যান্ত্রিকতা, অবক্ষয়, বেদনা ও গ্লানি সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ইংরেজ কবি T. S Eliotর কবিতায় এই যুগচেতনা প্রথম প্রকটিত হয়ে ওঠে। প্রথম যুদ্ধোত্তর-কালে সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয়, মানসিক অবসাদ ও অন্ধকার নেমে এসেছিল, যে আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক ভাবনার ইমারৎ ধ্বসে পড়েছিল, মানুষের বুদ্ধি ও মননে যে নিষ্ক্রিয়তা, নিস্পন্দতা, নিঃসংগতা ও আচ্ছন্নতার ঘোর লেগেছিল, তা জীবনানন্দের স্পর্শসচেতন চিত্তকেও ক্ষতবিক্ষত করেছিল। বিদেশী আলো হাওয়াকে ছাপিয়েও যে চিন্তা তাঁকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করেছিল তা হল এক সর্বগ্রাসী মৃত্যু-বোধ।

এলিয়টের মতো তিনি মানুষকে বিক্ষিপ্ত হাড়ের মত ইতস্তত: ছড়ানো পেলেন। Webster প্রসংগে এলিয়টের উক্তি কবির ক্ষেত্রেও স্মরণীয় :

"Webster was much possessed by death,
And saw the skull beneath the skin."

("Whispers of Immortality)

এলিয়ট পৃথিবীকে 'Waste Land' রূপে কল্পনা করলেন— এখানে সবি মেকি, সব ফাঁকা, সব মিথ্যা ও ভংগুর

Falling Towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal.

("The Waste Land")

জীবনানন্দও সভ্যতা ও সৃষ্টিতে অবক্ষয়ের সূচনা দেখতে পেলেন—

"দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাংগে
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।" ("পৃথিবীলোক")

এ কালের আধ্যাত্মিক ঊষরতা, অনুভূতিহীনতা ও অন্তঃসার-শূন্যতাকে এমন ভাবে আর কে তুলে ধরেছেন—

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw

(T. S. Eliot : The Hollow Men)

পৃথিবীর 'ভিতরে অসুখ'—'সৃষ্টির নাড়ীর পরে হাত রেখে' জীবনানন্দও টের পেয়েছেন। 'পরস্পর' কবিতায় নারীর বর্ণনা লক্ষণীয় :

'চেয়ে দেখি, দুটো হাত, ক'খানা আংগুল
একবার চুপে তুলে ধরি ;
চোখ দুটো চূণ-চূণ—মুখ খড়ি-খড়ি।
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি—একেবারে মেকি !'

২

জীবনানন্দ ছিলেন স্বপ্নতন্ময় রোমান্টিক। তাই ইয়েটস্‌, এলিয়ট প্রমুখ কবিদের চেয়ে Romantic কবিদের সংগেই তাঁর একাত্মতা ছিল বেশী নিবিড়। শহরের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে প্রকৃতির শান্ত সজল স্নিগ্ধ পরিবেশ তাঁর কবিতার পটভূমিকা। তাঁর অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসা ও তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি Keats কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি রূপ-রং-গন্ধ-স্পর্শ দিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চেয়েছেন। কীট্‌সের 'Beauty—beauty that must die' জীবনানন্দীয় জগতেও বর্তমান।

"সৌন্দর্য্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে।"

পৃথিবীর দুঃখ-লাঞ্ছণা ও বাস্তবের রূঢ় আঘাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কীট্‌স্‌ Ode to a Nightingale এ কল্পনার গজদন্ত মিনার আশ্রয় করেছেন। তিনি ভুলে যেতে চেয়েছেন—

"the weariness, the fever and the fret." আরও
"where but to think is to be full of sorrow
And leadan-eyed despair."

নাইটিংগেলের জগতে তাঁর অভিসার এক স্বপ্নগাঢ় পরিবেশ রচনা করেছে :

O for draught of vintage, that hath been
Cooled a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country green
Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!

জীবনানন্দও জীবনসমুদ্রের আবিলতা থেকে মুক্তি চেয়েছেন। ভুলে যেতে চেয়েছেন 'শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর।' অবসরের গান' কবিতায় পল্লীর হৈমন্তিক উৎসবে তাই তিনি মেতে উঠেছেন। 'অলস মাছির শব্দ' কবিকে তন্দ্রালস করে দেয়। (The murmurous haunt of flies on summer eves" : Keats)

"এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা"
"মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে।"

কীট্‌সের মতই এক রঙীন বাসনায় কবির মন নেচে উঠেছে—

"অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে নেবো তার শীতলতা;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।"
"কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে।"

কীট্‌স্ চেয়েছিল indolence-এ নিজেকে আবিষ্ট রাখতে। জীবনানন্দও চেতন ও অচেতনের মধ্যে বাধা সরিয়ে এক অলস বিবশতায় নিজেকে আচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন—

"জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালবেসে।"

Ode to a Nightingale-এ সৌন্দর্য্যবোধ ও আনন্দানুভূতি অবিমিশ্র ও দীর্ঘস্থায়ী নয়। সব রূপ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা যাই-যাই ভাব এসে কল্পনাকে করুণ করে তুলেছে। পাখীর গান কবিকে অমৃতের স্বাদ দিয়েছে বটে, কিন্তু এ-সুখকে চিরতরে ধরে রাখা যায় শুধু মৃত্যুকে বরণ ক'রে। তাই মৃত্যুর প্রতি কবির করুণ আর্তি:

"I have been half in love with easeful death"
"Called him soft names in many a mused rhyme"

জীবনানন্দের কবিতার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এই মৃত্যু-চেতনা। প্রকৃতি, ইতিহাস এবং সর্বত্র মৃত্যুর ছায়া পড়েছে—"সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ।" ("মৃত্যুর আগে") "জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ" ("জীবন")

[এখানে T. L Beddoes-র সর্বগ্রাসী মৃত্যুবোধও স্মরণীয়—"Men call him death, but comfort is his name." "The Brides' Tragedy]

"তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—
অবিরত তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।"
(বৈতরণী)

এই মৃত্যু-কামনা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সূচিত না করে বরং জীবনের প্রতি গাঢ় মমত্ববোধের ইংগিত দেয়। মৃত্যুকে যিনি প্রিয়-সম্ভাষণ করতে পারেন তিনি নিশ্চয় জীবনকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন

'মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন।—
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ' ('জীবন')
"তাই আমি প্রিয়তম ; —প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক"—
"মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে।"

শেষ উদ্ধৃতিটি যেন কীট্সের পংক্তির ভাবান্তর। এই মৃত্যুরহস্য যে শুধু সাগরপারের কবিকুলকেই বিচলিত করেছে তা বলতে পারি না। সমসাময়িক বাঙালী কবিদের চিন্তায়ও মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। জীবনানন্দের মনোজগতের সংগে সমকালীন যে কবির সবচেয়ে বেশী ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। (যাঁর সম্বন্ধে কবির উক্তি স্মরণীয় : "তিনি আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশা-করোজ্জ্বল চেতনা" : "কবিতার কথা"।) উভয়েই নিঃসংগতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু যেখানে জীবনানন্দ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রধানতঃ বুদ্ধি ও যুক্তির আলোয় আলোকিত। তাঁর প্রজ্ঞাবাদী চেতনায় মৃত্যু ধ্রুব সত্য রূপে বিরাজমান : "মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে।" ("দ্বন্দ্ব," "উত্তরফাল্গুনী")

৩

শেলীর সংগেও কবির ধ্যান কল্পনার কিছু মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। পার্থিব জীবনের অপূর্ণতা, গ্লানি ও ব্যর্থতা; এক পূর্ণতর জীবনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, একদিকে প্রেমের বেদনা, অপরদিকে প্রেমের অম্লান রূপ ও শক্তি; স্বপ্নময়তা, সর্বোপরি এক অলৌকিক ভাব-লীনতা—দুজনের কাব্যজগতে বর্তমান—এ যেন এক অপার্থিব রহস্যময় আলোয় অভিস্নান।

Thorns of life-এ বিদ্ধ শেলীর অভিসারী চেতনা মুক্তি খোঁজে অসীমে, নীলিমায়, ঢেউয়ে, গাছের পাতায় বা শিশিরে। বিকৃত জীবনখাতায় বিতৃষ্ণ, হতাশার যন্ত্রণায় কাতর কবি জীবনানন্দও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন 'পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে/হৃদয়ে বেদনা জমে'। শেলীকে চঞ্চল করেছিল "devotion to something afar/From the sphere of our sorrow." জীবনানন্দ বুঝেছিলেন—

> "দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
> ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
> হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
> ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়।" ("স্বপ্নের হাতে")

তাই তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

> "দূরে-দূরে আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
> নিঃসহায় মানুষের শিশু একা—অনন্তের শুক্ল অন্তঃপুরে
> অসীমের আঁচলের তলে!" (সেদিন এ ধরণীর)

কল্পলোকে প্রয়াণের Vision রোমান্টিকরা দেখতেন। সেই জগতের ইসারা পেতেন প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে—ফুলের সৌন্দর্য্যে, পাখীর উল্লাসে। শেলীর To a Skylark ও জীবনানন্দের 'সিন্ধুসারস' পাখীর আনন্দকে কেন্দ্র করে রচিত। skylark-র সংগীত-লহরী ও প্রখর সূর্য্যালোকে ওড়াওড়ি শেলীকে আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বপ্নমগ্নতা বেশীক্ষণের জন্য স্থায়ী হয় না। এই ব্যথাভরা জীবনের

করুণ আবেদনে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না! তাই তিনি বলে ওঠেন—

We look before and after,
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught.

সাদা পাখির নৃত্য জীবনানন্দকেও উল্লাসিত করেছে। কিন্তু সেটা 'দু'এক মুহূর্ত শুধু। চিন্তা, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বিসর্জন দিয়ে তিনি পাখীর গানে তন্ময় হয়ে যেতে পারেন নি। বরং তাঁর বেদনা তীব্রতর হয়েছে: "হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান।" আবার skylark-র মতো idealisation

"তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
...   .
নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।"

লোকালয় থেকে বহুদূরে সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী কোনো চিরশ্যামল দ্বীপ রোমান্টিক কবিমানসের কাছে বহুব্যবহৃত একটা escape image. শেলীর প্রিয় symbol গুলোর মধ্যে প্রধান হল সমুদ্র ও নন্দনকানন-সদৃশ দ্বীপ। Epipsychidion এরকম একটা দ্বীপে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের কাহিনী। জীবনানন্দের কবিতায়ও এরকম একটা নির্জন ছায়াছন্ন দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যায়। বনলতা সেনের সংগে এরকম একটা সবুজ ঘাসে ভরা 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' দেখা।

শেলীর অন্যতম রীতি হল প্রাকৃতিক পরিবেশকেও জীবন্ত করে তোলা; বিশেষ করে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশে—বাতাস, সমুদ্র, নদনদী ও প্রান্তরে—যৌনচেতনা আরোপ করা। এর বিশিষ্ট ব্যবহার পাই Epipsychidion-এ। সুনীল আকাশ নত হয়ে পাহাড়কে স্পর্শ করছে—এটা যেন উপপত্নীকে স্পর্শ করার সামিল। সূর্য্যের তেজে কুয়াশা কেটে গেছে; দ্বীপের ঘোমটা সরে গেল—নগ্ন বধূর মত সব সৌন্দর্য্য চোখে ধরা দিল ("Like a naked bride......blushes

and trembles at its own excess") জীবনানন্দীয় কাব্যেও প্রকৃতি নিরেট জড়পদার্থ নয়। প্রকৃতি তাঁর কাছে নারীরূপে প্রতিভাত। গাছপালা, জীবজন্তু, নদনদীতে এক নারীসত্তার প্রকাশ। অন্ধকারবিলাসী কবি আঁধার-কল্পনায় ইন্দ্রিয়ঘন আবহ রচনা করেছেন—

"অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।" (অন্ধকার)

"অবসরের গান" কবিতায় মাটি, মাঠ ও ধান দেহের স্বাদ ও গন্ধের পসরা নিয়ে উপস্থিত :

> "চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
> তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল।"
> "আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
> বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—।"

৪

পরবর্তী যে-কবির সংগে জীবনানন্দের মানসিক সান্নিধ্য খুঁজে পাওয়া যায় তিনি ম্যাথ্যু আর্ণল্ড। আধুনিক সভ্যতার সংকট প্রথমে তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট রেখায় ধরা পড়ে। জনৈক সমালোচকের মতে তিনিই হলেন প্রথম modern (ইংরেজ) কবি যিনি এ-যুগের মানুষের অন্তরসত্তার দ্বৈধতা (divided consciousness) মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর সময়কার গতানুগতিকতা ও যন্ত্র-সর্বস্বতাকে মেনে নিতে পারেন নি। দুই যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি কোনো স্থির নির্দিষ্ট পথের নিশানা খুঁজে পান নি। কবির ভাষায়—

> "Wandering between two worlds, one dead,
> The other powerless to be born."
>
> (The Grand Chartreux)

কবির বিপন্ন দৃষ্টি পৃথিবীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দ্বারা মোহিত হয় নি। বস্তুত এখানে আনন্দের কোনো অবকাশ নেই—

Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain.
Swept with confused alarms of struggle
and flight,
Where ignorant armies clash by night.

এই আঁধার-ম্লান জীবনে আশার ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে রাখতে কবির তাই প্রেমিকার কাছে করুণ আর্তি :

Ah, love, let us be true
To one another.

প্রেমে, সত্যে, ধর্মে ও সুন্দরে রবীন্দ্রনাথের যে 'সান্দ্র বিশ্বাস' তা একালের কবি হিসাবে জীবনানন্দের ছিল না। আর নতুন কোন স্থির লক্ষ্য, আদর্শ বা অধ্যাত্মের সন্ধান তিনি পান নি। তাই তাঁর অবস্থা হয়েছে দিগ্ভ্রান্ত দিশাহারা নাবিকের মত।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির করে নিতে গেলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স। ("বিভিন্ন কোরাস")

তবু এই অনিত্য, ক্ষয় ও বিন্যাসের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রেমের কালজয়ী ও শুভ শাশ্বত রূপকে—

১. সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি : ("মিতভাষণ")

২. তুমি যদি বেঁচে থাক—জেগে রব আমি এই পৃথিবীর 'পর—
যদিও বুকের পর রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর। ("প্রেম")

বাস্তব জীবনে মোহভঙ্গ কবিকে করে তুলেছে নিঃসংগ। আর্নল্ডের মত তিনি সতৃষ্ণনয়নে অতীতের দিকে তাকিয়েছেন—অতীত তাঁর কাছে রূপকথা হয়ে ধরা দিয়েছে। আবার কখনও প্রকৃতির

শান্তি ও স্নিগ্ধতায় আশ্রয় খুঁজেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমিকা এই রণক্লান্ত পৃথিবী থেকে দূরে এক দ্বীপের মত প্রতিভাত—

"সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ"।

নির্জনতার কবি আর্ণল্ডকেও To Marguerite কবিতায় মানুষকে খণ্ড খণ্ড দ্বীপের সংগে তুলনা করতে দেখি—

Yes : in the sea of life enisl'd,
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone

৫

উপরের আলোচনায় আমি জীবনানন্দের সংগে উনবিংশ শতকের ইংরেজ রোমান্টিকদের ভাবসাজুয্য দেখাতে চেষ্টা করেছি। শিল্প প্রকরণের ক্ষেত্রেও পশ্চিমী কবিদের দারুণ ভূমিকা রয়েছে। সে আলোচনা পৃথকভাবে করার ইচ্ছা রইল।

ঋভুরঞ্জন রায়

সুনীলকুমার নন্দী

কৃষ্ণনগর মুখোশ জোগায়

মুখের শোভন চারুকলায় আলতো খোলা তোদের বিনয়
কতটা যায়?
অধিক হ'লেও শহরতলী,
তারপর যে কখন কী হয়
মাঠের পরে মাঠভাঙ্গা গ্রাম
গ্রামান্তরে
পা বাড়াতে
আল-ছাপানো ঝোপড়া ঘাসের অবাধ্যতা
খসলো বিনয়···
পিছল
খোন্দল
পাথরকঠিন মাটির ঢেলা
এগিয়ে আসে হা হা মাঠের তোবড়া আদল
এগিয়ে আসে ছায়ার মতো, জড়ায় কেমন মুখের রেখা।

তা হলে কী ঠুনকো, যেন
কৃষ্ণনগর মুখোশ যোগায়
তোদের মুখের অমন শোভন চারুকলায়।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

অরুণবাবুর 'যেন কিছুই হয়নি' পড়ে

কেন কিছুই হয় নি
যদিও মনে হয় অনেক কিছুই হয়ে গেছে
অন্যে তাই ভেবেছিল
যারা সব সময় খবর চায় গল্প চায় যা না-চাওয়ার সবই চায়
টেবিলে কনুই রাখা দূরে থাক
চেখে চোখে তাকিয়ে কিছুই ভাষা হয়ে পড়ে নিক' ঝরে
বোবা-ধরা নির্বোধ পৃথিবী ঘুমন্ত আমাকে
গভীর গভীরতর ঘুমের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল
বুঝতে পারি নি
নিজের পায়ের নিচের মাটি আমি নিজেই কাটছি।

মানস রায়চৌধুরী

দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা ঘটে যায় এই বয়সেও
হাতে হাত ছুঁয়ে যায় গন্ধকে আগুন
তারপর মনে হয় অস্পষ্ট থাকাই ভালো ছিল
ভাগ্যলিপি কে খণ্ডাবে
হাতে হাত ছুঁয়ে যাবে দৈবাৎ কখনও
দৈবের মুকুর ভেঙে দেখা দেবে করুণ পারদ
স্মৃতির কুয়াশা ভেঙে উঁকি দেবে উজ্জ্বল মুখশ্রী
যার হাতে লেগেছিল অলক্ষ্য স্পর্শের চন্দ্রোদয়
তার বাগানের গাছে চিরদিন জোনাকির মৃদু আলোছায়া
গলিচা বিছানো এক উৎসবের রম্য প্রতিচ্ছবি
সে সবই লৌকিক থাকে
অলৌকিক হয়ে ওঠে আঙুলে আঙুল।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মন্দিরেই যাবে

প্রাসাদ করেছে তুচ্ছ, তার পাশে নগণ্য মন্দির।
সন্ধ্যায় কাসর বাজে শঙ্খ বাজে : কোথায় দেবতা ?
নগ্নচিত্র থেকে উঠে রঙিন সম্পর্ক পিছে ফেলে
আসছে নৈবেদ্য হাতে নিজে নারী শিল্পের সমিধ।

অসামান্য সে দেবতা—প্রিয়, ও সমান অসহায়
শিল্পীর মতন তার নখে নেই রক্তের ফোয়ারা
সে দেখে চোখের কান্না, শোনে স্থির দুঃখের কাহিনী
অথচ আনন্দ প্রেম বেদনা সে দিতে কি সক্ষম ?

নারীর প্রার্থিত আর কিছু নেই, সমর্পণ আছে
মৃত শিলাখণ্ডে শান্তি—শীতলতা উপেক্ষা বিস্মৃতি ;
ব্যথার শরীর নিয়ে আর কোথা যাবে সে অভাগী ?
দেবতা অশক্ত, তবু মন্দিরই তো একান্ত নির্ভর ॥

আনন্দ বাগচী

কোন কাজেই মন বসে না

কোথাও এখন ফেরা হয় না, ঘরের মধ্যে ঘরের বাইরে,
ডাকের চিঠি জমতে থাকে কারো কাছেই যাওয়া হয় না,
টাইম টেবল উল্টে দেখি, টিকেট কেবল কাটা হয় না
টেলিফোনের ডায়াল এবং ঘড়ির ডায়াল ঘুরতে থাকে,
ফ্রিজের মধ্যে জমাট গল্প, রৌদ্র ছায়ার জটিল ছবি
আয়না ছুঁয়ে আয়না ছেড়ে ট্রেনের মত আসছে যাচ্ছে
যেন নাগরদোলায় রঙ্গ ঊর্ধ্বে শূন্য নিম্নে শূন্য

কোন কাজেই মন বসে না, গ্লাসের মধ্যে আইসকিউব
বাজতে থাকে ট্রেনের বাঁশী, সমুদ্রতীর পাহাড়তলী
কোথাও যেন ভুল করেছি, হিসেব এখন হাতের বাইরে
অনেক কিছুই ফেরত হয় না চিঠির মত কথার মত
আমার কিছু সময় আছে বিপজ্জনক নারীর হাতে।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

জাদুকরী

নিশ্চিত তোমাকে চিনি।
দৃষ্টি যদি ব্যাপ্ত থাকে দূরে
কর্ণমূলে বাজাও শিঞ্জিনী

রুদ্ধ হল যদি বা শ্রবণ
রসনায় সাজালে বিক্ষোভ
লোভ, ওগো লোভ
ঘুরিয়ো না বিভ্রম-কাঁকন।

ত্বক যদি ছুঁয়েছ আঙুলে।
মুহূর্তে আপ্লুত হবে দেহ
কর্ণিকার পলাশ ও শিমূলে।

লোভ জাদুকরী,
আয়ুধ সংবৃত করো
নিদ্রা চায় আহত শরীর।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

একটি সজল অপরাহ্নের স্বীকারোক্তি

ঘুরে ফিরে প্রেম ছাড়া মন টেঁকে না। যতই অন্যত্র
মনকে বেঁধে রাখতে চাই ততই গাঁটছড়া খুলে
হুড়িনীর মতো, ঠিক নিষিদ্ধ আস্বাদনে মগ্ন।

একটি দৈহিক অনুভূতির মাধ্যাকর্ষণ বারবার
আমার মনের তারকে নামিয়ে নিয়ে আসে।

অথচ যখনই দৈহিক অনুভূতি আকর্ষণ আমার শরীরে সুস্পষ্ট
হয়ে আসে, তখন আমার বিহ্বলতা আমাকে লজ্জা দেয়,
এই ভাবে প্রেমের প্রগাঢ় বোধের মধ্যে অবগাহন করতে করতে
আমি কখনও স্থির বেলাভূমিতে পা রাখতে পারবো
কিনা জানি না। একজন সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে, সে কি জানে
একজন অপটু প্রেমিকের পক্ষে সমুদ্রস্নান কি
অসাধারণ বিপজ্জনক !

সেই দর্শক সেই আকণ্ঠ-নিমজ্জিত দর্শক
দুই-ই আমি।

অমর ষড়ংগী

হৃদয়ের প্রতি

হে হৃদয়, তুমি ভোলো আমি ভুলি···সকলেই ভোলে।
শাক দিয়ে মাছ ঢেকে বিড়ম্বিত করব না জীবন ;
হৃদয় তুমিই থেকো অগোচরে মূঢ়ের মতন
বাক্স-বন্দী করে রাখা অসম্ভব, টাঙানো দেয়ালে
কত ছবি···স্বপ্ন সব মধু স্মৃতি অথবা হতাশ

কেউ পূর্ণ কেউ বা অপূর্ণ, নিয়ন্ত্রিত শূন্য হাত
আশীর্বচন ব্যাপ্ত কপাটে অনেক দুঃখ জমা হয়ে থাক
পরোক্ষে তোমার ছবি, খুলে ফেলে সব অন্তর্বাস
যেমন অস্থির চিত্তে ইন্দ্রিয়ের অদূরদর্শিতা
দেখানো বিলাস ছিল, পরিদৃশ্য বাষ্পাকুল কথা —
সবকিছু ভুল আজ একদিন সকলেই ভোলে
বয়ঃক্রমে অন্তরীণ অভিপ্রায় স্বপ্নের কল্লোলে।

রবীন আদক

বুকের ভিতর

বুকের ভেতর বিসর্জনের বাজনা
আজ না,
অন্য দিন এসো, তোমার সময় হয় যদি
দেখছ না আজ চোখের ওপর দাঁড়িয়ে আরেক নদী !
অনেক দূরে ফিরতে হবে একে
কে কে
ভাসাবে ফুল, প্রিয় পুতুল জলে ?
কাদের দেহের জোৎস্নাটুকু উন্মোচিত হলে
অভ্র মুকুর বিকেলবেলার নদী
রাত্রিশেষে পৌঁছে যায় সমুদ্র অবধি ?

প্রসাদী ফুল, ছিন্ন বকুল জলের ওপর ভাসে,
নির্জনের অন্ধকারে যে-কোন উদ্ভাসে
পার্থিব প্রতিমা
পৌত্তলিক স্বপ্নে ডোবে, সহজতার সীমা
ক্রমান্বয়ে ভাঙছে, ভাঙুক—
চিত্রিত এক স্তব্ধ চিবুক

আকাশময়
শিয়রে তার বনের রেখা, শব্দে ভয়!
বুকের ভেতর শব্দ তবু অনশ্বর
গোপনচারী দুঃখ জানে আপন-পর,
তাইতো ভয়
আজ না, তুমি পরেই এসো, আজকে আমি নিঃসময়।

স্বপ্না মজুমদার

নীল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সবুজ

পর্দা অনেকক্ষণ উঠে গেছে।
বিরাট রঙ্গমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আমি একা।
লক্ষ লক্ষ বহুরূপী অভিনয় করে চলেছে।
রাজা হচ্ছে নীল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে বেগুনী···
মন্ত্রী হচ্ছে বেগুনী থেকে কমলা, কমলা থেকে সবুজ···
সেনাপতি হচ্ছে সবুজ থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে লাল···
আমি দেখ্ছি এবং দেখ্ছিই।
দেখতে দেখতে অধৈর্য হয়ে গেছি।
দিশাহারা হয়ে ছুটে গেছি মঞ্চের সামনে।
চিৎকার করে বলেছি,
"থামো সবাই, আমি তোমাদের
আসল রঙ্ দেখতে চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি,
লক্ষ লক্ষ আঙুল দেখাচ্ছে আমাকেই।
চম্‌কে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি,
আমিই কখন বহুরূপী হয়ে গেছি।
রঙ্ পাল্‌টাচ্ছি ক্রমাগত,
নীল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সবুজ, সবুজ থেকে······

অরুণ দে

গোলাপ জিজ্ঞাসা

গোলাপ, তুমি কেমন করে গোলাপ হলে
কেমন্ করে হাওয়ায় তোমার গন্ধ ঢালো
যাও, ভেসে যাও, টলমলটল নদীর জলে
দাও, বলে দাও, গোলাপ আমার দিন ফুরালো

সাম্প্রতিক অসমীয়া সাহিত্য

গত কয়েক বছরের অসমীয়া সাহিত্যের গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে উপন্যাসই এই সাহিত্যের মুখ্যস্থান জুড়ে রয়েছে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছেন আবদুল মালিক। "সুরুজমুখীর স্বপ্ন,' 'কণ্ঠহার,' 'আধারশিলা' ইত্যাদি উপন্যাসে ইসলাম জীবন ও ধর্ম নিয়ে নানা বিশ্লেষণ আছে। 'রজনীগন্ধার চাকুলো'তে বা বাগানে জীবন স্পন্দন, স্যাটায়ার ধর্ম, 'বিহু মেটেকর ফুল' এ শিলং এর উচ্চবিত্ত সমাজের শূন্যগর্ভতা লেখক নিপুণ হাতে ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন। সামগ্রিকভাবে উপন্যাসগুলি অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে নি। পদ্ম বরকটকীর'কোনো খেদ নাই'তে আসামের যুগবিশেষকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, 'জীবন অরনি'তে গণতন্ত্রের পরিহাস আলোচিত হয়েছে। 'জীবন-এষণায়' পদ্ম প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। সামাজিক অবক্ষয় ও যৌনকামনার চিত্র এঁর উপন্যাসে অপূর্ব ফোটে। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত তাংখুল নাগা-জীবনভিত্তিক উপন্যাস 'ইয়ারু ইংগমের' ভাষা ভীষণ জোরালো। কিছু চরিত্র খুবই জীবন্ত। 'শতঘ্নী' ভারত-চীন যুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। 'মৃত্যুঞ্জয়' চল্লিশ দশকের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে লেখা। 'প্রতিবাদ' ধর্মঘটের পরিপেক্ষিতে লেখা অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। আদর্শবাদী বীরেন্দ্র লেখায় ভীষণ আন্তরিক। যোগেশ দাসের 'ত্রিবেদী' (হাস্য পরিহাস মূলক তিনটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের সমষ্টি) 'চা জুই চেদি' বিবাহিতা ও অবিবাহিতা দুই বোনের দ্বন্দ্বময় মানসিকতার চিত্র। 'ধূলি আরু ইতিকথা' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিলক দাসের 'মিলনর পথ রুদ্ধ করি.' 'এই রং এই সুরভি' পরতে ভাল লাগে। প্রথমটিতে কাচারী উপজাতীয়দের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টির আঞ্চলিক পরিবেশ প্রশংসনীয়। কামাখ্যা সভাপণ্ডিতের 'নগরর ধূলি,'

'রক্তত্ৃষ্ণা' বৈশিষ্ট্যহীন। 'জীবনায়নে' নারী জীবনের দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটেছে, 'জীবনর দাবী'তে প্রেস কর্মীদের সমস্যাসকুল জীবনের চিত্র চমৎকার এঁকেছেন তিনি। হোমেন বরগোহাঞি শক্তিশালী লেখক। 'সুবালা' ত্রুটি মুক্ত না হলেও মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বলিত 'তান্ত্রিক' অবশ্যই উঁচুদরের রচনা। 'কুশীলবে' রাজনীতির লড়াই এ সাংবাদিকতা কি ভাবে নোংরামির শিকার হয় তার যথাযথ ও নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। হোমেন যৌন বাসনার প্রকাশকে বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতার পরিচায়ক বলে মনে করেন। নারায়ণ বেজবড়ুয়া 'নতুন দিগন্তে' বিরক্তিকর জ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন। 'মৌনতার অন্তরাল' কাহিনীগত বৈচিত্র্য ছাড়াও লেখার মুন্সিয়ানায় ঝলোমলো। নিরুপমা বরগোহাঞির 'এজন বুঢ়া মানুহ' স্মরণীয় উপন্যাস। কাহিনীর বৃদ্ধ নায়ক যখন তার স্ত্রীর স্মৃতি-চারণায় নিমগ্ন হয়, তখন সে বর্ণনার কুশলতা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবী রাখে। 'সেই নদী নিরবধি'র থিম জোরালো, ঘটনা পারম্পর্য সর্বতো-ভাবে যুক্তিগ্রাহ্য নয়। লক্ষ্মীনন্দন বরার 'নিশার পূরবী' প্রত্যাশা পূর্ণ করেনি। তাঁর'চা-জুইর পোহারাট'নওগাঁ অঞ্চলের সোনাই নদীর বাজুলি দ্বীপের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। অন্যান্য উল্লেখ্য উপন্যাস হল নবীন চন্দ্র ডেগার উপজাতীয় জীবন সম্পর্কিত 'এম-এল এ', কুমার কিশোরের 'শতাব্দীর স্বপ্ন,' ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হিতেশ ডেকার 'আয়েতো জীবন,' পশু পতি ভরদ্বাজের 'উড়ন্ত মেঘের চা' (সমাজের নিচুতলার লোকেদের জীবন স্পন্দনের নিখুঁত দলিল), বীরেশ্বর বরুয়ার মন জেটকর পট,' ভবেন দত্ত বরুয়ার 'বনজারা', দুলাল বরদলুইএর 'মেঘে ঢাকা তারা,' ধর্মেশ্বর বাকটীর 'মায়ামৃগ,' যদু বর পূজারীর 'প্রাণগদার সুর,' বিনোদ শর্মার 'কুহকিনী', বনমালী দাসের 'জিয়া গভারু,' নীলিমা দত্তের 'আকাশবতী', প্রসন্ন কুমার ডেকার 'প্রিয়তমাসু', (চরিত্র উপস্থাপনা ও মানসিক দ্বন্দ্বের সুসম বিশ্লেষণের জন্য স্মরণীয়), রোহিনী কুমার কটকীর 'এজক এন্ধার', 'এক নক্ষত্রর নিশা', রাম হাজারিকার 'জেনাকীর বিয়া,' (গ্রাম্য জীবনে কল কারখানার অনুপ্রবেশের চিত্র), অমূল্য বরুয়ার 'এই পদুমণি', (জেলেদের জীবনের বিচিত্র কাহিনী) ইত্যাদি।

অসমীয়া ছোটগল্পে প্রেমই মুখ্য স্থান জুড়ে আছে মানব মনের তথা সমাজের অন্য সমস্যা নিয়ে কেউ তেমন লিখছেন না। ছোট গল্পের গতি প্রকৃতি ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্তে যে উৎকর্ষ পঞ্চাশের দশকে সাধিত হয়েছিল সেই উৎকর্ষ অতি আধুনিক অসমীয়া ছোট গল্পে অনুপস্থিত। বিশিষ্ট ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে যাঁদের নাম অবশ্যই করা উচিত তাঁরা হলেন হোমেন বরগোহাঈঁ ('প্রেম আর মৃত্যুর কারণে,' 'গল্প আরু নকশা,' বিভিন্ন নরক'), বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ('কলাং আজিও বয়'), প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী ('নিতে নব রূপতার'), লক্ষ্মী নন্দন বরা ('অচিন কন্যা', 'কচিয়ালির কুয়ালি', 'মাজত তৃষারে নাই', 'কঠিন মায়া'), যোগেশ দাস ('মদরর বেদেনা', 'হাজার লোকের ভীড়', 'হেজার ফুল'), ভবেন সাইকিয়া ('বৃন্দাবন', 'গহ্বর', 'সেন্দূর'), আবত্বল মালিক ('অস্থায়ী আরু অন্তরা'), 'বহুত বেদনা এতপা চাকুলো'), নীরদ চৌধুরী ('মোর গল্প,' 'অঙ্গে অঙ্গে শোভা', 'বায়ূ বহে পুরবৈয়া', 'সেন পুরওয়া'), ইমরান শাহ ('পিঁয়া মুখচন্দা'), সৌরভ কুমার বলিহা ('অশান্ত ইলেট্রন'), চন্দ্রপ্রসাদ সইকিয়া ('মায়ামৃগ'), লক্ষ্মীনাথ ফুকন ('মরমর মাধুর'), কৃষ্ণ ভুইয়া ('রামধেনু'), পদ্ম বরকটকী ('রীতার প্রেম'), কমকসেন ডেকা ('সূর্য পূরত উঠে', 'রঙ্গীন পর্দা'), প্রবোধ গোস্বামী ('বকুল য়েতীয় সরে'), বিনোদ শর্মা (গোধূলী গোপাল), অতুলানন্দ গোস্বামী ('হামদাই পুলর জন', 'গল্প'), প্রেমধর রাজখোয়া ('সুয়াগুরি'), স্নেহ দেবী ('স্নেহ দেবীর গল্প'), রমা দাস (জাহ্নবী) ইত্যাদি। এছাড়া মহিম বরা, সইত্বল ইসলাম, ললিত বরা, কনক মহান্ত, অণিমা ভরালী, নিরূপমা বরগোহাঈঁ, মামনি গোস্বামী, ডলি তালুকদার, যত্ন বরপূজারী, কামিনী ফুকন, অমূল্য বরুয়া ইত্যাদি নিয়মিত লিখে থাকেন।

গ্রাম্যজীবন নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠে লক্ষীনন্দন বরার রচনায়। মুমূর্ষু প্রাচীন ঐতিহ্য কেন্দ্রিক "মাজত তৃষ্ণারে নাই-"এ বর্তমান রুগ্ন সমাজ সম্পর্কে অসীম মমত্ববোধ আছে তাঁর। বাংলা গল্প দ্বারা প্রভাবিত নীরদ চৌধুরী কাহিনীর দিকে ততটা জোর দেননা যতটা

চরিত্র বিশ্লেষণের দিকে দিয়ে থাকেন। সৌরভ কুমার চালিহার 'অশান্ত ইলেকট্রন' বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প। লক্ষ্মীনাথ ফুকনের 'মরমর মাধুরী' আধুনিক বুদ্ধিজীবী জীবনের শূন্যগর্ভতার একটি চমৎকার দলিল। কৃষ্ণ ভুইয়াঁর 'রামধেনুর রং'এর চরিত্র বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। পদ্ম বরকটকীর 'রীতার প্রেম' কাহিনী ও চরিত্রে জ্ঞাপকতাধর্মী, লেখায় মুন্সিয়ানা তো আছেই। ভবেন সইকিয়া নিঃসন্দেহে অসমীয়া ছোট গল্পকারদের অতিবিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণের বিরল ক্ষমতা, ডিটেলের কাজ, ষ্টাইল ও হাস্যরস যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে গৌরবের বিষয়। 'গহ্বর' গল্পে মৃত কৃষ্ণাদের সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ড বিনিময়ে বেঁচে উঠে জনৈক শ্বেতাঙ্গ মৃতের বিধবাকে সহানুভূতি জানালে অন্য শ্বেতাঙ্গদের অসন্তোষ ভাজন হয়ে নানান অসুবিধা ভোগ করে। গল্পের উপস্থাপনা সত্যই প্রশংসার্হ। 'লাভ' এর কিশোরী নায়িকাকে স্নানরত অবস্থায় পাছে কেউ তার নগ্ন দেহ দেখে ফেলে এই লজ্জায় স্নান করতে সে সংকুচিত। তার অন্তর্দ্বন্দের কথা ভারী চমৎকার ফুটে উঠেছে। লেখকের 'সেন্দুর' গল্প-গ্রন্থ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

কবিতা দুর্বলই বলতে হবে। পত্র পত্রিকায় যা কিছু বেরোয়, পুস্তকাকারে খুবই কম প্রকাশিত হয়। হেম বরুয়া কবি হিসাবে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছেন। তাঁর লেখায় আধুনিক সমাজের বৈষম্য ও অসারতার চিত্র যথাযথভাবে ধরা পড়ে। যুগমানসের যন্ত্রণা ও অস্থিরতার চিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে: আমার মাথার মধ্যে পোকা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে,/কি যেন কুরে কুরে খাচ্ছে,/একটা, দুটো, একপাল,/আমি আর পারছি না: অসহ্য যন্ত্রণা, কামড়ে চলেছেই··· তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল: 'বালিচন্দা', 'মনময়ূরী'। নবকান্ত বরুয়া আরেক বিশিষ্ট কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ হ'ল: 'যতি আরু কৈতে মন', 'সৈকত', 'সম্রাট', 'রাবণ' (শেষ দুটি মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।) মানুষ নিজের কি ক্ষতি করেছে তা দেখে হোমেন বরগোহাঈ রীতিমত ক্ষুব্ধ। কেশব মহান্ত, বীরেন বরকটকী, নলিনী ভট্টাচার্য রাজনীতিতে

বিশ্বাসী হলেও নির্ধাতিত মানবিকতাকে ধ্বংস ও কুশ্রীতার হাত থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। আত্মকেন্দ্রিক নীলমনি ফুকনের রচনায় জাপানী, ফরাসী ও নিগ্রো কবিতার ছাপ পাওয়া যায়, দীর্ঘ কবিতা লেখা মাঝখানে বন্ধ থাকলেও ইদানিং মাথা চাড়া দিয়েছে। অতুল চন্দ্র হাজারিকা, লক্ষ্মীনাথ ফুকন, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, প্রসন্নলাল চৌধুরী বড় কবিতা লিখছেন। প্রসন্নলালের কবিতায় প্রবঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর এখনও শোনা যাবে। ভৃগুমুনি প্রকাশভঙ্গীতে সত্যই আন্তরিক:

> আকাশে বাতাশে বিশের গন্ধ ছড়িয়ে ব্যভিচারে সারা দেশটাই ছেয়ে গেল
> নিরীহ জনতা মরে বিনা কারণেই! জ্ঞানের সাগর মন্থন সারা হ'ল অমৃত
> কোথায় গেল? বিষ! হলাহল; ধ্বংসচিহ্ন চারিদিকে হাহা অট্টহাসে!

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কুলো খুড়োর সোতল' অন্তদৃষ্ট ও কাব্যগত ভাবনায় খুবই সুন্দর। রাজেন্দ্র প্রতাপ করণের লেখায় উনিশ শতকী প্রেমের কথা মনে পড়লেও কবির স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর 'বেদনার উল্কা' সরলতা ও প্রকাশের ঋজুতায় সত্যই সুন্দর। মহেন্দ্র বরার 'জাতিস্মর', অমলেন্দু গুহর 'তোমালাই', বীরেশ্বর বরুয়ার 'নির্জন নাবিক', নীলমণি ফুকনের 'নির্জনতার শব্দ' 'সূর্য হেলে নামি আছে এই নদীয়েদি' দেবচন্দ্র তালুকদারের 'শুকনাম্ন', পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবীর 'মন্দাকিনি', নির্মলপ্রভা বরদলুই এর 'বন ফাড়িঙ্গর রং' (শিশুদের জন্য লিখিত কবিতা ও গান) ইত্যাদি অন্যান্য বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। বীরেশ্বর বরুয়া স্যঁ জঁ্য পার্সের অনুসরণে কবিতায় নতুন সুর আনতে চাইছেন। তাঁর কবিতায় পৌরাণিক উল্লেখ ও ইতিহাস চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। 'কোনোবা শীতের এটি ববাগা সম্বিয়ট' রোম্যান্টিক ভাবনা ও কাব্যগত উৎকর্ষে প্রশংসনীয়। গানের সংকলন বের করেছেন লীলা গোগই, অতুলচন্দ্র হাজারিকা,

যোগেন্দ্র নাথ দাস, মুক্তিনাথ বরদলুই, জগৎ চেটিয়া ইত্যাদি। সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত 'চাটাই পরেবট আরুচিরি লুইট' পল্লী কবিতার একটি অবশ্য উল্লেখ্য সংকলন।

নাটক রীতিমত দুর্বল। জ্যেতিপ্রসাদ আগরওয়ালা বৌদ্ধ পট-ভূমিতে রচিত 'রূপালিম' এ পরিবেশানুগ নাট্যরস অনুপস্থিত নয়। তফজ্জল আলির 'নেপাটি কেনেকাই থাকো' প্রবীন ফুকনের 'ত্রিরঙ্গ'। সত্যপ্রসাদ বরুয়ার 'শাশ্বতী' একাংক নাটক। একাংক রচনায় ডঃ ভবেন সইকিয়া বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আঙ্গিক ও কাহিনীর উপস্থাপনায় তাঁর নাটক মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে। অন্যান্য একাংক লেখকরা হলেন হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেন চেটিয়া, ফনী তালুকদার, প্রফুল্ল বরুয়া, অতুল বরদলই ইত্যাদি। নকুলচন্দ্র ভুয়াঁর 'সুমালী কুঁয়ারী' (জনৈকা অহোম রাজকুমারীর কাহিনী), দণ্ডীনাথ কলিটার 'বীর চিলারায়', মালভোগ বরুয়ার 'নর সিংহ' উল্লেখের দাবী রাখে।

অসমীয়া প্রবন্ধ সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত। নকুলচন্দ্র ভুয়াঁর আসামের ভুয়া উপজাতি ও চা-বাগানের নানা আদিবাসী সম্পর্কে মূল্যবান আলোকসম্পাত করেছেন। বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া আসামের লোকগীতি সম্পর্কে লিখেছেন। কণকচন্দ্র শর্মার 'কুন্তী', জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার 'জ্যোতিধারা', লীলা গোগইএর 'অহোম জাতি আরু অসমীয়া সংস্কৃতি' বিশিষ্ট গ্রন্থ। সুপণ্ডিত মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত আসাম সাহিত্য সভা (সভার প্রভাব জনমানসে অপরিসীম, গ্রামে গ্রামে শাখা আছে) প্রকাশিত 'পবিত্র আসাম' এক স্মরণীয় সৃষ্টি। এদের 'আসামের জনজাতি' নেফা ও পাহাড়ি উপজাতিদের এক প্রামাণিক দলিল। এদের অসমীয়া সংস্কৃতি 'প্রবন্ধ সৌরভ', প্রবন্ধ চয়ন' ইত্যাদি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। আবদুস সাত্তারের 'সংমিশ্রনট অসমীয়া সংস্কৃতি' (অসমীয়া সংস্কৃতিতে মুসলমানী অবদান সম্পর্কে) অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ভবেন নারজির 'যোড়ে কচরির সমাজ অরু সংস্কৃতি' (তিব্বতী বর্মী বোড়ো উপজাতির জীবন ও সংস্কৃতি)

অসমীয়া সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। নারায়ণ খটোবর লিখিত 'বাহুয়ার সাংস্কৃতিক জীবনট এ ভূমিকি' (চা বাগান শ্রমিক সংস্কৃতির পরিচয়), ফটিক গোগই এর 'ভারতর বনরিয়া' (বন্যজন্তু সম্পর্কিত), অতুলচন্দ্র হাজারিকার 'মঞ্চলেখায়' আসাম রঙ্গমঞ্চের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। এঁর 'উচবর রাহঘরা' পালাপার্বন সম্পর্কিত এক বিশিষ্ট রচনা। প্রমোদ চন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অসমীয়া লোকোৎসব' আসামের লোকাচার পালাপার্বন নিয়ে লেখা। ভৃগুমুনি কাগ্যোং মিশিং বা মিরি উপজাতি সম্পর্কে অতি মনোজ্ঞ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন 'মিশিং সংস্কৃতির আলেক্ষ্য'। দেবেন আচার্যর 'অন্য যুগ অন্য পুরুষ' আন্তরিকতা ও সরসতার গুণে রসোত্তীর্ণ - সৃষ্টি রূপে গণ্য হবার যোগ্য। হোমেন বরগোহাঈর 'ধূসর দিগন্ত' বর্তমান জীবন সম্পর্কিত আলোচনা যদিও এতে বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাব বর্তমান। বিজয় চন্দ্র ভগবতীর 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা' একখানি অবশ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নবকান্ত বরুয়ার (Lamb এর সগোত্রীয় বলে মনে করা হয়) 'রমনিয়া' চিন্তার সূক্ষ্ম ছোঁয়া ও প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে এক চিত্তাকর্ষক দলিলে পরিণত হয়েছে। আসাম সংস্কৃতি পরিষদ, আসাম লেখক সমবায় সমিতি ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ বেশ কিছু ভাল বই প্রকাশ করেছেন।

সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কিত গ্রন্থের মধ্যে আসাম সাহিত্য সভা প্রকাশিত 'সাহিত্য সমীক্ষা' উল্লেখ্য। এঁদের আলোচনা গ্রন্থ ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলুই, নাট্যকার ও শিল্পপতি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক কবি অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর সাহিত্যকৃতির আলোচনা সমন্বিত বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। এঁদের 'বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য' ষাট বছরের অসমীয়া সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ভারি চমৎকার আলোচনা করেছেন। হীরেন গোহাঈএর 'সাহিত্যের সত্য' বিগত দশকে অসমীয়া, বাংলা ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ। নন্দ তালুকদাদের বনফুলর 'কবি

তুয়ৰা' ফেটে লেখা হলেও বিশ্লেষণত্মক নয়। মহেন্দ্র বরার 'ফুল তারাগণ', কমলেশ্বর শর্মার 'কবি চৌধুরী আরু চৌধুরীদেবর কবিতা' (রঘুনাথ চৌধুরী সম্পর্কিত), অতুল চন্দ্র বরুয়ার 'সাহিত্য দৃষ্টি', ভবানন্দ দত্তের 'রবীন্দ্র প্রতিভা', হেমন্ত কুমার শর্মার 'অসমীয়া সাহিত্যট দৃষ্টিপাত', সত্যপ্রসাদ বরুয়ার 'নাটক আরু অভিনয় প্রসঙ্গ', নবকান্ত বরুয়ার 'অসমীয়া ছন্দ শিল্পর ভূমিকা', বীরন বরকটকীর 'সাহিত্যের পটভূমি' ইত্যাদি সুলিখিত, উপেন্দ্র নাথ গোস্বামীর 'ভাষাবিজ্ঞান' ভাষাতত্ত্ব ও অসমীয়া ভাষা সম্পর্কিত মনোগ্রাহী আলোচনা। ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামীর 'আধুনিক গল্প সাহিত্য' (এ্যাকাডেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত), সত্যেন শর্মার 'অসমীয়া উপন্যাসকর ভূমিকা' উল্লেখযোগ্য। মহেশ্বর নেওগের 'আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য' আগের লেখা হলেও সংকলিত হয়ে এই সেদিন প্রকাশিত হয়েছে। ভবানন্দ দত্তের 'অসমীয়া কবিতার কাহিনী' আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত আলোচনার বই। যোগেশ্বর শর্মার 'কালিদাস আরু তপস্যার' পিছনে রয়েচে প্রচণ্ড অনুশীলন। অসমীয়া প্রবাদ, বাগ্‌বিধি, ধাঁধা, প্রবচন সম্বলিত 'রত্নকোষ' স্বর্গতঃ চন্দ্রধর বরুয়ার বিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বর্ণফসল।

পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মণিদীপ, অমর প্রতিনিধি, জোনবাই (শিশুদের জন্য), প্রহরী, বিস্ময়, রহিমালা (ব্যঙ্গ কৌতুক সম্বলিত) ইত্যাদি। 'অসমীয়া'য় সিরিয়াস রচনা বের হয়ে থাকে। আসাম বিজ্ঞান সভার মুখপত্র 'বিজ্ঞানজ্যোতি' একমাত্র বিজ্ঞান পত্রিকা। মিনি পত্রিকাও প্রচুর বেরিয়েছে।

শম্ভু মিত্র

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সুরূপা ট্রেডিং-এ মুদ্রিত ও উত্তরসূরি কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত।

জীবনানন্দের "সুদর্শনা"

প্রদ্যুম্ন মিত্র

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি,'…আর সেই স্বল্প কয়েকজনের মধ্যে জীবনানন্দের আসন. অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তির মতই বলতে হয়, একেবারে প্রথম সারিতে। তার কবিতার ক্রমিক বিকাশে বিধৃত হয়ে আছে আত্ম-অন্বেষার প্রগাঢ় যন্ত্রণা ও সিদ্ধির এক অকপট ইতিহাস, যার অন্বিষ্ট এক আলোকিত পৃথিবী, যার নায়ক "ভুলের বিনুনি থেকে" উদবর্তিত মানবহৃদয়। তাঁর কাব্য-পরিণতির পেছনে রয়েছে অনেক বিগত শতাব্দী ও আধুনিক সময়ের নবনব কাব্য-বিকীরণের আশ্বস্ত সুষমা। তাই তাঁর যে কোনও কবিতা পড়তে গেলেই তৎক্ষণিক উন্মোচন ও হৃদয়সংযোগকে ছাপিয়ে, অনুধাবনের ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে, ক্রমবিকাশী চেতনা ও পরিণতশীল শিল্প-রূপায়নের অপ্রতিরোধ্য পরিপ্রেক্ষিত।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় তাঁর বিশেষ একটি কবিতা। শ্রেষ্ঠ কবিতার (নাভানা) ভূমিকায়, মরণোত্তর কালে প্রকাশিত চিঠিপত্রাদি ও এমন কি "কবিতার কথা"র একটি নিবন্ধের (কবিতা প্রসংগে) সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি, জীবনানন্দ "আবহমান মানব-সমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায়" দেখেছেন, দেখে যে "সব সময়েই উৎস-নিরুক্তি" পেয়েছেন তা নয়। তবে, "কোনও কিছুকে চরম মনে করে কবিতা রচনার মধ্যে" তাঁর মতে "আত্মপ্রসাদ" নেই, আছে "এক বিশুদ্ধ কবি জগৎ সৃষ্টির" প্রয়াস। বড় আলোচনার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কাব্য-মানসিকতার পর্যায়-বিশ্বস্ত বিবর্তন ও তাৎপর্য অনুধাবনে এই সব সূত্রগুলিকে আমরা তাঁর কাব্যসৃষ্টির

বিশ্লেষণে আরও বিশদ ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারি। বর্তমান আলোচনার স্বল্লায়তনে সে সুযোগ নেই। তবু বলে রাখা ভাল, জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত আমার দুটি নিবন্ধে (প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা, ১৩৬১ ও ১৩৬৩) 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিস্তৃত পত্রে (কবিতা, আষাঢ় ১৩৬৪) এবং 'এক্ষণ' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির' এর উপর প্রথম বিস্তৃত আলোচনায় আমি একটি কথাই বার বার বলার চেষ্টা করেছি। সেটি হ'ল ; 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে (যা কবির 'প্রখর অভিভাবকতায়' প্রকাশিত) প্রতীকী তাৎপর্য কি ভাবে অর্থ-অনুধাবনের সহায়ক হয়ে ওঠে ; কি ভাবেই বা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র-ইন্দ্রিয়নির্ভর নিসর্গ ভাবনা পরবর্তীকালে চেতনালোকে উদ্ভাসিত কল্যাণ ও করুণার আশ্বাসবহ এক প্রকৃতিভুবনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ; কেমন করে সমকাল ও প্রতিবেশের শিকার প্রকৃতির সান্ত্বনার আশ্রয়চ্যুত মানবকে তিনি দেখেছেন 'ইতিহাসের সপ্রতিভ আঘাতে' অগ্রসরমান নাবিকের ভূমিকায়, "সৈকতের সত্যে" যার সমর্পিত অন্বিষ্ট।

'সুদর্শনা'র আলোচনায় মনে রাখা দরকার পরিবর্ধিত 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্গত এই কবিতাটি জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির সেই পর্যায়ের অঙ্গীভূত যখন প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেমকে তিনি উপস্থাপন ও অনুভব করেছেন, যখন প্রকৃতি তাঁর কাছে নিয়ত মরণশীল রূপের উপলব্ধিজাত বেদনার উৎস ও উৎসার মাত্র নয়, বরং শুশ্রূষা প্রশান্তির এক অপরাজেয় জগত যেখানে কবি-হৃদয় সচেতন নিমজ্জনে উৎসাহী। চিন্তা-মানসিকতার এই অপূর্বলব্ধ উদবর্তনের সঙ্গে এ পর্যায়ের কাব্যে লক্ষনীয়ভাবে উপস্থিত প্রতীকী চেতনার এক নবপ্রসূতি। সেই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র বড় নশ্বর নৈসর্গিক সৌন্দর্যানুভূতির দিনগুলি থেকেই জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতি ছিলেন সমস্ত

প্রতীকের জননী ঃ মেঠো চাঁদ, শিঙের মতন বাঁকা চাঁদ, কার্তিকের মাঠ কিংবা পেঁচা। নামকরণের নিতান্ত বাস্তবিক অর্থ অতিক্রম করে বলা যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে জীবনানন্দ প্রকৃতির যে পাঠ নিলেন তা এক ধূসর ম্লান হির্মাত জগৎ আর তার ব্যাপ্ত হৈমন্তিক বিষাদের। সে জগতে সময়ের হাত এসে সৌন্দর্যকে আঘাত করে যায়, প্রেমিকা নারীকে ডেকে নিয়ে যায়, যে আকাশ সেখানে "উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে," সেখানে "কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ জেগে ওঠে, ডুবে যায়", সেখানে গাছের শাখা নড়ে। "শীত রাতে—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন।" প্রকৃতির এই ব্যাপ্ত বিলয়ের পটভূমিতে প্রেম "ধূসর পাণ্ডুলিপিতে" কোনও অনশ্বর দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হয় নি ; তার অনুষঙ্গে এসেছে বঞ্চনা, হতাশা, ক্ষোভ, "যন্ত্রণার বিষ।" তবু, এ পর্যায়েও নিসর্গের অপরূপ অথচ মৃত্যু-আহত সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়-মগ্ন অনুভবে নিরত কবি বারবার জেনেছেন "প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি ;" তাই বলেন, "আমরা ফুরায়ে যাই, প্রেম তুমি হওনা আহত।" "ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে প্রকৃতি পটভূমি কি পরিপ্রেক্ষিত, কবির ভূমিকা সেখানে এক ঘনিষ্ঠ দর্শকের মুগ্ধ অবলোকনের। "বনলতা সেন" পর্যায়ে প্রকৃতি আরও বড় আরও গভীর চেতনার আয়তনে নবমূল্যায়িত। নিসর্গ তাঁর এ কালের কাব্যে জীবনের মূলাধার ; প্রকৃতিলীন এক সত্তার চেতনার উদ্ভাসে ঋদ্ধ। বন-লতা এই নামটির মধ্যেও নিসর্গের দ্যোতনা আভাসিত ; এ যেন এক প্রকৃতি (নিসর্গ) আশ্রিত হয়েছে আর এক প্রকৃতি (নারী)-র রূপকে। প্রতীকী-চেতনার এই নবপ্রসৃতির তথ্যটি স্মরণে রেখেই আমাদের জীবনানন্দের এ কালের কাব্য পড়া উচিত। এখানে প্রেম প্রকৃতির শোভাভূমিকায় উপস্থিত যেমন তেমনই নারী এসেছেন বারবার নানা মূল্যবোধের আধারিকারূপে। 'শ্যামলী,' 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা' এসব কবিতার বাহিরের আয়োজনে যেন কোনও নারী উপস্থিত বলে মনে হলেও গভীর অনুধাবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে

মানুষের জীবনের কোনও না কোনও মূল্যবোধ। কেন জীবনানন্দ বিশেষ করে নারীকেই বেছে নিলেন এই সব বিমূর্ত মূল্যবোধগুলির অবয়ব হিসাবে, কেন প্রতীকী দ্যোতনার আশ্রয়-ভূমিরূপে উপস্থিত করলেন মানবীর প্রেম, এসব জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। উত্তরে বলি, নারী, সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমাহারে, চিরকালই মানব হৃদয়ের আদরণীয়, কাম্য, আকাঙ্ক্ষার অভীষ্ট, যেমন মূল্যবোধগুলি মানবেতিহাসের জয়যাত্রায় কখনও কখনও দুনিরীক্ষ্য হলেও চিরকালীন অভীপ্সার বস্তু···নাবিকের কাছে "সৈকতের সত্যে"র মত, নক্ষত্রের মত ধ্রুব, অকম্প্র, আবার প্রেমেরই মত তারা যন্ত্রণাহত, নিষ্পিষ্ট হয়েও দুর্মর, চিরনবীন।

এই 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতা হিসাবে "সুদর্শনা"ও কোনও ব্যতিক্রম নয়, এখানেও আপাত-আয়োজনে কোনও রক্তমাংসের শরীরিনী মানবী উদ্দিষ্ট হয়েও প্রতীকী-ব্যঞ্জনার বিস্তারে উচ্চারিত মানবের শাশ্বত সৌন্দর্যচেতনা, যেমন 'সুরঞ্জনা'কে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে "মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়", চিরকালের মানুষের প্রেমাভিসার।

শুধুমাত্র বাগর্থের বিশ্লেষণেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অর্থের এই প্রতীকী প্রসার। সুদর্শনা যা সুন্দর যা কিছু সুন্দর তারই প্রতীক আর কবি-কল্পনায় সুন্দর যে শরীরী হয়ে উঠবে নারীকে আশ্রয় করে, এও খুবই স্বাভাবিক ঐতিহ্য-সিদ্ধ একটি প্রবণতা। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'সুদর্শনা'কে একান্তভাবেই কোনও মানবী বলে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি কোথায়, আমরা কবিতার দ্বিতীয় চরণে দৃষ্টি ফেরাতে অনুরোধ জানাবো। সেখানে 'সুদর্শনা'কে লক্ষ্য করে কবি বলছেন "তোমার মতন এক মহিলার কাছে···।" কেন, তোমার মতন? কেন, কোনও মানবী, যাঁর নাম 'সুদর্শনা' হতে পারতো, স্বয়ং নন? স্মরণে হানা দেয় আরেকটি কবিতার আরও দুটি অনবদ্য চরণ ঃ

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন।

লক্ষ্য না করে উপায় নেই, সুরঞ্জনা কবির কাছে "পৃথিবীর বয়সিনী" এবং "মেয়ের মতন": সুরঞ্জনা আজো আমাদের পৃথিবীতে রয়ে গেছেন। এই সুরঞ্জনাকে তাই আমরা বলেছি 'প্রেম'; প্রেম এখানে প্রতীকায়িত নারীরূপে। "সুরঞ্জনা"র উপজীব্য মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেম যা সভ্যতা থেকে নবসভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় মানবেতিহাসের প্রগতির প্রেরণা; আদিম জৈব 'দেহ দিয়ে ভালোবাসা' থেকে উন্নত হয়ে আজ "ভোরের কল্লোল"। জীবনানন্দের কবিতার অনুধাবনে একবার অর্থের এই প্রতীকী বিচ্ছুরণে অভ্যস্ত হয়ে গেলে উপলব্ধির নতুন থেকে নতুনতর ঐশ্বর্যে উল্লসিত হয়ে ওঠে কবিতার অর্থ।

'সুদর্শনা'য় মানবহৃদয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যবোধ ও অন্বেষা ব্যঞ্জিত নর-নারীর প্রেমের রূপকে। ঐতিহ্যাশ্রিত একটি অনুষঙ্গ এই প্রতীকায়নকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় আর এক অবিস্মরণীয় সুদর্শনাকে; রবীন্দ্রনাথের "রাজা"র সুদর্শনা যে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে "অনেক বড়ো; অনেক সুন্দর" এক "আলোকসুন্দরী"কে। রাজা যখন বলেন, "দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।" সুদর্শনা তখন উত্তর দেন "আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে—যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি, সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ।" হয়তো এ কথাগুলির অনুষঙ্গ জীবনানন্দের "সুদর্শনা"র প্রতীকী তাৎপর্য অনুধাবনে পাঠককে সাহায্য করবে। মানবের সৌন্দর্যাভিসার, কত যুগের ধ্যান, কত মানুষের চেতনার আলোকে মানুষের সুন্দরের ধ্যান সঙ্গীতের মতো উৎসারিত হয়ে এসেছে। আমাদের কবি

চেয়েছিলেন 'কবিতার মর্মে' থাকবে 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' তারই পরি-শুদ্ধিতে তিনি অনুভব করেছেন সুন্দরের বোধ ও মূল্যমহিমা মানবের চেতনার ফসল, যে চেতনা সময়াশ্রিত, যার মধ্যে "সাময়িকতা ও সময়-হীনতা" বিধৃত হয়ে আছে।

"সুদর্শনা"র প্রথম স্তবকে উত্তমপুরুষে কবির স্বকণ্ঠ উচ্চারণ ঃ

> একদিন ম্লান হেসে আমি
> তোমার মতন এক মহিলার কাছে
> যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
> অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
> শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে।
> দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

কবি এখানে আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রবক্তা নায়ক। একটি সুদর্শনা মহিলাকে কেন্দ্র করে যে দেহজ রমনীয়তার উদ্ভাস ও উপলব্ধি কবির সংবেদী সত্তা তাকে অতিক্রম করে অনুভব করেছে কিন্নরকণ্ঠ আর অমৃতসূর্যের আশ্বাস। অবশ্য প্রেমই এখানে নিতান্ত আধিজ-অস্তিত্বের পরিধি হতে উত্তীর্ণ করে নিয়েছে মানুষের সৌন্দর্যচেতনাকে এক অমৃতলোকে, অশারীরিক এক সংরাগী অনুভবে। শাশ্বত সুন্দরের বোধ শুধুমাত্র দেহাশ্রিত হতে পারে না। তাই, অলোকসামান্য উদ্ভাসে সৌন্দর্যচেতনার সত্যোপলব্ধি ঘটেছে স্তবকের শেষদুটি চরণে, এমন কিছু প্রতীকের সুষমসংস্থানে যার থেকে উচ্চারিত হয়ে ওঠে এক অনশ্বর দিব্য সুষমা, সুন্দরকে কেন্দ্র করে মর্ত্য ও অমর্ত্যের এই টানাপোড়েন, দেহী ও বৈদেহী অনুভূতির এই দ্বন্দ্ব চিরকালীন, দেহাশ্রিত রূপ ও রূপাতীত সৌন্দর্যবোধের কোনটি বড় কোনটি ছোট তা নিয়ে মধ্যযুগ থেকে রেনেশাঁস রেনেশাঁসের পরবর্তী আধুনিক পৃথিবী বারবার সংশয় ও কলহে ক্লিন্ন হয়েছে। কিন্তু বিগত সময়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে আধুনিক মানুষের মননশীলতা নিয়ে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন যে দেহকে বর্জন করে নয়, আত্মস্থ করেই দেহোত্তীর্ণ মূল্যবোধের জাগরণ! তাঁর 'সুরঞ্জনা' তাই 'দেহ দিয়ে

ভালোবেসে আজ তবু ভোরের কল্লোল' হয়ে আমাদের পৃথিবীতে রয়ে গেছে। "সুদর্শনা" কবিতাটিতে দেখি 'ম্লান হাসি', যুগের বঞ্চিত পণ্য,' প্রায়-অবলীন নায়ক ও 'মহিলা' একদিকে বিন্যস্ত ; অপরদিকে রয়েছে দেবদারুবৃক্ষের উন্নতশীর্ষ মহিমা, কিন্নর কণ্ঠের স্বর্গীয় সঙ্গীত এবং পরিশেষে দেবদারুর অনুষঙ্গে সবুজ শাখা প্রশাখার মধ্য হতে উদ্ভাসিত আকাশে অমৃতসূর্য। কবি এ স্তবকে সমকালীন মানুষের প্রতিভূ নায়ক ; তিনি সমকালের ভার-চিহ্নিত, "যুগের সঞ্চিত পণ্যে" অবলীন। তাঁর নায়িকাও যুগচিহ্নিত, শাশ্বত নারীত্ব নয়, একজন "মহিলা"। "মহিলা" এই শব্দের প্রয়োগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আধুনিক সভ্যতার মেকী মার্জনার একটি ইঙ্গিত, যাকে sophistication বলা যায় হয়তো, অনাদিকালের নারী তিনি নন, মাত্র একজন মহিলা, মার্জিত কৃত্রিম তাই অশাশ্বতী। এই 'যুগচিহ্নিত নায়কনায়িকার সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই আসছে "অগ্নিপরিধি"র চিত্রকল্পটি আর "সহসা" এই শব্দটির নিপুণ বিবেচক প্রয়োগ। 'সহসা' নির্দেশিত করছে বুদ্ধি নয়, অনুভূতি ও হৃদয়ের আকস্মিক উন্মোচনে সুন্দরের সত্যরূপটির প্রকাশ। 'অগ্নিপরিধি'র চিত্রকল্পটিও প্রতীক ব্যঞ্জনায় অনবদ্য, ঋদ্ধ একাধিক অর্থের অন্বয়ে, বিবাহ আচারের অগ্নিবলয় নায়ক-নায়িকার মিলনের আনুষ্ঠানিক দিকটির অনুষঙ্গ নিয়ে আসে ; আবার তাকে অতিক্রম করে বড় হয়ে ওঠে আধুনিক মানবের জীবন ও যন্ত্রণার, অভিজ্ঞতার অগ্নিময় বেষ্টনের ইঙ্গিত। অগ্নি সবসময়েই পরিশুদ্ধির অনুষঙ্গবাহী, যে বৈবাহিক আচারের অগ্নিসাক্ষ্য কি অভিজ্ঞতার আগুন যাই হোক না কেন, "অগ্নিপরিধি' সেই প্রতীকী দ্যুতি নিয়েই এখানে উপস্থিত। সাময়িক লৌকিক ও দেহবদ্ধ সৌন্দর্যলিপ্সা থেকে সময়াতীত, অলৌকিক ও দেহোত্তর অতীন্দ্রিয় এক সৌন্দর্য চেতনায় উত্তরণটি এই চতুর্থ পঙক্তির "অগ্নিপরিধি"র মধ্য হতেই সূচিত হয়েছে, যা আমাদের মনে নিয়ে আসে এক পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতার দ্যোতনা, স্তবকের চরণবিন্যাসেও

এই চিত্রকল্পটি মধ্যস্থতা করেছে পরা ও অপরা অনুভূতির ইঙ্গিতবহ উপাদানগুলির মধ্যে "ম্লান হাসি ও "যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র চিত্রকল্পটি ঘনবদ্ধতা ও মিতভাষণে এক বিরল শিল্পসিদ্ধির পরিচয়বাহী, মনে পড়ে যায়, "সুচেতনা" কবিতার কয়েকটি সহমর্মী চরণের কথা ঃ

> কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
> দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
> সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;
> শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়

এরপর, বোধকরি, ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না এই চিত্রকল্পটির সাহায্যে জীবনানন্দ কি বলতে চেয়েছেন, মরণশীল মানুষ আজ চেতনায়ও মৃত ; তাই জীবনানন্দের নাবিকী মানব আজ শবের পণ্য-বাহী, তবু 'সুচেতনা' কবিতাটিতেই তিনি শুনিয়েছেন "এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।" "অগ্নিপরিধির" মধ্যে দাঁড়িয়ে এই অন্ধ যুগবদ্ধ মানুষও সংবেদী চেতনার আকস্মিক উল্লেখে অনুভব করেছে সুন্দরের স্বর্গীয় অনশ্বর অমৃতজ্যোতি। "এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;" যুগের সঞ্চিত পণ্যে অবলীন, আত্মবিসর্জিত হতে গিয়েও মানবাত্মা উদ্ধৃত হয়েছে অমৃত চেতনায় তার প্রেমের অলৌকিক অনুভূতির পথেই এসেছে এই তাৎক্ষনিক জাগরণ, যা মানবকে শাশ্বতসুন্দরের বোধে উদ্বুদ্ধ করে, শব্দ ও প্রতীকের নিপুণ বুননে, মিত ঋজুভাষণে, প্রতীকের নতুন নতুন অর্থপ্রসৃতির মধ্যে ষষ্ঠচারণিক এই স্তবকের বিষয় ও বিবরণের বিরোধাভাসী বিন্যাসে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে কবির উপলব্ধি।

পরবর্তী স্তবকদুটি হ্রস্বকায়, চতুষ্ক : বক্তব্য নিরাভরণ গাঢ়তায় সংহতযুক্তি।

> সবচেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো ;
> তবুও সময় স্থির নয় ;
> আরেক এক গভীরতর শেষরূপ চেয়ে
> দেখেছে সে তোমার বলয়।

প্রাথমিক স্তবকে রূপাশ্রিত বোধ থেকে সৌন্দর্যের অমৃতচেতনায়

আকস্মিক জাগরনের পর কবি যখন বলেন সবচেয়ে আকাশনক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো, তখন মনে হয় দেহী ও বৈদেহী সৌন্দর্যানুভূতির অনিবার্য দ্বন্দ্ব থেকে তিনি এখনও পরিপূর্ণ মুক্ত নন। আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকা এরা সকলেই নিসর্গের রূপময় অবয়ব। তার বিমোহিনী প্রত্যক্ষ রূপ ও তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কথাই বলছে। এই রূপ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির ফসল; কিন্তু সুন্দরের আত্মা এই রূপময় অবয়বে বদ্ধ নয় তার সাক্ষাৎ ও মুখ্য মানুষ কালে কালে লাভ করেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত এক চেতনার জাগরণে। রূপ থেকে অরূপে রবীন্দ্রনাথের 'সুদর্শনা' আশ্বস্ত হয়েছিলেন বিরাগ বিরহ আর যন্ত্রণার উপলব্ধির মধ্যে। জীবনানন্দের 'সুদর্শনা' প্রথমাবধিই শাশ্বতসুন্দরের প্রতীক। সুন্দরের অবয়ব ও আত্মার বিপরীতমুখী আকর্ষণে এখানে কবিসত্তা নিরন্তর পীড়িত নন। বরং "পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে" আত্মস্থ আমাদের কবি মানবের সৌন্দর্যাভিসারের অন্তর্লীন মূল্যবোধের সঙ্গে পূর্বপরিচিত। তিনি যুগাশ্রিত মানুষ হয়েও মানবাত্মার প্রতিভূ। তিনি জানেন, নিসর্গের বহিরঙ্গের এই রূপ তাৎক্ষনিক আবেদনে চূড়ান্ত, তবু শেষ কথা নয়, আর এক "গভীরতর শেষরূপ"ই অমৃতসন্ধ মানবাত্মার অভীষ্ট। কালই মানুষকে উত্তীর্ণ করেছে বারবার এই গভীরের অন্বিষ্টে। আদিম দেহজ 'আরক্ত বাসনা" থেকে প্রেম যেমন মানুষের ইতিহাসে সভ্যতার পতনউত্থানের মধ্য দিয়ে উত্তরিত হয়েছে "ভোরের কল্লোলে", "অন্ধকার থেকে এসে নবসূর্যে জাগার মতন"। তবুও "হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে" মানুষ "আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে।' (দুজন) অভিসারেও প্রেমিক মানবাত্মা চলেছে সময় থেকে সময়ান্তরে, কত যুগ কত কাল, "তার গভীরতর শেষরূপ" এর সন্ধানে। নিরবধি বহমান কাল সেই কালের উদবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিশোধিত, গল্প হয়ে উঠেছে মানবের সৌন্দর্যের চেতনা, তাইতো 'সময় স্থিরনয়"মানুষের সৌন্দর্যের চেতনার ক্রমিক উদ্ভাস, তার ক্লান্তিহীন অন্বেষার আবর্ত আভাসিত

হয়েছে 'বলয়' শব্দটিতে। এই নিখিল জাগতিক সময়াবর্তের পাশা-পাশি ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে অলৌকিক ভাবসম্মিলনের এক ইঙ্গিত—যেখানে "বলয়" শব্দটি পূর্বস্তবকের "অগ্নিপরিধি"র অনুসরণ করে অনুরণিত করেছে মিলনানুষ্ঠানের অগ্নিবলয়ের আবেষ্টন ও পারস্পরিক হৃদয়মিলনের অগ্নিসাক্ষী প্রতিজ্ঞা, সংক্ষেপে জাগতিকরূপেও আয়োজন তাৎক্ষণিক আবেদনে ইন্দ্রিয়মগ্ন মানুষের কাছে চূড়ান্ত। তবু সুন্দরের প্রকৃতস্বরূপ ইন্দ্রিয়লব্ধ মাত্র নয়, অতীন্দ্রিয়ও বটে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির তন্ময় (objective) অনুভব থেকে অতীন্দ্রিয় চিন্ময় (subjective) সৌন্দর্যবোধে সময় বা কাল মানবাত্মাকে উত্তীর্ণ করেছে। সুন্দরের সেই "গভীরতর শেষরূপ"ই প্রথমস্তবকের উন্নতশীর্ষ দেবদারুর মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবি সেই মগ্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুভব করেছেন :

> এই পৃথিবীর কোলে পরিচিত রোদের মতন
> তোমার শরীর, তুমি দান করনি তো ;
> সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার বলে
> সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

মানবের সৌন্দর্যচেতনা সময়েরই দান : সভ্যতার ফলশ্রুতি, তবে অগ্রস্মৃতিতে উৎকর্ষিত। কিন্তু এখন অস্থির কাল : সমকাল ও প্রতিবেশের বিরূপতায় নিষ্পিষ্ট সে চেতনা মানুষের সভ্যতার যা কিছু মহৎ তা এই সুন্দরের শাশ্বতবোধের কাছে ঋণী। কিন্তু "এই বিশশতকে এখন", "মৃত্তিকার এইদিকে ঋণ রক্ত লোকসান ইতরখাতক।" চেতনার দানে বঞ্চিত এই সমকালের সঙ্গে মানবের চিরকালীন সৌন্দর্যবোধের পরিণয় এখন অসঙ্ঘটিত, অসম্ভব বলেই সুদর্শনা আজ সঙ্কুচিতা। এ কালের আত্মা ও সুদর্শনার অবয়বে কোনও মেলবন্ধন হয় নি। তাই যা' ভালো পরিচিত রোদের মতন "সুদর্শনা"র সেই শরীর আজ আত্মদানে উৎসর্গীকৃত নয়। রৌদ্রের চিত্রকল্পটি বড় অনন্যপূর্ব, অনির্বচনীয়। রৌদ্রই তো সঞ্জীবনী : তার উষ্ণতা সকল প্রাণের উৎস। তাই তো, কবির কাছে যা সুন্দর যা ভালো তা পরিচিত

রোদের মতন ; মানুষের জীবন ও সভ্যতার প্রাণায়নের নিগূঢ় উষ্ণ উৎসটি তো সেখানেই নিহিত। নিরবধিকালের বহতা ধারায় চৈতন্যের প্রসারে প্রসারে সভ্যতার নবনব উদ্ভাসে, কেবলেই "আরো বড় দিক-চক্রবালে হৃদয় পাবার" প্রেরণায় অগ্রসর হ'তে হ'তে এই বর্তমানে, সময়ের এই যুগগ্রন্থিতে এসে এখন নিঃস্বকাল, রিক্ত সময় ; তাই মানবের সেই চিরকালীন সুন্দরের বোধ আজ শুধু পন্যঅবলীন কালিমাক্লিন্নই নয় ; আমাদের এই কাল তাকে কোন নবউপচারে ভূষিতা কোনও নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে নি। অতীতের দানের উত্তরাধিকারের মধ্যে বন্ধ থেকে সে আজ নিষ্প্রাণ, মৃত। তাই, সুদর্শনা, মানবের শাশ্বতসুন্দরের বোধ আজ "মৃত" আর "সময়" অর্থাৎ আবহমান সময় স্রোতের এই বিশেষ যুগচিহ্ন, এই বর্তমান, সময় সূত্রের এই অব্যবহিত গ্রন্থি···এই সময়ও তাই "মৃতদার" বিপত্নীক। কেননা, এই সমকাল সুন্দরের সঙ্গে নবপরিণয়ে অঙ্গীকার-বদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই, "সময়" এখন "মৃতদার", "সুদর্শনা" আজ "মৃত"। একবার, প্রতীকের অন্তরালবর্তী এই ব্যঞ্জনার দ্যুতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেই বড় প্রবলভাবে মনে এসে সপ্রতিভ আঘাত করে যায় "মিতভাষণ" কবিতার প্রায় সমানধর্মী প্রথম স্তবকটি··· তোমার সৌন্দর্য নারি অতীতের দানের মতন" যা সভ্যতা নব-সভ্যতার উত্থান-উন্মোচনের জয়ে-বিজয়ে মানবাত্মার চিরকালীন দয়িতা যা তাকে ডেকে নিয়েছে বারেবারে ঃ

তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

আর "সুদর্শনার" কবি যুগাবলীন মানবের প্রতিভূ নায়ক, "আরেক গভীরতর শেষরূপের"র অন্বেষণে পরাহত হয়ে অনুভব করেছে, "সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।" এই নিঃস্ব, নষ্ট সমকালে মানবের অনাদি কালের সৌন্দর্যচেতনা, তার হৃদয়ের গভীরনিহিত "সুদর্শনা", অতীতের দানে সঞ্জীবিত থেকে এই সমকাল হতে উৎসারিত কোন নবীনস্নিগ্ধ প্রাণরস-প্রতিভায় জীবিত হয়ে ওঠে নি তাই, "সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।"

কবি কবিতা এবং সত্তরদশক ইত্যাদি

ভবেশ দাশ

কবিতা এমন একটি শিল্পশাখা যাকে সুধুমাত্র দশক শতকের সময়সীমা দিয়ে ঘিরে ফেলার অর্থ দাঁড়ায় কবি কিংবা কবিতাকে ছোট করা, তবু কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মূল্যমান অথবা সমকালীন সামাজিক পটভূমির স্থিতিস্থাপকতার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হয়। নচেৎ কবির শক্তিময়তার গূঢ় পরিচয় মিলবে না। নিছক কাল্পনিক ছলাকলা কিংবা আনুমানিক তর্ক বিতর্ক দিয়ে কোন কবিকে তার উপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। আসল কথা, আর যাই হোক নির্দিষ্ট সময়ের পটভূমি ছাড়া কবিবে কোনকালেই বিচার করা হয় নি। আগে তার নিজস্ব সময়ের পটভূমিতে বিচার এবং পরে তিনি সময়োত্তীর্ণ কিনা সেই প্রশ্ন আসে। রবীন্দ্রনাথের পরেও কিছুকাল আমরা কবিদের পরিচয় অর্জন করেছি শতাব্দীর নিরিখেই। কিন্তু এখন দশক নিয়ে খুব হৈ চৈ। ইনি পঞ্চাশ দশকের কবি, তিনি ষাট দশকের কবি। এসব কথা গত কয়েকবছরে খুব চালু হয়েছে। অবশ্য একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, রবীন্দ্র সমকালে কিংবা তাঁর পূববর্তী সময়ে কবিকৃতির হিশেব-নিকেশের ব্যাপারে এমন কোন হিড়িক ছিল কিনা। যদিও বা থেকেই থাকে, আমার বিশ্বাস তা নিয়ে অন্তত কোন মাতামাতি হয় নি কিংবা মাতামাতি হলেও কবিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধের কোন কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত হয় নি। কিন্তু এখন যা দেখছি, তা কলঙ্কিত—কালিমাকে গাঢ়তর করার সামিল।

কিছুদিন আগে 'মহিলা কবি' এই শব্দটি নিয়ে বাংলাদেশের কোন কবিতাপত্রে আলোড়ন উঠেছিল। কবিতাই কবির শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। উক্ত শব্দটির বিপক্ষে যুক্তি ছিল এই। 'মহিলা কবি' বিশেষণটি যদি সাহিত্য বিচারে চালু রাখা হয় তবে 'বেঁটে কবি' 'ছয় আঙুলে কবি' "ট্যারা কবি' ইত্যাদি অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক লক্ষণাক্রান্ত

কবিদের কথা বলা হক। আমি এই যুক্তিটি সর্বান্তঃকরনে সমর্থন করি। ধরা যাক্, বাংলাদেশে এমন একজন কিংবা তুজন মহিলা কবি আছেন যাঁরা কবিতা চর্চা করছেন। একদা যদি তাদের প্রকাশিত কোন কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়ঃ ইনি হলেন বাংলাদেশের মহিলা কবিদের অন্যতম কিংবা শ্রেষ্ঠ; তবে সেই আলোচনার মানদণ্ড কোন সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় কি? বিস্ময়ের কথা, এমন দৃষ্টিভংগীও বাংলাদেশের কবি-মহলে প্রচলিত। লিখে পার্থক্য যেখানে কাব্যবিচারের কৌশল, সেখানে 'দশকের কবি' শব্দটিও যে কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তা সহজেই অনুমেয়। এখানে আমিও পূর্ব প্রস্তাবের সঙ্গে বোধ হয় গলা মিলিয়ে বলতে পারিঃ দশকের কবি বলেও যদি কবিতা বিচারের কোন একটিতে থাকে তবে কোন কোন কবিকে 'পাঁচ বছরের কবি' 'পাঁচ ঘণ্টার কবি' প্রভৃতি আখ্যা দেবার প্রথা চালু করা হক। এই প্রথা চালু করার ফলে একটা লাভ হবে এইঃ কোন কবি যদি পূর্ণ শতাব্দীর বিচারে কবি হিসেবে কোন স্থায়ী আসন লাভ না করতে পারেন, তবে অন্তত দশকের বিচারে তিনি একটা স্থান পাবেন নিশ্চয়ই।

কবিতার অনাদি প্রবহমানতার বিশ্বস্ত ইতিহাস রচনা করতে গেলে যে উপকরনিক অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, তা যদি কবি স্বকালেই নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তবে বুঝতে হবে তিনি নিজেই সশস্ত্র সাজে ঐতিহাসিকের মাথায় চড়ে বসেছেন। আমার ধারণা গোড়ায় যখন কবিতার ক্ষেত্রে দশক শব্দটি চালু করা হয়েছিল. তা বোধ হয় এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী নিয়ে নয়। 'দশকের কবি' চিহ্নিতির কতক-গুলি সুবিধা নিশ্চয়ই আছে। সময়কে স্বল্প পরিসরে অন্তর্ভুক্তির ফলে আগামী কালের কবিতার ইতিহাসে নির্ভুল তথ্যটি হাতে পাওয়া যাবে। দশকের ইতিহাস আর দশকের বিচার এ তুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন তথা বিপরীত প্রচেষ্টা। কোন নির্দিষ্ট দশকের কবি নিয়ে বিচার যিনি করতে বলবেন, তাকে সেই সংশ্লিষ্ট দশক-পূর্ব কবিদের অবশ্যই

জানতে হবে। অর্থাৎ রীতিমত অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু দশকের ইতিহাস যিনি লিখবেন, তার শুধু মাত্র সেই দশকই আলোচ্য বিষয়, তার বাইরে নয়। এছাড়া 'দশকের কবি' চিহ্নিতির অপর একটি তাৎপর্যও আছে, তা হোল : কোন দশক হয়তো কবির জাগৃতি কিংবা কবি হিসেবে স্বীকৃতির কাল সেদিক থেকে সংশ্লিষ্ট দশকটি কবিকে জানতে যথেষ্ট সাহায্য করে। অবশ্য এই পার্শ্ব যুক্তিটিও 'দশকের ইতিহাস' প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দুঃখের কথা, 'দশকের কবি' উল্লিখিত কোন অর্থেই ব্যবহৃত হয় না। কই, গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তো 'দশকের ঔপন্যাসিক' কিংবা 'দশকের গল্পকার' প্রভৃতি কোন শব্দ শুনতে পাই না। তার কারণ তাদের এটুকু প্রত্যয় জন্মেছে যে বাংলা সাহিত্যের আসরে জায়গা দখলের জন্যে দশক শতকের ঘর গুণে বেশীদিন টিঁকে থাকা যাবে না। কবিকে বাঁচতে হবে কবিতার জোরে, শৈল্পিক উৎকর্ষে, সৌন্দর্যের সৌভাগ্যে।

যাই হোক আমি যে বর্তমান প্রবন্ধে সত্তর দশকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তার অন্য কোন অপব্যাখ্যা যাতে কেউ না করেন একমাত্র তারই জন্য এত কথা বলতে হল। একথা বলাই বাহুল্য, কবিতার আসরে অনিশ্চিত আবহাওয়ার আনুপূর্বিক ভাষ্যকার আমি নই। তেমন দাবী বোধ করি কেউই করতে পারেন না। অন্যপক্ষে কোন নির্দিষ্ট সময়কালীন কবিতার ধারাবাহিকতা অথবা কোন কবিতা কিংবা কবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার আমার আলোচ্য নয়। নববর্ষে প্রথম প্রভাতে সবাই যেমন করে জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি মুছে ফেলে, এমনকি ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনাকে পুড়িয়ে দিয়ে মাঙ্গলিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বর্ষকে আহ্বান করে, শপথের মালা গলায় পরে উজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, ঠিক তেমনি আজ নয়, দশকের প্রারম্ভে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, শপথ উজ্জীবনের স্বপ্ন নিয়ে কবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি বর্তমান প্রবন্ধে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে কবি ও কবিতা সম্পর্কিত প্রাক্তন অভিজ্ঞতার কিছু টুকরো দৃশ্যাবলী এসেই

পড়বে, স্পষ্টও : বলেই দিচ্ছি তার কোন বিচার বিভাগীয় উদ্দেশ্য নেই। কেননা অভিজ্ঞতার আধারেই আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রদীপিত হয়।

২

সত্তর দশককে সামনে রেখে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন তোলবার আগে সাম্প্রতিক কালে কিংবা গত দশকে পাঠকশ্রেণীর পক্ষ থেকে কবিতা সম্পর্কিত মর্যাদা অথবা কৌতূহলের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা অবান্তর নয়। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের কবিতার কোন পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ঘট্‌ছে কি ?—উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আমি জবাব দেব : নিশ্চয়ই ঘটছে। সেই মুহূর্তেই কেউ যদি আমায় পাল্টা আক্রমণ করেন : কে বলেছে, বিবর্তন ঘটছে ; কিছুই ঘটছে না। আমার উত্তর : তাই হবে বোধ হয়। এছাড়া অন্য জবাবের কথা আমি ভাবতে পারি না। তার কারণ ইদানীং কালে কবিতার বিবর্তন হোক আর নাই হোক, তিনি যখন আমায় সহিংস ভ্রূকুটিতে বিশ্বাস করতে বাধ্য করাচ্ছেন, তখন তার জ্ঞানের পরিধির চাইতে, দৈহিক শক্তিময়তাই বড় বলতে হবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে মন্তব্য যতই শীতল হয় ততই মঙ্গল। আসলে কবিতাকে ভালোবাসবার জন্যে সশস্ত্র উন্মত্ততায় স্থিতিশীল, তাদের নীরবতা কিংবা হুংকারে কিছুই এসে যায় না। আমরা যারা কবিতা নিয়ে চর্চা করি, কিংবা পাতার পর পাতা থিসিস লিখে চলি, বিশেষত কবিতা যাদের মনে মুক্তির নিটোল মেজাজ নিয়ে আসে, তারা যদি আজ কবিতার মূল্যমানের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলি, তবে সেইটেই বড় কথা।

ধরা যাক্, এবার তাদের দিক থেকেই যদি প্রকৃত প্রশ্ন ওঠে : এক, কবিতা সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ বেড়েছে কি ? দুই, আধুনিকতার স্বাদ সাম্প্রতিক কবিদের কবিতায় অনুভব করা যায় কি ?…মূলত এই দুটি প্রশ্ন সামনে রেখেই অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা যাবে এবং প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। এক, কবিতা সম্পর্কে

পাঠকের আগ্রহ বেড়েছে বলে আমার মনে হয় না। (অবশ্য জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিকে বাদ দিয়ে হিসেব করতে হবে) পাঠকের আগ্রহ না বাড়ার অর্থ কিন্তু কবিতার দীনতা নয়। কবিতা হয়তো তার আপন গতি নিয়ে মোহনার দিকে ছুটছে, কিন্তু পাঠক সে পরিসরে কবিতার পেছনে ছুটতে পারে নি। এই ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ কবি আধাকবি এবং ভুইফোঁড় কবিদের গোঁজামিল। এজন্যে বিশেষত দায়ী প্রকৃত কবিগোষ্ঠী। তারাই প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় দিয়ে পাঠকদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তারা বারবার প্রতিবারই কবিতাকে ভালবাসতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। পারেন নি। পাঠকের মানসিকতাকে পীড়িত করলে সে তা সইবে কেন? সাবধানে দূরে সরে দাড়াবে। শুধু দূরে নয়, নিন্দায় পঞ্চমুখ হতেও বাকী থাকবেনা। যাঁরা সার্থক কবিতা রচনায় পাঠকের প্রশংসা পেলেন, তারা যদি শুধুমাত্র নিজের খ্যাতিটুকুই বোঝেন, তাদের যদি একবার ভুলেও সার্থক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত দায়িত্ব মনে না আসে, তবে কবিতার রাজ্যে এমন অঘটন আরো ঘটবে, বরং ক্লান্তিকর বিপর্যয়ের সম্মুখেও হয়তো দাঁড়াতে হবে। কোন নবীন কবির একটি কবিতা যদি প্রথম সারির কবির বিচারে একদা মুদ্রণের সৌভাগ্যলাভ করে, তারপরেই সেই কবি আত্ম-পরিচিতি লাভের একজন সার্থক সৈনিক হয়ে ওঠেন। এমন আত্মঘাতী লম্ফঝম্প প্রায় কোন কবির চোখেই পড়ে না। তার কারণ এই ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে প্রায়ই বৈষয়িক লাভালাভের প্রশ্নটি যুক্ত থাকে। দু একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন: 'উত্তরাধিকার সৃজনের ব্যাপারে কিই বা এমন কর্তব্য আছে? আমার কবিতাই সার্থক উত্তরাধিকারের জন্ম দেবে।' কথাটি শুনতে ভালো, এমনকি বলতেও ভালো। কিন্তু যিনি এমন কথা বল্লেন, তিনিই আবার নবীন কবিদের হাতে নিজের ঢাকটি পিটিয়ে নিয়ে তবেই তাকে নিজের পত্রিকায় মুক্তি দিলেন। শিল্পের এমন মুক্তি যখন দাম দিয়ে কিনতে হয়, তখন যে প্রচুর অকবির ভীড়ে বাজার

হয়ে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি? সুতরাং পাঠকের নিয়মিত বিভ্রান্তির মুখোমুখি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তিনি কবির অনাহুত আত্মপ্রকাশের কৌশল প্রত্যক্ষ করবেন, না কি কবিতার মর্মকেন্দ্রে বিচরণ করবেন। এমন উদাহরণ একটি নয়, অনেক আছে।

সাম্প্রতিক কবিদের কবিতায় আধুনিকতার স্বাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথের মতে, নদীর যে প্রবহমানতা, অর্থাৎ নদী যে গতিতে মোহনার দিকে ছুটে চলে এবং মোহনাতেই বাঁক সৃষ্টি করে অপর একটি নদীর সংগে মেলে, সাহিত্যের প্রবাহে সেই বাঁকটুকুই হল আধুনিকতা। অবশ্য এই আধুনিকতা সম্পর্কে মতবাদের ঝড় আগেও উঠেছে, এখানো চলছে। সুতরাং আমার মতের সংগে অনেকের নাও মিলতে পারে। যেমন কেউ কেউবা বলে থাকেন: ময়মনসিংহ গীতিকা বা বৈষ্ণব পদাবলী যে অর্থে আধুনিক, সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক। আবার জীবনানন্দ যে অর্থে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে আধুনিক নয়। অতএব আধুনিকতার চারিত্রিক তারতম্যে যেখানে মতভেদ রয়েছে, সেখানে আধুনিকতা সম্পর্কে শেষ কথা বলা আমার পক্ষে মুসকিল। একালে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন: 'যা বিশুদ্ধ কবিতা, চিরন্তনী না হোক, অনেক অনেক অনেকদিন ধরে পাঠকের মনে যার ক্রিয়া চলতেই থাকবে, তা সকল সময়েই ধ্রুপদী। —কবি যেন বৃক্ষের মতো; তার শিকড় মাটির অনেক ভিতরে, যে মাটিতে দেশ এবং কাল বিধৃত। তার মাথাটি কিন্তু সকল সময়ে আকাশের দিকে, সেখানে আলো বাতাস বৃষ্টির জন্য তার অনবরত প্রার্থনা। কিন্তু এই উপমাও অসম্পূর্ণ, কেননা একটি ব্যাপারে গাছের সংগে কবির পার্থক্য আছে। সে প্রয়োজনে তার পায়ের নীচের শিকড়শুদ্ধ মাটিকেও উপড়ে ফেলতে পারে। প্রয়োজনে সে ঝড়ের রাতে একাকী অভিসারে বের হয়। প্রয়োজনে তার প্রেম বিশুদ্ধ ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। অধুনা এই কবিকর্ম আমি অন্তত

অস্বীকার করি না।' এমন স্পর্দ্ধিত আধুনিকতার বিচারে কাজী-নজরুলের 'বিদ্রোহী' 'দারিদ্র্য' প্রভৃতি কবিতাও চিরকাল বেঁচে থাকবে।

আমার মনে হয়, আধুনিকতার নিশ্চিত কতকগুলি শর্ত আছে। কবিতার লাবণ্য, সৌন্দর্য তথা আন্তর আনন্দই তাকে কালোত্তীর্ণ করে। কবিতায় কোন নির্দিষ্ট সময়কে সময়োত্তীর্ণ করার প্রচেষ্টায় কবির সৌন্দর্যবোধ অবশ্যই নিহিত থাকে। এমনকি এই সৌন্দর্য-বোধের লড়াইটিও আবহমানের। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা নিয়ে চর্চা শুরু করলেন, তখন হাজারো বিরুদ্ধাচারীর সম্মুখীন তাকেও হতে হয়েছিল। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এই মাত্র বলতে পারি আমি গদ্য-কাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোন রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং সেই জন্যই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি। কথা উঠতে পারে, গদ্য কাব্য কি? আমি বলব, কি ও কেমন জানি না, জানি যে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিষ, যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয়, তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক, তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হবো না।' এই অনির্বচনীয়তাই কবিতার তথা আধুনিকতার প্রধানতম শর্ত। নিপুণ কবি তার রচনাকে সময়ের সীমা পার করে দিতে পারবেন না; কবিতার মধ্যে অনির্বচনীয়তা শুধু সৌন্দর্যের নয়: অনির্বচনীয় সত্যের, গ্লানির, দুঃখের, প্রেমের, ভক্তির। নয়তো কবিতার প্রাকরণিক সৌন্দর্য দিয়েই সময়কে পেরিয়ে যাওয়া যেতো।

উল্লিখিত অর্থে সাম্প্রতিক কবিদের আধুনিকতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিপন্ন হয়েছে। আধুনিকতার জন্য কবিতা কেউই লেখেন না। কবিতা লিখেই আধুনিক হন। যেমন গত দশকে ইস্তেহার-ধর্মী বেশ কিছু লেখা হয়েছে, সত্তর দশকের শেষের দিকে তার মূল্যমান কি

রকম থাকবে না থাকবে, সে কথা এখনই আমরা বলতে পারি না। সময়ের বদল হচ্ছে, হবে। সামাজিক মূল্যের স্তরীভূত অভিজ্ঞতা দিয়ে তেমন কবিতাকে কতখানি অন্তরের বৈভব করে তুলতে পারবো, সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা অসম্ভব। একালের অনেক কবিই আছেন, যাঁরা একদা আমাদের আধুনিকতার নির্মল আনন্দে পৌঁছে দিতে পেরেছেন এবং এখনও সে কাজ অব্যাহত রয়েছে। কবিতার হাটে যাই দুর্যোগের হাওয়া বয়ে যাক না কেন, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার মতো হাওয়াও পাশাপশি সচল রয়েছে। আমাদের একালের দুঃসহ বিপর্যয় শুধু এইটুকুই যে কবিতার স্বধর্মকে অক্ষুন্ন রেখে পাঠকের মনে নিরাভরণ উজ্জ্বল মানসিকতা গড়ে দিতে পারে নি। তাই সে দায়িত্ব একান্তভাবে কবিদেরই। বোধ করি সেই কারণেই আধুনিকতার ক্ষীণ স্রোতটিকে সহজে পাঠকের সামনে মূর্ত করে তুলতে পারছি না। যা, সত্তর দশকে একান্তই প্রয়োজন।

গত দশকের কোন একটি কবিতা সংকলনের সম্পাদক জানিয়েছেন: 'আজকের কবিতা আক্রমণে তীক্ষ্ণ, শ্লেষে ভৎর্সনায় তীব্র, বিদ্রোহে শক্তিমান, ভালোবাসায় উন্মাদ, আত্মবিশ্বাসে পাগল, বন্ধুত্বে নিষ্ঠাবান। কোথাও সে কবিতা রোমান্টিক বেদনায় প্রগাঢ়, জীবন জিজ্ঞাসায় প্রাজ্ঞ, সমাজচেতনায় জীবনবোধ দার্শনিক, কোথাও সে রাজনৈতিক ঝংকারে ঝংকৃত, অবিশ্বাস ব্যতিক্রম হিংসা, ক্রোধ, বৈরাগ্য, আসক্তি ব্যঙ্গ, উন্মাদনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, উলাস অশান্তি ঔদার্য, দ্বিধা চপলতা, ক্লান্তি সংশয়, নৈরাশ্য অসহিষ্ণুতা, নির্মলতা দুঃখ—এই নিয়ে আজকের বাংলা কবিতা।' সাম্প্রতিক কবিতার উক্ত লক্ষণগুলি মেনে নিয়েই সত্তরদশকের কবিদের কাছে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পৌঁছে দিতে পারি। একদা রুসিয়ায় খারকভ্ সাহিত্য সম্মেলনে Art is a class weapon' কথাটি লেখকদের জন্য ঘোষিত হয়েছিল। এমন কথা মেনে নিয়ে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করা দুরূহতম কাজ। Communist manifesto প্রকাশিত হওয়ার আগেও বহু অসাধারণ

ধ্রুপদী শিল্পী দেশে দেশে জন্মেছিলেন। সে জন্যে কি তাদের আধুনিকতা আজ নষ্ট হতে বসেছে? তা নষ্ট হবার নয়। বরং এক্ষেত্রে আমরা যদি এলিয়টের কথাকেই মন্ত্র করি (the progress of an artist is a continual self sacrifice, a continual extension of personality) তবে অমন শৃঙ্খলিত ঘোষণাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারা যায়। অবশ্য সহজেই অর্থে কৃচ্ছ্রতাহীন নয়। 'গরীবের জন্যে লিখো' বলে যাঁরা দিনরাত চীৎকার করেন, তাদের এই সংকীর্ণতার জন্য একদিন ফুরিয়ে যেতে হয়। দরিদ্রের দারিদ্র্যটাই তাদের চোখে বড় হয়, অপর শ্রেণীর প্রতি বাঞ্ছিত ঘৃণাও তাদের কম থাকে না। যে কবি নিপীড়িতের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তিনি তার আগে সৌন্দর্যজ্ঞানে মানুষকে ভালবেসেছেন। কেননা সৌন্দর্যের বিচিত্র বিস্তারেই কবির ভাবনা প্রসারিত হয়েছে। আর তা যদি না ঘটে তবে শুধুমাত্র রক্ত, শোষণ, রাইফেল, মুক্তি, বিপ্লব কতকগুলি নির্দ্ধারিত শব্দই কবিতার শরীর গঠনে একঘেয়েমি আনবে। গত দশকে মর্মান্তিকভাবে এধরনের একঘেয়েমিতার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে।

কবিতার বৈচিত্র্য বিষয়ে তার আভ্যন্তরীন গুণাগুণ সংখ্যায় যতই বাড়তে থাকুক না কেন, মূল সূত্র বোধ হয় দুটি। এক, সমাজস্থিত কবি সমাজের চতুস্পার্শ নিয়ে ক্রমাগত কবিতায় ফুটে উঠতে পারেন, দুই সামাজিক আবহাওয়া বহির্ভূত নিসর্গদৃশ্যও কবিতার প্রাণ হতে পারে। কবিতা বিচারের সময় অন্য যে সূত্রগুলি প্রকাশ পায়, তা উক্ত দুই সূত্রের শাখায়িত পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সে দুশ্চিন্তায় কবিতার রাজ্যে বান ডাকতে চাই না। এমন অনেক কবিদের আমরা পেয়েছি যাঁরা সামাজিক ধ্বংসোম্মাদনার পটভূমিতে দাড়িয়ে জীবন সংযোগের অনন্য দক্ষতায় শবসাধকের মতো অমৃতের বার্তাবাহী; যাদের কবিতা অগ্নিময়তায় মর্মান্বেষী অথচ পুলকিত বিস্ময় বৈপ্লবিক রোমান্টিকতায় উদ্বেজিত। স্বাধীনোত্তর

দেশে মানুষ যখন সর্বনাশী মরীচিকার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে তখন অদৃষ্টের গয়ংগচ্ছে অধৈর্য্য প্রকাশ না করে অনেক কবি নৈরাজ্যের আগল ভেঙে দিয়ে কবিতায় উজ্জীবনের মন্ত্র শিখিয়েছেন। আবার এমন কবিকেও আমরা পেয়েছি যাঁরা উদ্বাস্তু সৌন্দর্যরসিকের মতো নিরালোক অরণ্যে নিষ্কাম সংযমের এবং কাল্পনিক আত্মসমাহিতির প্রাজ্ঞ বিহ্বলতা নিয়ে নিথর নিসর্গের গভীরে আমাদেরকে সমর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র কল্পনাপ্রবণ অভিঘাতে নয়, নিয়তিনিষ্ট প্রেমের আহ্বানেও আমাদের সজীব করেছেন। যেমন :

চারিদিকের বিষন্ন চীৎকারে
তোমার অনন্ত নিদ্রা বৃক্ষ! তুমি কোটি বৎসরের
পরমায়ু নিয়ে স্থির মাটির ভেতর
আলো হও!

আমাদের স্বদেশ নরক
উৎসবের নামে আজ গলায় কর্কশ রক্ত ওঠে ;
যম করে পৌরোহিত্য কবির সভায়!

সমস্ত জীবন তুমি রৌদ্র নিয়ে মাথার উপর
মাটির গভীরে কবে চলে গেছ! কবির অভাবে
বৃক্ষের অভাবে আমরা আজ শুধু জন্মদিন মানি
রক্ত দিয়ে আর্তনাদ মুছি।

মাটির গভীরে বৃক্ষ, হীরা করো মৃত্যুর অশুচি।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

যে কবিতা বৈপ্লবিক রোমান্টিকতায় উদ্বেজিত : 'মানুষের ভালবাসায় পৃথিবীর জন্য। ফুল গান কবিতা বন্দুকের নল সব একাকার।' (পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অন্যদিকে কবিতায় পেয়েছি কাল্পনিক আত্ম-সমাহিতির প্রাজ্ঞ বিহ্বলতা :

হাজার নদী যখন লাফ দিয়ে মেঘের সংগী হয়
মাতাল বাতাস যখন তাদের নিয়ে ছোটাছুটি করে
কৌতুকে সূর্য ছুটি নিলে পর
দিন-দুপুরেও উদাসী বাউল
বৃষ্টির এক তারা বাজায় ;

... ...

ফুলপাখী নারীর শরীর একাকার হয়ে যায়
সন্ধ্যার ধূসরতায় ছিন্নভিন্ন কোরক
ভেসে যায় নদীতে ; হাজার নদী হয়ে
সমুদ্রে ; সমুদ্র থেকে আবার আকাশে ;
মেঘের সংগী হয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে ?
আশ্চর্য যুবক কে আনবে জলে ভরা বাদলে
এখনও খুঁজে ফেরে বকুল কদম···

(মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত)

আবার অন্যত্র নিয়তিনিষ্ঠ প্রেমের আহ্বান :

বাধা দিও না
শরীরের ভিতর ঘরে আসতে দাও
পঁচিশটি প্রদীপের নীল বৃত্তে
ভালোবাসার মগ্ন আলো

জানি
জিহ্বার উপর গোলাপের পাঁপড়ি
রাখা আছে
চোখের অশব্দ স্থির বাঁশী
বুকের ওপর নেভানো দীপাধার
বাধা দিও না
আমার বৈঠায়
একবার
তোমার শরীর ভাসাতে দাও
কেবল একবার

(প্রভাত কুমার দাস)

কবিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যক্তিস্বরূপতা, যা নির্বিকল্প নির্বাণের সমকক্ষ, যা বাদ দিলে দশকীয় অভিজ্ঞতায় আর যা হাতে থাকে, তা খুবই মর্মান্তিক। জীবনের পরিপার্শ্বে অসংখ্য দৈবদুর্বিপাকের একদল নির্বিবেকী কবিগোষ্ঠীর সমস্যাই একালে কবিতার আধুনিকত্ব প্রতিপন্নে অবশ্যই বাধা সৃষ্টি করেছে। নেহাৎই নিঃসঙ্গতার বেদনায়, বুদ্ধিভ্রংশ অপঘাতে তথা বৈপ্লবিক চিত্তমুক্তির দোহাই দিয়ে কবিতাকে আধুনিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত করা যাবে না। বরং অন্যথায় তা কোন সন্দেহসিক্ত রীতিনীতির পক্ষে প্রচারকার্যে লাগতে পারে।

ইদানীং কিছুকাল যাবৎ কবিতা সংকলন এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশের হিড়িক পড়েছে। স্বজনপোষণের স্বাবলম্বী স্পর্দ্ধার সহযোগে যে কোন অকবি কিংবা ভুঁইফোড় কবি অবলীলাক্রমে স্থান দখল করছেন। কবিতা রচনায় যে কবি শিশুকাল অতিক্রম করতে পারেন নি, অবিলম্বে তার শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করে সরকারী কেতাব অর্জনের দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষাকে নির্বিরোধ নির্লিপ্ত সমর্থন জানানো হচ্ছে। ফলতঃ কবিকৃতির আধখানা নিয়ে পক্ষপাতের দূষিত গ্লানিকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। মৃত্যুতুল্য নৈরাশ্যের জন্য আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিচার, সম্মান, প্রশংসা—সব কিছুর সমাধান ঘটে গেলে সে নিজেকে এগিয়ে নেবে কি ভরসায়। কবির কৃতকর্মের সাবল্য যেখানে মৃত্যুমুক্তির পরেও স্থূলভ্যনয়, সেখানে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হবার আগেই শেষ বিচার হয়ে গেলে, সে কবির গতি রুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এভাবে বিদেশে ভুঁইফোড় কবিও প্রচারিত হচ্ছে।

আগামী দশকে কবিতার রাজ্যে নৈরাশ্যের বান ডাকতে চাই না এই কারণে যে দুঃসাহসিক কাব্যকর্মও একপ্রান্তে নিষ্ঠার সংগে চলছে এবং তা চলবেও। যেমন কিছুকাল আগে ছয়জন কবির উদ্দেশ্যে তিনটি অভিনন্দন পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অশোকবিজয় রাহা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য। তার রূপ-পরিকল্পনা তথা শ্রদ্ধা

নিবেদনের ভংগী আমাকে পুলকিত বিস্ময়ের সমীপবর্তী করেছে। এমন সহজ সৌন্দর্যে কবির সংগে কবির তথা পাঠকের অনুবন্ধন সৃষ্টির প্রয়াস, নিভৃত অনুশীলনের উৎকর্ষেই সম্ভব। ক্ষুদ্র হলেও এমন নিঃস্বার্থ প্রয়াসই কবিতার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি আনবে।

দশকের প্রারম্ভেই আমরা স্ফূর্তি পেতে চাই তরুণ কবিদের কথা ভেবে, যারা কবিতার আপাত অস্থিরতা কাটিয়ে চেতনার অপরাহত বিশ্বাসে এগিয়ে যাবেন শুভবাদের কাছাকাছি! বিকৃত নেতারা যতই কবিতার মুক্তসেনা করুন, ডাকবাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে কবিতার বিসদৃশ বিকটতা প্রচার করুন, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। বাক্ সর্বস্বতার লজিক উল্টে দিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন ভাষাভাষি কবিদের সংগে বন্ধুদের সহযোগে, জীবনের সংশয় নিয়ে বেঁচে থেকেও এই দশকের কবিতাকে অদিতির পায়ে সঁপে দিয়ে কবির সার্বভৌম অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাই।

অরুণ ভট্টাচার্য

দরজা খুলতেই

দরজা খুলতেই তোমার সঙ্গে
মুখোমুখি দেখা হ'ল।
তুমি বললে 'কেন এলে'!

আমি কোন জবাব দিতে পারি নি।

বোকার মত ফিরে এলাম সিঁড়ি বেয়ে,
ভাবতে ভাবতে
সত্যিই কেন যে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

বন্ধুত্ব

কিছুদিন এক সঙ্গে পথ চলা, পাওয়া
মায়াময় দ্বিতীয় ভুবন।
তারপরে 'বিদায় বিদায়, দেখা হবে '
হয় না। যদি বা হয়, মাঝখানে অতলান্ত খাদ
কী গভীর আর্তিমাখা দুটি প্রসারিত হাত।
অবশেষে ফিরে আসা, ডুবে যাওয়া
ব্যক্তিগত তিমিরে নীরবে।

শোভন সোম

সাম্প্রতিক

এক । চাবি

আমার তোরঙ্গ ভর্তি তালা দেওয়া
ঘুম পাড়ানিয়া গান,
বয়সের নিবন্ত হাওয়ায়
সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি
কবে খুঁজে পাব চাবি
মা আমার
যেটা বেঁধে রেখেছেন তাঁর সেই উজ্জ্বল আঁচলে ।

দুই । জু-পিঁয়র আঁকা ঘোড়া

কাগজ মেঝে দেয়াল
থেকে দ্রুত টান
সওয়ারহীন লাগামহীন
উদ্দাম ঘোড়াগুলো
পলক বিক্ষেপে
ঘর মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে
উড়ে গিয়ে মেঘ হয়ে
আমাদের স্বপ্নে হানা দেয় ।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দুটি কবিতা

দুঃসময়

এখন যেও না কন্যা নাচতে নাচতে নাচাবার মন্ত্র কানে দিয়ে ;
মেঘের গম্ভীর শব্দে নাচে দ্যাখো সকলেই
আগুনের পাচিল ডিঙিয়ে।

এখন যেও না কন্যা এইসব রাস্তা ধরে নৈশ অভিসারে।
দামামা বাজিয়ে আসছে অলক্ষুণে যুবকেরা
বিবাহ বাসরে।

বিশ্বাসঘাতিনী

ক্ষমার অযোগ্য তুমি অপরাধ করেছিলে স্বপ্নের ভেতরে কাল
ঘুমোবার ছলে
আমাকে উপেক্ষা করে, তুমি চলে গিয়েছিলে
ম্লান এক পর্দার আড়ালে।

এখন সমস্ত ঋণ শুধব বলে তোমাদের বাগনের ধারে
মল্লিকা রোপণ করে ভাবছি বসে
শোধ হল দেনা।
উজ্জ্বল গেরুয়া এক শাড়ি পরে তুমি ছুটে চলে গেলে
অচেনা শহরে।
এবারও আমার দিকে চোখ তুলে কেন তাকালে না ?

বাসুদেব দেব

ফিরে আসে

এক একটা জীবন এমনি করেই যায় উদ্দেশ্যবিহীন
ঝড়ো হাওয়ায় ছেঁড়া কাগজের মত উলুঝুলু লক্ষ্মীছাড়া
তারই মধ্যে কখন মেঘের নিচে মন খারাপ
আবছা ভালোবাসা
হাতলভাঙা কাপের মত কাজ চলে যায় ঘরকরণা
তারই মধ্যে আঁকিবুঁকি ট্রেনের বাঁশী ঘুমের ওষুধ
নখের ভিতর ধুলোর মতন মৃত্যুভীতি

তারই মধ্যে ছন্নছাড়া চলমানের খানিক আভাস
ছেঁড়া খোঁড়া তাঁবুর মধ্যে পূর্ণশশীর স্মারক হাসি
তারই মধ্যে চোখের পাতায় শরৎকালের অনন্ত নীল
ভাঙা মেলায় ইজের-পরা বালক এক ফুঁপিয়ে কাঁদে

এক একটা জীবন এমনি করেই যায় উদ্দেশ্যবিহীন
যায় নাকি ফিরে আসে

দেবী রায়

প্রশ্নই আছে শুধু

পিছন থেকে কে আমার নাম ধ'রে, খুউব জোরে
চীৎকার করে ডাক দিলো, প্রাণপণে ?   ঘাড় ফিরিয়ে
দেখি, কেউ কোথাও নেই কোনোখানে ! চতুর্দিক ধুধু !

কে আমার নাম ধ'রে ডাক দিলো, কে রে
সেকি, আত্মা ও ভালোবাসার কাছাকাছি কোনো মানুষ
না, মানুষী ? আধো-জাগ্রত-তন্দ্রামর অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে

দেখি, বন্ধুহীন নিরুপায় আমি একা, পরিত্যক্ত—
আর ট্রাফিক সিগন্যালের ত্রিনয়ন
সর্বতোভাবে ভূতের-হাত ধরা নাকি, আমি এম্নি বেঁহুশ ?

ঐদিকে গড়ের মাঠ—ঐদিকে, রাত্রির জ্যোৎস্না···
এই জ্যোৎস্নায়, হায়েনারা মুর্গীর টুঁটি—টিপে···

নিয়ে যায়, দূরতম কোনো গভীর নিরাপদে।
কান খাড়া রেখে এদিক-ওদিক বেড়াই খুঁজে···
কেউ কোথাও নেই কোনোখানে। প্রশ্ন প্রশ্নই আছে শুধু।

বংশীধারী দাস

ধাঁধার ছড়া

এদিক থেকে ওদিকে যেই চোখ ফেরানো
এদিক থেকে উধাও হচ্ছে সকল জিনিস,
ওদিক থেকে চোখ ফেরালে ওদিকও সাফ।
'ধৈর্য ধরুন'···ব'লে ওঠেন বাক্যবাগীশ।

চোরাগোপ্তা একটা কিল যেই হজম হচ্ছে
ছুটে আসছে হাজারটা কিল ঝাঁকে ঝাঁকে
ধাঁধার মত···আড়াল থেকে নাটের গুরু
পরখ করেন পাকস্থলীর শক্তিটাকে।

খুলতে গিয়ে ধাঁধার জটিল গ্রন্থিগুলি
খুইয়ে এলাম ভিটেমাটির সকল সত্ত্ব,
হৃদয় থেকে তরতাজা সব স্বপ্ন এবং
স্বস্তি-সুখের আকাঙ্ক্ষা আর মনুষ্যত্ব।

মহাপ্রভু, আর কী দেবো ? আদেশ করুন।
দিচ্ছি, দেখুন, শরীর থেকে মাংস খুলে
এবং, দেখুন, দেবো বলেই এই এনেছি
অস্তিত্বটাই রক্তে-ভেজা শিকড় তুলে।

সবই দেবো। দোহাই, প্রভু, আপনি শুধু
থামান কিংবা খাটো করুন বক্তৃতাটা,
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে বাড়ায় কেবল
যন্ত্রণা আর অবিশ্বাসের তিক্ততাটা।

পরিমল চক্রবর্তী

সময় পেলেই তোমার কাছে যাবো

সময় পেলেই তোমার কাছে যাবো।
এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি ;
চতুর্দিকে সর্বনাশের কালো,
হৃদয় যেন শোকের পাষাণপুরী।
যে-পথ ধরে অনেক করুণ স্মৃতি
মরুর বুকে ছায়ার মতো ছিলো,
সে-পথ গেছে অনির্দেশের বাঁকে—
এখন আমি ধ্বংসের কাছাকাছি।

বেদনা নয় ভীষণ কালো তৃষ্ণা
অঙ্গ জুড়ে তুলেছে তুমুল ঝড় ;
দু'চোখ খোঁজে স্মৃতি-জাগানিয়া ছবি ;
এখন আমি মৃত্যুর দিন গুনি ।
মমতা নেই, কোথাও মমতা নেই,
পৃথিবীময় বিপুল নিষ্ঠুরতা ,
এখানে আমি নির্বাসিতের মতো,
সময় পেলেই তোমার কাছে যাবো ।

প্রদীপ মুন্সী

মনে পড়ে যায়

জোয়ারের ঢেউয়ের আঘাতে
ভিত কেঁপে ওঠে
এমনি জোয়ারের রাতে
মনে পড়ে
যেতে হবে একা ভেসে
অনির্বাণ সাগরে
যাই
যাই প্রভু আমি যাই ।
ফিরে আসি ফের
রোদে জলে ধান বুনি
আমার সুখের প্রান্তরে
জীবনের কলরব
মনে পড়ে যায়
প্রভু
আমার যাওয়া আর আমার আমার শেষ নেই ।

গোকুলেশ্বর ঘোষ

সাপ খেলার বাঁশী

সাপ খেলার বাঁশী বাজে
জ্যোৎস্নালোকে এগিয়ে আসে
মাথায় মণিহার :
(যে যা বলে)
ভালবাসার জ্বালা
লোকলজ্জা বাধা মানে না
বিষে বিষক্ষয়—মন্ত্রপূত শিকড় গঙ্গাজল।

জয়ন্ত সান্যাল

একা একা

দুঃখ ছেড়ে পালাবি তুই ? অচিনপুরে
পাহাড় চূড়ায় ?

রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে দিলেই
দেশান্তরী হয় নাকি কেউ ?

সাথীহারা

নদীতে সেতু নেই।

মেয়ে, তুই আজো দাঁড়িয়ে ঘাটে ?
শেষ খেয়ায় কি
আসতে পারে ভালোবাসা ?

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

আবহমান

(শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু)

"মায়াময় দ্বিতীয় ভুবন, তারপরে
বিদায়, 'বিদায় বিদায় দেখা হবে'।
হয় না। যাদ বা হয়, মাঝখানে অতলান্ত খাদ।"

ভুবন থেকে অন্য ভুবন
চলে যেতে যেতে
নির্বাসিত করে তোমার চোখের প্রার্থনা
প্রসারিত হাত দুটি করুণায় বিস্মিত
দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে।

ফিরবে? ফিরো না
তোমার মনে আশ্চর্য আলাদিনের প্রদীপ
জ্বলতে থাকবে চিরকালই
সুখ দুঃখ ভালোবাসায়।

নারায়ণ ঘোষ

এখন জরুরি শুধু

যাদের দেবার কথা নীল চিঠি যারা প্রতিশ্রুত ছিল, কাঁচা মাংস চোলাই মদের আড্ডা তিন তাসে কাঁচা খিস্তি সঙ্গমের গল্প ছেড়ে তারা কেউ এল না। এভাবে ঠায় বসে আছি। ঘাড়ে ফিক্ লেগে গেল। মুঠি আলগা হয়ে গেল। হাত থেকে খসে যাচ্ছে পৈতৃক বাঁকানো

লাঠি প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ সব পাণ্ডুলিপি স্বরলিপি নাচের নিখুঁত মুদ্রা তর্জনীর গোপন সংকেত আজ ঝুরঝুরে বালির মতন। তাই এখন জরুরি শুধু ফিরে যাওয়া আদিবাসী কিষাণীর বুকের উঠোনে। উষ্ণ খবর ওখানে আছে।

কেউ ফিরে এল না তো। অথচ কথাই ছিল নীল চিঠি টেলিগ্রাম দিয়ে যাবে। কেউ তো এল না। ঠায় বসে আছি। এই তো সময়।

প্রদীপ রায়গুপ্ত

প্রতিষ্ঠা

হৃদয় ব্যেপে প্রতিষ্ঠা তোর, তাই তাহা সম্পূর্ণ না ;
ওলোটপালোট মুকুর জুড়ে কী পেয়েছিস—বিস্তৃত
মরীচিময়, না-হ'লে তুই দু-হাত ধ'রে বিষ নিতি !
ঈশ্বরেরও মূত্র এবং স্বেদের স্বাদ ঘোর নোনা।

তবু মানুষ, একা মানুষ, নিজস্ব তার পিত্তলে
সোনার মূর্তি গড়লো এবং বিষাদ করলো স্থানীয়
মাংসে এবং স্বপ্নে তার—ভাঙিয়ো, তাকে ভাঙিয়ো—
কে কারিগর কেন এবং কিসের এই ভিত তোলে ?

স মা লো চ না

আলোর রেখা : সুধীর চন্দ্র রায়। নলেজ হোম। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।
মূল্য—আট টাকা।

ধস : নিখিলচন্দ্র সরকার। অনন্ত প্রকাশন। ৬৭, কলেজ স্ট্রীট।
কলিকাতা-১২। মূল্য—আট টাকা।

স্বপ্নের ধ্বনি : নিখিলচন্দ্র সরকার। পূর্ণ প্রকাশনী। ৮এ, টেমার লেন।
কলিকাতা-৯। মূল্য—আট টাকা।

আপাত চোখে মনে হয় বাংলা উপন্যাস আজ কতই না সমৃদ্ধ—বহু ক্ষুদে ক্ষুদে স্রোতস্বতী থেকে জল টেনে নিয়ে সে আজ মহানদী হয়ে 'টুরিষ্ট গাইড' লিখছেন, তিনিও উপন্যাসের উত্তেজনায় সজ্জিত হন; যিনি নিতান্তই অবধূত জাতীয় ব্যক্তি। তিনিও একই অনুপানে ঠোঁট রাঙা করেন (হায় জলধর সেন, তুমি বৃথাই হিমালয় লিখেছ!) বিকৃতির উদাহরণ আর বৃদ্ধি করব না।

অথচ আঠার শতকে উপন্যাস যখন জন্মাচ্ছে তখন তার অন্য কোন তৃষ্ণা ছিল না, একমাত্র তৃষ্ণা কী করে চলমান জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। ঔপন্যাসিক চেয়েছিলেন আমাদের তৎকালীন জীবনে যেটুকু বিশৃঙ্খলা, তার সমালোচনা; যেটুকু শৃঙ্খলা বা সুস্থতা, তার স্বীকৃতি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অর্থই উত্তেজক গল্প। অথচ গ্যারগ্যানটুয়া-পেনটাগ্রুয়েলের মস্করা ত এরই প্রতি। মিসিসিপি অভিযানে মার্কিন কথাশিল্পীর কলম থেকে নির্গত অম্ল মিশ্রিত রস সংগে উপভোগের হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র ও তারাশংকর পর্যন্ত যে ইতিবৃত্ত, তা বেশ সহজ স্বাভাবিক এবং

বাস্তবধর্মী হবারই সাধনা। বাংলা উপন্যাসের পাঠক জানেন যে, কলরব ছাড়াও কথা হয়, সুর চড়া না হলেও গীত হতে বাধা নেই, ব্যথার প্রকাশ মরা কান্না নয়। অর্থাৎ 'Sensational' এর বিকল্প শব্দ 'Sensitive' নয়।

জীবনের মুখোমুখি হতে তাঁদের ভয়। জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু মুখোমুখি কদাচ হন। তবু এই ভ্রান্তিবিলাসের যুগে মাঝে মাঝে দুই একজন কথাকারের পরিচয় হয়' যাঁরা যুগের শিল্পী হয়ে যুগ অনাচারের হাত এড়াতে চেয়েছেন। তাঁরা আধুনিক, কিন্তু তাঁরা যুগ-তাড়িত নন।

সুধীরচন্দ্র রায়ের 'আলোর রেখা,' এবং নিখিলচন্দ্র সরকারের 'ধস', ও 'স্বপ্নের ধ্বনি' সত্যিই আশ্বস্ত হবার মত লেখা।

সুধীরচন্দ্র রায় চল্লিশ দশকে অরণি ও পরিচয় পত্রিকায় কয়েকটি ভালো ছোট গল্প লিখেছেন। তারপর দেশ ভাঙ্গার পর তিনি লেখা ছেড়ে দিয়ে অধ্যাপনার কাজে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তিনি কথা-সাহিত্যের দরবারে আবার হাজির হলেন এটা আনন্দের সংবাদ। তাঁর উপন্যাস তাঁরই মতো বিগত যুগের কাহিনী-সমৃদ্ধ। সুধীরবাবু বর্তমান যুগে বিড়ম্বনার শিকার ব্যক্তিগত জীবনে। সম্ভবত উপন্যাস তাঁর আত্ম-রক্ষার উপায়। তিনি ত্রিশ দশকে উজিয়ে গিয়ে নিজেকে ফিরে পেয়েছেন।

নিখিলচন্দ্র অতীতে ফিরে যান নি, তিনি অতীব প্রত্যক্ষ যুগের শিল্পী। তাঁর উপন্যাসে সত্তর সালের বাংলাদেশ তীব্রভাবে উপস্থিত। নিখিলবাবুর 'স্বপ্নের ধ্বনি' বা 'ধস' একই জীবনের বহুবচন। অথবা বলা যেতে পারে তাঁর ধস উপন্যাসখানি যেন 'স্বপ্নের ধ্বনি'র পুনর্লিখিত রূপ। স্বপ্নের ধ্বনি খসড়া মাত্র। 'স্বপ্নের ধ্বনি' অপেক্ষাকৃত রোম্যানটিক, কর্তব্য এবং প্রেমের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার সমাধান ফুটিয়েছেন লেখক কর্তব্যের ন্যায়ে। তবে শরৎচন্দ্রের রীতিতে নয়।

রোম্যানটিক হলেও আধুনিক রোম্যানটিকতা। 'ধস' অপেক্ষাকৃত সহজ ও বাস্তবানুগ, তাই স্বচ্ছন্দ।

নিখিলবাবু মধ্যবিত্ত সংসারের সংকটের ছবি এঁকেছেন। কোলকাতার এক বিশেষ পল্লীতে কাহিনী গড়ে উঠলেও এখন কলকাতার যে কোন পাড়ারই গল্প। ধস উপন্যাসে দুটি পরিবারের কাহিনী, রতিকান্তের পরিবার আর অঞ্জনার পরিবার। রতিকান্তের পরিবার হোল অবসারপ্রাপ্ত শিক্ষক পিতা, রুগ্ন মা, তিন ভাই এবং তিন বোন নিয়ে গঠিত। বাবা আদর্শবাদী শিক্ষক, রতিকান্ত নতুন যুগের যুবক, তার মধ্যে বাবার আদর্শবাদ কিছু প্রতিধ্বনি তুলেছে। রতিকান্তের মারফৎ অঞ্জনার পরিবারের সঙ্গে পলকের যোগাযোগ ঘটে। অঞ্জনা, রঞ্জনা, মিহির আর তাদের মা এই নিয়েই ঐ পরিবার। গল্প মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা নিয়েই এগিয়ে চলেছে। রতিকান্তের চোখ দিয়ে আমরা সব দেখছি। রতিকান্ত দেখছে তার এক ভাই বেকার, সে-সামাজিক লোকদের সঙ্গে মেশে, আর এক ভাই বেকার, সে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যায়! রতিকান্তই কফি হাউসে যায়, প্রকাশকের দোকানে যায়—ঐ সব আস্তানাগুলো মধ্যবিত্তদেরই লীলাভূমি!

রতিকান্তের এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, আর এক বোন বার বার ইণ্টারভিউ দেয়, অথচ কেউ পছন্দ করে না; আর এক বোন আপন মাসতুতো ভাইএর সঙ্গে পালিয়ে যায়। রতিকান্তই অঞ্জনার পরিবারের খবর জানায়। অঞ্জনার বাবার মৃত্যুর পর তার মুখ থেকেই জানতে পারি। অঞ্জনা তার কাছে এগিয়ে এল; কারণ তার মন তার বাবার কাছে থেকে কিছু আশীর্বাদ নিয়েছিল।

রতিকান্তই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র; রতিকান্তই নিখিল বাবু। আর নিখিলবাবুর অনেক সৎ অভিপ্রায় বা বাসনা বা পছন্দ রতিকান্ত ধরে রেখেছে। এক অর্থে নিখিলবাবুর উপন্যাস নিখিলবাবুর আত্ম-জীবনী। নিখিলবাবু কোন চরিত্র আঁকেন নি; তাঁর কাছে কোন মানুষ নেই,

আছে ঘটনা ও আছে সমাজ। তিনি সামাজিক ইতিহাস বলেছেন অবক্ষয়ের ছবি এঁকেছেন। নিখিলবাবুর সম্বন্ধে একটি ভয়। তিনি যে জগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, এবং সে জগতকে তিনি ভালবাসবেন, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাকেই যদি সর্বস্ব ভাবেন, তবে আশঙ্কার কারণ আছে। মধ্যবিত্তের জগৎ মধ্যবিত্তের পক্ষভূত হয়ে এবং মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখলে সত্য উদ্ঘাটন হবে না। "ওল্ড ফাদার 'ডোরিও' বা স্মোক' বা 'ইডিয়ট' মধ্যবিত্তের মোহন সংসারের গল্প নয়। এখানে লেখকরা ঐ বলয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শিল্পী যে প্রেমিক, তিনি সাধকও বটে। আর সাধনার সঙ্গে বেদনা থাকে, এবং বর্তমানের অবসান কামনা থাকে। নিখিল-বাবু স্বপ্নার বিদায় মুহূর্তের কারুণ্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এঁকেছেন। ছোট্ট একখানা ব্লেড নিয়ে এসে মেয়েটি বাবার পায়ের নখ কেটেছিল; ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু নিখিলবাবু বলেছেন অসামান্য ভাবে, কারণ তিনি অতি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বলেছেন। তিনি যে যথার্থ শিল্পী, ঐ বর্ণনাতেই পরিস্কার হয়ে গেছে। সুধীরবাবু যেহেতু চল্লিশ বৎসর পূর্বের জগৎ বর্ণনা করেছেন, তাই তাঁর গল্পের ঝোঁক আলাদা। সে জগৎ প্রাক্-বিভাগ বাংলা দেশের এক অঞ্চল। যমুনা নদীর তীরে সিরাজগঞ্জের এক শিশুর চোখ দিয়ে তিনি জীবন ও জগৎকে দেখেছেন। নিজের পরিবার, নিকটস্থ প্রতিবেশী সবাই কম বেশি সৎ বা অসৎ গুণের অধিকারী। সুধীরবাবু ফাপা মানুষের গল্প বলেন নি। তাঁর লেখার ফাঁকি হয়ত আছে। সুধীরবাবুর গদ্য বেশ ভালো। পরিবেশ বেশ রঙচঙে। প্রশস্ত নদী অবারিত ধানের ক্ষেত, সংলাপের বাতাস উচ্চারণ সব কিছু বেশ আস্বাদনযোগ্য।

নিখিল বাবুর ঐ সব অতিরিক্ত মশলা নেই, এই মরুভূমিতে তিনি কলকাতা তথা পাইকপাড়া টালার সেই বিজন অঞ্চলে ফুল ফুটিয়েছেন লোকগুলোও সেই একই প্রকার। মধ্যবিত্ত বৈচিত্রশূন্য সমাজের

ছাচে ঢালাই মানুষ। তাদেরই আকর্ষণীয় করতে হবে। তিনি তাদের করে তুলেওছেন।

সুধীরবাবুর উপন্যাসে বৈচিত্র্য বেশি, পরিবেশ যেহেতু উদারতর। এ উপন্যাসে বেশ্যা আছে, নিম্নশ্রেণীর মানুষ আছে, হিন্দু মুসলমান দুটি পৃথক সম্প্রদায়ের চরিত্র আছে। তুলনায় নিখিলবাবুর উপন্যাস একেবারেই সংকীর্ণ ক্ষেত্রের উপন্যাস। এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে তিনি সমালোচনা করতে চেয়েছেন, তবে পরিবর্তন করতে চান নি। মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে বলেই তাঁর সমালোচনা; যদি শক্ত হয়ে টিঁকে থাকত, তবে বোধহয় অনুতাপ করতেন না। তাঁর বাবার কণ্ঠের ঔপনিষদিক স্তোত্র তার ভালো লেগেছে, অঞ্জনার দেওয়া দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদী ফুল রতিকান্তের সঙ্গে তিনিও সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। সুধীরবাবুও ঐ সমাজের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে আছেন তার মধ্য দিয়ে বড় হবার সুযোগ দেখতে পেয়েছেন—একেবারে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপুর' মতো। বুঝতে পারি তখনও ঐ সমাজের শ্রী-সৌন্দর্য অতীতের গল্প হয় নি। তাই সদ্য-উপনয়নগ্রস্ত নায়ক পৈতা ধারণ করে অনেক আস্থাবোধ করে, পিতাকে জড়িয়ে ধরে সংকট থেকে ত্রাণ পেয়েছে। এ-সব গল্প মধ্যবিত্ত মেদুর জগতের পুরানো রূপকথা। সুন্দর শুধু নয়, জাতিভেদ অধ্যুষিত সমাজের 'moral justification'.

তাই বলে এঁদের দুজনের কেউই আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মত নীতিহীনতার সাফাই গাইতে বসেন নি। তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন; এবং সংস্কারও কামনা করেছেন, সে কামনা হয়ত মনে মনে জেগেছে। এই বিশেষক্ষেত্রে নিখিলবাবু খুব সতর্ক; তাঁর রতিকান্ত, অঞ্জনা শিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত পাত্র-পাত্রী। তাদের চলাফেরা, মেলামেশা—সম্ভ্রম-সূচক। নিখিলবাবু রুচিবান শিল্পী, যখন অবক্ষয়ের ছবি এঁকেছেন, হতভাগিনী স্বপ্নার অধঃপতনের সূচনাটি যখন বর্ণনা করেছেন, তখন তিনিই সবার আগে (এবং পাঠকের অলক্ষ্যে) কেঁদে নিয়েছেন।

কলমের কালির মধ্যে তার কিছুটা আভাস আছে, চোখ মোছার মৃদু সংকেতটুকুও আছে।

নিখিলবাবু পাপী দেখেছেন, অপরাধী দেখেন নি। নিখিলবাবু কবে অপরাধীদের দেখবেন, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তবে ভরসা আছে সে অপেক্ষা শূন্যগর্ভ হবে না। সুধীরবাবুর মতো তিনি অনেকখানি তৈরী হয়ে আসেন নি। সেটা যেমন দুর্বলতার কথা, তেমনি আশ্বাসেরও কথা। নিখিলবাবু লিখছেন, 'স্বপ্নের ধ্বনি' থেকে 'ধসে' অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। নিখিলবাবু লিখবেনও। আমাদের বিশ্বাস নিখিলবাবু ভবিষ্যতে একজন সত্যিকারের কথাকার হবেন, শুধু নাম-করা লেখক নন। আর সুধীরবাবু আবার কবে লিখবেন, আমরা জানি না। সাহিত্যে, জীবনের মতই, আকস্মিকতার মূল্য নেই, মন্ত্রগুপ্তির স্থান নেই। একটি শুধু প্রার্থনা, তাঁরা উভয়েই স্ব-শ্রেণী, স্ব-সমাজের গল্প লিখিয়ে থেকে জীবনের শিল্পী, এবং কথা-কার হয়ে উঠুন। তখন আর নির্লিপ্ততা বা উদাসীনতা নয়, চাইব নিরপেক্ষতা সফল সার্থক শিল্পের যা মূলধন।

সুরেশ মৈত্র

বর্ষার পদাবলী, সম্পাদনা : মঙফিল হক ।। মূলাটোল; রংপুর। বাংলাদেশ। দুই টাকা

যদিও ভূমিকায় বাঙালী চিত্তের চিরাচরিত বর্ষাজনিত বিরহ-আকুতির আভাস দেওয়া হয়েছে, তথাপি এ সংকলনের প্রতিটি কবিতায় সেই একই বিরহের সুর ধ্বনিত হয় নি। না হওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ, কালিদাসের কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বর্ষাঋতু বাঙালীর বিরহকাতর পেলব অন্তরটিকে সিঞ্চিত করলেও তৎপরবর্তী যুগে বা, একেবারে তরুণতম কবির কবিতা রূপ নিটোল বিন্দুতে বর্ষাঋতুর

সেই একই ধারা সেই অবিরাম বিরহবিধুর চিত্রকল্প ছায়া ফেলে না। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বর্ষা-জনিত প্রতিক্রিয়া সমস্ত কবির মনে এক নয়। শুধু বর্ষার প্রতিচ্ছবিই যাঁরা একেছেন তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু বর্ষার প্রতীকিকরণে যাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দৃষ্টির ফারাক আছে, ক্ষণবিশেষে অনুবর্তনের অন্বিষ্টে প্রভেদও আছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা এ-সংকলনে সংযোজিত হয় নি, তবু মনে পড়ে যায় বৃষ্টিধারা শব্দের নিশাজলে সুধীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে প্রতিবিম্বিত দেখেছেন—'তবু অন্তরে থামেনা বৃষ্টিধারা। আর্দ্র ধূসর বিদেহ নগর। মৎসর প্রেতপারা'। যার আলম্বিত বিপরীত রূপ দেখতে পাওয়া যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'হাজার হাজার ছেলে এখন তোল-পাড় করছে। নরখাদকের শান্তি সমস্ত শরীরে বৃষ্টি নিয়ে'। তরুণ সান্যাল ও সেই একই সংকেতে অনড়—'আমারি বৃষ্টিকণা। রমনীর মাটি ছিঁড়ে দেয় তীব্র ফলার বিঁধ।—মাঠে ছট্‌ফট্ শিশু হেসে ওঠে'। আবার, 'এক বর্ষায় এত রক্ত ধুয়ে যাবে ভাবলে কি করে। এত হত্যা মুছে যাবে মন থেকে?' অমিত বসুর এই উক্তির সঙ্গে প্রথমোক্ত দুজনের কবিতার আপাতঃ বিরোধ সহজেই অনুমেয়।

যেমন স্মৃতির ভেতর ডুব না দিলে পৌঁছুনো যায় না অতীতে, তেমনি মেঘ-মেদুর আকাশ আর বৃষ্টিঝরা অবকাশের দিনটি না এলে নিশ্চিন্তে ডুব দেওয়া যায় না স্মৃতির অথৈ জলে—স্মৃতিময় প্রবাল দ্বীপে;—অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় কেন্দ্রীভূত মূল অণু সম্ভবতঃ এইটিই।—'বৃষ্টি, না নামলে আর ঘরে ফেরা সহজ হবে না'…'বৃষ্টি না নামলে আর কেউ বুঝি বন্ধুকে ডাকবে না'।

ঠিক একইভাবে মহফিল হকের সামনে একটা গোটা বাদল দিন কেটে যায় শুধু একমুঠো রোদ্দুরের আশাতে; কবি সম্বিৎ ফিরে পান তখন যখন একসময় বেলাটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় 'পশ্চিমের জানালার ফাঁকে। অন্ধকারের অপেক্ষায়'।

ওপার বাংলার কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমানের 'প্রবল কালো

ছিঁড়ে বৃষ্টি-জালের। আসো নি নিরুপমা' আবু কায়সারের 'বরফ পড়ছে ছাখো ছিন্নভিন্ন শ্রাবণের ধারায়' আবু ইউসুফ আতাউর রহমানের 'সুধু বৃষ্টির জন্য। আমি এখন সময় গুণছি', শরীফা খাতুনের 'অবিরাম বৃষ্টি চলে। খুলে যায় মনের বন্ধ কপাট, ভাবি। ভাবি এলো কি ফিরে চণ্ডীদাসের কাল ?'—এই ছত্রগুলির অমোঘ আকর্ষণ আছে যা অচিরাৎ কবিতার সূক্ষ্ম তটে মনকে পৌঁছে দিতে পারে।

পরিশেষে বলতে হয়, ওপার বাঙলার কয়েকজন নবীন কবি ছাড়াও এপার-বাঙলার বেশ কিছু নামী কবির কবিতা এ গ্রন্থে প্রবিষ্ট হয়েছে যা কোনো না কোনো কারণে পরিপূর্ণ নিটোল কবিতা হয়ে ওঠে নি।

জয়ন্ত সান্যাল

পাবলো পিকাসো

শিল্পীজীবনের প্রথম পর্যায়েই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন পাবলো পিকাসো। তাঁর নতুন চিত্রভাবনা তামাম দুনিয়ার চিত্রামোদী আর চিত্রসমালোচকের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। চিত্রজগতের সমস্ত ধারণা ভাবনা তছনছ করে একটা নাম জেগে উঠলো। পিকাসো। খ্যাতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছেও বিচলিত নন তিনি। অসংখ্য মানুষের কাছে এক আশ্চর্য কিম্বদন্তীর মতো তিনি বেঁচেছিলেন। ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করেছেন। সারাজীবন নতুন রাস্তা খুঁজেছেন। যা ভাবছেন যা বলতে চাইছেন তা প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। আসলে আমরা কেউই নিজের ভাবনাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারি না। পিকাসো বলেছিলেন যে ছবি সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা ভালো, কিন্তু তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে গবেষণা করার কোনো দরকার নেই। পাখির ভাষা আমাদের জানা না থাকলেও তো পাখির গান ভালো লাগতে পারে। পিকাসো বারবার নিজের রীতি বদলেছেন। নিজেকে একাধিকবার ভেঙে নতুন করে গড়েছেন। তিনি নিজে অবিশ্যি চিত্ররীতির বিবর্তন স্বীকার না করে অনায়াসে বলেছেন যে তাঁর ছবি কোনো চিত্ররীতির বিবর্তন নয়—যা ধাপে ধাপে অমেয় রহস্যের দিকে নিয়ে যাবে। তাঁর ছবি একান্তভাবে বর্তমানের—শুধু তাই নয় তা বিশেষ মুহূর্তের ছবি।

আঠেরো শো একাশি সালের পঁচিশে অক্টোবর স্পেনের মালাগা শহরে তাঁর জন্ম হয়। পুরো নাম পাবলো রুইজ পিকাসো। পিতা জোসে রুইজ ব্লাসকো একটি বিদ্যালয়ের কলা শিক্ষক ছিলেন। তাঁর

মায়ের নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকায় পিকাসোর প্রবল ঝোঁক। আকাদেমী অব বারসেলোনায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর তিনি ভর্তি হন আকাদেমী অব মাদরিদ-এ। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন তিনি। কখনো এল্ গ্রেকো, কখনো জাপানি প্রিন্ট, কখনো জারমান খোদাই, কখনো বা রাফায়েল-এর আগের যুগের ইংরেজ শিল্পীদের প্রভাব পড়তে লাগলো তাঁর কাজে। প্যারীতে এসে নানা শিল্পী ও লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি। উনিশশো এক সালে পিকাসোর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল শিল্পকলার অন্যতম কেন্দ্রভূমি প্যারী শহরে। পিকাসোর শিল্পী জীবনের দুটি প্রধান পর্যায়ঃ ব্লু পিরিয়ড আর পিংক পিরিয়ড। পিকাসো এঁকেছেন নর্তকী, মদ্যপ, গণিকার ছবি। এঁকেছেন একের পর এক অসংখ্য ছবি--বুভুক্ষু নরনারীর ছবি, অন্ধ ভিখারীর ছবি। এই সব ছবিকে এক্সপ্রেশনিজম্ এর তীব্রতম অভিব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়। পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলা আমূল পরিবর্তিত হলো পিকাসোর ছবিতে। নতুন আঙ্গিক আর চিত্রভাষার স্রষ্টা হিষেবে অভিনন্দিত হলেন তিনি। পিকাসো জানিয়েছেন যে তিনি আকারকে যেভাবে দেখেন সেভাবে আঁকেন না, যেভাবে জানেন সেইভাবে আঁকেন। নিগ্রো ভাস্কর্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ক্রমশ তাঁকে কিউবিজমের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেখি আমরা। কিউবিস্ট আন্দোলনে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন ব্রাক।

পিকাসোর কথা থেকেই জানা যায় যে তিনি ছবি আঁকেন যেমন অন্যেরা তাঁদের জীবনী লেখেন। তাঁর চিত্রাঙ্কন, তা সম্পূর্ণই হোক বা অসম্পূর্ণ হোক, একেকটি ছবি তাঁর রোজনামচার একেকটি পাতা। ভবিষ্যৎকাল তার পছন্দমতো পৃষ্ঠাগুলো বেছে নেবে এই রোজনামচা থেকে। তাঁর পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। চারুকলার নানা আন্দোলন তাঁর মনে কৌতূহল জাগায়। তাঁর ছবিতে কোনো সময়ে সেজান, গগ্যাঁ, মনেৎ ভ্যান গগ্, তুলো লত্রেক প্রভৃতির প্রভাব

পড়েছে। তাঁর ব্লু পিরিয়ডে দেখি নীলরঙের প্রাধান্য আর পিংক পিরিয়ডে গোলাপী রঙের ব্যবহার সর্বাধিক। পিকাসো বুঝিবা ঈশ্বরের মতো অজস্র চোখের অধিকারী—অজস্র চোখ দিয়ে জীবনকে নানাভাবে দেখেছেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সৃষ্টিতে ক্লান্তিহীন, ভাবলে অবাক হতে হয় যে এই নব্বইতেও তার শিল্প প্রবাহ কোথাও নয় অবরুদ্ধ। তার ছবির সংখ্যা ঠিক কত বলা শক্ত। তার অসংখ্য ছবির খবর অনেকের জানা নেই। আন্দাজে ঢিল মারা এমন কোনো সংখ্যায় আমাদের নিশ্চয়ই আগ্রহ নেই।

পিকাসোর অনেক ছবির মধ্যে 'গ্যেরনিকা' ছবির নাম প্রায় সকলেরই জানা আছে। উনিশশো সাঁইত্রিশে স্পেনের ছোট্ট শহর গ্যেরনিকা ফ্যাসিষ্ট বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হলো। এই 'গ্যেরনিকা' ছবিতে পিকাসের ক্ষোভ, ক্রোধ, জ্বালা, ঘৃণা ও মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে। পিকাসোর নানা ছবির মধ্যে নাম করা যায় পুওর পিপল অন দ্য সি-শোর, উম্যান উইথ এ ক্রো, দ্য টু সিসটারস্, দি জাগলার, দ্য খ্রি ড্যান্সারস, ডেথস হেড, লে ডিময়সেল দ্য এভিগনন ইত্যাদি। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক চতুষ্কোণরীতি তার অন্যতম অবদান।

তার ছবিতে অনিবার্য ছায়া ফেলেছে মানুষের হতাশা, দুঃখ, দারিদ্র্য, বিষাদ, যন্ত্রণা, ভালোবাসা, যৌনতা, আনন্দ, সারল্য। মানুষের বিবিধ সমস্যায় পিকাসো ভাবিত ছিলেন। মানুষের অসহায়তা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। পিকাসো জানতেন যে মানুষের চেহারা বারবার বদলায়। তিনি খুঁজছিলেন মানুষের ভেতরের প্রকৃত মানুষের চেহারা এবং তা পেলেন পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো ও আইবেরিয় শিল্পে। তাঁর লে ডিময়সেল এভিগনন ছবিটি নতুন শিল্পাঙ্গিকের ঘোষণা বহন করছে।

পিকাসো বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ও বিতর্কিত শিল্পী। তিনি কম্যুনিস্ট, কিউবিজমের অন্যতম প্রবর্তক, দুর্বোধ্য ছবির জন্মদাতা, অস্থির মানুষ, পরম প্রতিভাবান শিল্পী, চির যৌবনের অধিকারী, প্রেমিক সাহিত্যিক, প্রগতিবাদী, বুদ্ধিজীবী, শতাব্দীর

বিস্ময়, নিঃসঙ্গ ঈশ্বর—এই অসংখ্য বিশেষণে ভূষিত করেও তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায় না। পটারি আর ভাস্কর্যেও তাঁর দক্ষতা সুবিদিত। পিকাসো কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেছেন। কাম্যু সাত্র্‌র এর মতো লেখকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল।

অতি সামান্য বস্তু যা আমাদের কাছে অবহেলার সামগ্রী তাও তাঁর হাতে পড়ে সার্থক শিল্পে পরিণত হতো। এ ব্যাপারে তিনি জাদুকর। পিকাসোই বলতে পারেন 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।'

তাঁর জীবনে নারীর ভূমিকা নগণ্য নয়। একের পর এক নারী তাঁর জীবনে এসেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় তাঁর মডেলের ভূমিকা নিয়েছে। অল্‌গা কখ্‌লভা, ফেরানডে অলিভিয়ের, ওয়ালটার, ফ্রাঁসোয়াজ জিলো, ডোরা মারসেল-ভিত্তে, জ্যাকুলীন রোক প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

পিকাসো স্বীকার করেছিলেন যে শিল্প তাঁর থেকে শক্তিমান কারণ তাঁকে দিয়ে শিল্প যা করাতে চায় ঠিক তাই করিয়ে নেয়। একমাত্র পিকাসোই বলতে পারেন যে তিনি খোঁজেন না, তিনি পেয়ে যান। এ অহমিকা নয়, এ তাঁর স্বীকারোক্তি।

'আমার কাজ শুধু আমার ছবিতে যথাসম্ভব মানবতা এনে দেওয়া। তাতে যদি প্রথাসিদ্ধ মানব পুত্তলীরা চটেন তাহলে নাচার।' পিকাসোর এই উক্তি তাঁর মানবতাবাদের পরিচয়। এই মানবতাবাদ তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহৎ শিল্পী করে তুলেছে, সন্দেহ নেই। তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে শিল্পী ও জনসাধরণের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ রয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে শুধু ছবি আঁকতে শেখানোই সব নয়। কি ভাবে ছবি দেখতে হয় তাও শেখানো দরকার।

শোনা যায় পিতা বালক পিকাসোর প্রতিভার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। পিকাসো কোনদিন ভনিতায় বিশ্বাসী ছিলেন

না। তাঁর ছবির মতো আর কোন আঁকিয়ের ছবি এত বেশি দামে বিক্রি হয় নি। পিকাসোর নব্বই বছর বয়সে তাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য লণ্ডনের ষ্টেট আর্ট গ্যালারি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোনালী চুল আর মিষ্টি হাসি শিশুরা উড়িয়েছিলো নব্বইটি উজ্জ্বল শ্বেত কপোত। সে তো সেদিনের কথা। আর আজ সেই নিঠুর দরদী পিকাসো নিজেই অগণিত চিত্রামোদী'র মনে একটি স্থির চিত্রে পরিণত হলেন। এই মনুষ্য জীবন তাঁর কাছে ছিল এক আশ্চর্য কবিতা যা বারবার পড়েও পুরনো হয় না। গত ৮ই এপ্রিল ১৯৭৩ দক্ষিণ ফ্রান্সের মুঁগা শহরে শ্রুতকীর্তি পিকাসোর কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটলো। শিল্পী অন্তর্হিত, পেছনে পড়ে রইলো ছবি আর ভাস্কর্য, পিকাসোর বলিষ্ঠ জীবন-প্রেমের অবিনাশী স্বাক্ষর।

শিবাজী গুপ্ত

উত্তরসূরি : নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি :

১. নতুন লেখকদের লেখা সাদরে গৃহীত হয়। ডাকযোগে নির্ভুল ঠিকানা লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠালেই চলবে। সর্বদাই কপি রেখে দেবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া অসুবিধা। উত্তর পাবার জন্য ডাকটিকিট পাঠাবার দরকার নেই।

গ্রাহকদের প্রতি :

২. কার্তিক থেকে বর্ষারম্ভ। নিজের দায়িত্বে শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা পেলেই ৫'০০ এম-ও করে পাঠাবেন। জানবেন পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশে গ্রাহকদের দায়িত্ব কম নয়। পত্রিকাকে তাঁরাই বাঁচিয়ে রাখেন। বিশেষ সংখ্যার দাম বর্ধিত হলেও, গ্রাহকরা বার্ষিক চাঁদার মধ্যেই পাবেন, যদি না কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩. উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য কলকাতার স্টলে পত্রিকার জন্য খোঁজ নিন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

৪. অশালীন কপি বা কুরুচিকর ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

৫. বিজ্ঞাপনদাতাগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তাদের অকৃত্রিম সাহায্য চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

এজেন্সীর জন্য :

৬. ৫ কপি বা তার উর্ধ্বে অর্ডার দিলেই শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীর জন্য উত্তরসূরি দপ্তরে চিঠি লিখুন, অথবা শ্রীঅজিত দাস, বইঘর, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় ও ব্যবসায়িক দপ্তর : ৭বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক স্বরূপা ট্রেডিং কলিকাতা ৫০ হইতে মুদ্রিত ও উত্তরসূরি কার্যালয়, কলিকাতা-৫০ হইতে প্রকাশিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা ১

অন্নদাশংকর রায়

[সূচনা :—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. এ পাশ করে কীভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করা যায়, এ বিষয়ে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী গত বৎসর (১৯৭৩ সালের দিকে) আমার কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছিলেন। তখন আমার মনে হয়েছিল, আধুনিক কালের ভাবধারায় একালের বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হলেও তার প্রতি তীব্র অনুরাগ সত্ত্বেও এ সাহিত্যের পট-ভূমিকা ও তত্ত্বের দিকটি নিয়ে সখের আলোচনা কিছুকিছু চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাকার্য বিশেষ হয় নি। সমাজ ও মনোবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ এ কালের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণে কতটা প্রয়োগ করা যায়, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে ব্যক্তি, পরিবেশ ও মানসিকতার-ই বা প্রভাব-প্রতিপত্তি কতটুকু এ-সব বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তখন স্থির হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ ও রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের কোন কোন উৎসাহী অধ্যাপক অধ্যাপিকার উপদেশ নির্দেশ ক্রমে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা পরিষদ' (Institute for the Study of Psycho-Social Bases of the Modern Bengali Literature) নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মাননীয় উপাচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করলেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ রামগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের রীডার শ্রীমতী বেলা দত্তগুপ্তাকে নিয়ে কর্মপরিষদ গঠনের পর পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী এই পরিষদের গবেষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করালেন। তাঁদের উৎসাহের জন্যই কিছুকিছু আর্থিক আনুকূল্য পাওয়া গেল। তাঁরাই উৎসাহিত হয়ে দুটি টেপ-রেকর্ডার সংগ্রহ করে ফেললেন। মোটামুটি ভাবে অনুসন্ধান প্রণালী ও কর্মপন্থা ছকে নিয়ে সাম্প্রতিক যুগের কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং ছান্দসিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের মারফতে তাঁদের সাহিত্য বিষয়ক মতামত নথিভুক্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার শুরু হল। ইতিমধ্যে ছন্দ বিষয়ে যে সমস্ত ছান্দসিকের মতামত গৃহীত হয়েছে, তার পাঠোদ্ধার করে এই গবেষকদের উদ্যোগে পুস্তিকার আকারে প্রকাশের চেষ্টা চলেছে। কিছুকিছু কবি ও সমালোচকের বক্তব্য ও টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখা হয়েছে, আরও কাজ চলেছে। এ-সমস্ত বক্তব্য সংগৃহীত হলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণকপদ্ধতির-সাহায্যে এই বক্তব্যগুলিকে বিশ্লেষণ এবং দফাওয়ারি তালিকায় সজ্জিত করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্-পটে অবস্থিত দেশ-কাল-পাত্রের অন্যোন্য প্রভাব নির্দ্দেশের চেষ্টা করা হবে এবং গবেষণার তথ্য, তত্ত্ব ও ফলাফল ক্রমে ক্রমে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। এর দ্বারা ভবিষ্যতের গবেষকেরা উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

একালের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরও সাহিত্য জিজ্ঞাসা অধিকতর উদ্দীপিত হবে। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য এবং শ্রী যুক্ত শঙ্খ ঘোষ মহাশয়দের যে-সমস্ত বক্তব্য টেপ করা হয়েছে, এখানে সেগুলি মুদ্রিত হল।

এ-বিষয়ে পাঠক-পাঠিকার মনে কোন প্রশ্নের উদয় হলে তাঁরা অনুগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং পরিচালক: আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা পরিষদ]

আপনার মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ?

সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নাটক কিংবা কাব্য কিংবা ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ। এখন কাব্যের উদ্দেশ্য কাব্য হয়ে ওঠা। ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ছোটগল্প হয়ে ওঠা। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। কিন্তু প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলতে পারা যায় যে প্রবন্ধ নানান্ বিষয়ে লেখা যায় এবং কোন কোন বিষয় হয়তো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক। সেক্ষেত্রে সে যদি প্রবন্ধ না হয়ে ওঠে, একটা বিশেষ বক্তব্য হয়ে ওঠে, তা'হলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাহিত্যের যে সব বনেদী শাখা—হাজার হাজার বছর ধরে যার অবস্থান—যেমন নাটক বা কাহিনী তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নাটক হয়ে ওঠা বা কাহিনী হয়ে ওঠা। সেখানে কোন প্রচারের কথা নেই। সেখানে কোন ফললাভের কথা নেই। একটি কাহিনী একজন রচনা করলেন বা শোনালেন, আরেকজন সেটি শুনলেন। এখানে যেজিনিসটি পাওয়া গেল—সেটি হচ্ছে একটি কাহিনী। এখানে আমরা বলব না এর দ্বারা কোন সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। এর যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাহিত্যিক বা Artistic উদ্দেশ্য। এখানে আমরা কোন দার্শনিকতা বা ধর্মীয়তা বা সামাজিকতা প্রত্যাশা করবো না। এখন এই ঐতিহ্য নিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে, বহু দেশে। আজকের দিনেও যেটা সাহিত্যিক উদ্দেশ্য—সেটা

এইরকম থাকবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। একে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক কিংবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার যদি কেউ করেন, তিনি করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মনে রাখতে হবে যে একটা সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির পরে এটা হয়তো বিদ্যমান থাকবে না। যদি থাকে তা'হলে এর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বা ধর্ম নিরপেক্ষ আনন্দ দানের ক্ষমতার জন্যে থাকবে।

এটা স্পষ্ট বলে রাখা দরকার, যে নাটক বা কাহিনী যেটাই হোক না কেন, তার মধ্যে এক প্রকার সত্য বা সৌন্দর্য থাকা চাই, তা নাহ'লে কখনো সাহিত্য কালোত্তীর্ণও হয়না, দেশোত্তীর্ণও হয় না।

সাহিত্য বিশ্বমানবের মনকে কি দিয়েছে এবং দেবে—এই সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন—

সাহিত্য যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন বা একাধিক-জন পাঠককে সামনে রেখেই তা করেন, কাজেই এখানে একজনের মন আরেকজনের মনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। একজনের মন থেকে আরেকজনের মনে একটি বাণী সঞ্চারিত হয়, একটি রূপও সঞ্চারিত হয়। এই রূপ আর এই বাণী সঞ্চারিত না হলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ সৃষ্টি কেবল আপনার জন্য নয়—পরের জন্যও। সেই পর যতই নিকটে আসবেন, ততই স্রষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের কোন শাখা তুলনামূলক ভাবে বেশী ঐশ্বর্যবান ?

কবিতা ছোটগল্প অজস্র লেখা হয়েছে। উপন্যাস অত বেশী না হলেও তার সংখ্যাও বড় কম নয়, নাটকের সংখ্যা কম বলেই ধরে নিতে পারা যায়, অধিকাংশ প্রবন্ধই ঠিক সাহিত্যের এলাকায় পড়ে না। এখন অজস্রত্বই ঐশ্বর্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। সাহিত্যের ভাণ্ডারে যদি স্থায়ী না হয় তা হলে তাকে ঐশ্বর্য বলা মুশকিল।

তা'হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে কোন্ কোন্ লেখা স্থায়ী হবে? এ বিষয়ে আমি কোন সুচিন্তিত মত দিতে পারবো না। তবে আমার মনে হয়—কবিতার ঘরে কিছু স্থায়ী হতে পারে, ছোটগল্পের ঘরে কিছু কম, উপন্যাসের ঘরে আরো কম। নাটক দুখানি, কি একখানি।

এই সময়ে সাহিত্যে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতিফলন কি যথোপযুক্ত?

এ বিষয়ে আমার কিছু বলা ঠিক হবেনা। কারণ আমি খুব কম বই পড়েছি।

প্রতিফলন হয়তো একটা থাকেই, সেটা না থেকে পারে না। কিন্তু যথোপযুক্ত কিনা, তাই বলা কঠিন। একজন বলছে যথোপযুক্ত, আরেকজন হয়তো বলছে নয়। অনেকেই হয়তো বলবেন যে না—ঠিকমত প্রতিফলন হয় নি, তা হলে তো একটা তর্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

এই বাংলাদেশের যে যুদ্ধটা গেল এটার পরে কি আপনার মনে হয়েছে যে সাহিত্যে ঠিক তার প্রতিফলনটা এলো না?

এই কথাটা নিয়েই আমি ঢাকাতেও কিছু বলেছিলুম। কোন বড় ঘটনা নিয়ে কোন একটা বড় উপন্যাস, সেই মুহূর্তেই বা সেই বছরেই বা সেই দশকের মধ্যে লেখা যায় না। সেই জিনিসটা যে কী সেটা জানতেই পঞ্চাশ বছর লেগে যায়। কেননা আমরা খুব খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখতে পাই, পূর্ণ সত্যটা জানতে পাবা বহু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। য়ুরোপে এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর কোন বড় বই লিখতে দেখা গেল না। কতগুলো খণ্ড খণ্ড সত্যকে জুড়ে জুড়ে একটা বই লিখতে

পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু না কিছু বাদ পড়ে যায়, সেজন্য পূর্ণ সত্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের দুর্বলতাগুলো আপনার মতে কি কি?

আমরা বড় বেশী সমসাময়িক হতে চাই। কাজেই আমাদের লেখা অল্প দিনের মধ্যেই বাসি হয়ে যায়। যে উপন্যাসকে একটা স্মরণীয় উপন্যাস বলে পুরস্কার দেওয়া হল, পাঁচবছর বাদে সে উপন্যাসের নাম কারো মনে থাকে না। কোথাও একটা অভাব আছে, তা না হলে এরকম ব্যাপার ঘটত না। সূক্ষ্মতার অভাব। প্রত্যক্ষ একটা ফল চাই, নগদ বিদায় চাই—সেই জন্য মনোরঞ্জন করার দিকে আমাদের নজর বেশী। একটা সত্যকে উপলব্ধি করে সেটাকে প্রকাশ করা অত্যন্ত আয়াস সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই আয়াসটুকুকে স্বীকার করার মতো ইচ্ছা বা অবসর আমাদের অনেকের নেই। আমরা মনে করি বছরে চারখানা উপন্যাস লেখা মানে পুরুষার্থ।

অতিলেখনের কারণ কি?

এটার উত্তরতো সোজা।—অর্থপ্রাপ্তি। যতবেশী লেখা যায়, ততো বেশী পয়সা হয়। পয়সাটার তো দরকার আছে আজকের দিনে। কাজেই লেখা জিনিসটা একটা Industry হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেটা Mechanical হতে বাধ্য। যদি ইতিমধ্যে না হয়ে থাকে তবে কয়েকদিন পরে দেখা যাবে প্রায় Mechanical জিনিস হচ্ছে। অবশ্য কবিতা লিখে পয়সা হয় না। রাশি রাশি কবিতা লেখা হচ্ছে অর্থ প্রাপ্তির আশায় নয়। ওটা একটা নেশা। আগেকার দিনেও ওটা ছিল।

এর ফলে সাহিত্যের বিশুদ্ধতম অংশটি—যা সম্পর্কে আমরা এখনও শ্রদ্ধাবান এবং প্রত্যাশী—তা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন?

দু'চারজন প্রতিভাশালী লেখক হয়তো অজস্র লিখেও অজস্র ঐশ্বর্য দিয়ে যেতে পারেন—যা সাহিত্যে অমর হবে, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের ক্ষতি চিরকাল হয়ে এসেছে, চিরকাল হবে, সেটা দেখে কোন লাভ নেই—বরং দেখতে হবে সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত কী জমেছে? সাহিত্যের দরজা খোলা, সে পথ দিয়ে যে কত লোক ঢুকেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। কালিদাসের যুগেও ছিলো, রবীন্দ্রনাথের যুগেও ছিলো, অনেক অবাঞ্ছিত লোক অনেক অবাঞ্ছিত কথা লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁদের কথা কেউ মনে রাখে না। কালিদাসের কথাই মনে রাখে—রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে রাখে। কাজেই আমরা যদি দু'চারজন প্রতিভাশালী লোকের আবির্ভাব দেখে থাকি, তবে শতাধিক অবাঞ্ছিত লোকের আবির্ভাব সাহিত্যের কী ক্ষতি করবে? আমরা যদি দশ বছরের মধ্যে দশখানা ভালো উপন্যাস রেখে যেতে পারি, তবে বাকি পাঁচশোখানা যদি হারিয়ে যায় তাতে কী ক্ষতি হবে? যেটা স্থায়ী সেটাকে দিয়েই সাহিত্য বিচার হবে। গ্রীক ট্রাজেডি বিস্তর লুপ্ত হয়ে গেছে, সেটা লেখকদের দোষে নয়, পুড়ে গেছে, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে—নানা কারণে। কিন্তু যে কটা আছে তা দিয়ে আমরা গ্রীক সাহিত্যের মূল্যায়ন করে থাকি। সংস্কৃত কাব্যও যত লেখা হয়েছে তত টিঁকে থাকে নি। এটা সাহিত্যিকের দোষে নয়, বিভিন্ন কারণে। কাজেই কী হারিয়ে গেল, লুপ্ত হল তা ভেবে লাভ নেই। কারণ ভালো জিনিসও অনেক হারিয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু থাকে কিনা? যদি কিছু টিঁকে থাকে তবে জানবো সাহিত্যের লাভ হয়েছে। শক্তিমানের শক্তিক্ষয়টা সত্যি দুঃখের বিষয়। সেখানে আমরা বলতে পারি যে লোকটার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারতো কিন্তু অকারণে অনেক সময় নষ্ট করেছে। বিশেষ করে একজন কবির কথা মনে পড়ছে আমার, আমি নাম করবো না। তাঁর কাছে অনেক কিছু আশা করা গিয়েছিল, তিনি অনেক কিছু দিতে পারতেন, রাজনীতি

পেয়ে বসলো তাঁকে, বিস্তর সময় নষ্ট করেছেন, তার ফলে তাঁর কীর্ত্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। একজনের কথা বললুম—এরকম অনেকের কথা বলা যায়। এরকম অর্থলোভেও হচ্ছে, কিন্তু রাজনীতির কারণে আরও বেশী হচ্ছে। অনেক আদর্শবাদী লেখককে আমরা জানি যার কাছ থেকে অনেক পাওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তার আদর্শটি এরকম যে তার পেছনে ঘুরে তিনি অনেক সময় নষ্ট করেছেন। তার বাইরে আমিও যাই না, আমিও তাদের মধ্যে একজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলাফল কি রকম?

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তো ক্রমশই কমে আসছে। যারা আজকাল লেখেন তারা ক'খানাই বা বিদেশী বই পড়েন? পড়লেও তো অনুবাদের মাধ্যমে পড়েন। আগে ঠিক পাশ্চাত্ত্য বলতে বোঝাত পশ্চিম য়ুরোপ। আর এখন যাঁরা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আনতে চান বা আনেন তাঁরা সাধারণতঃ রাশিয়ার দিকে তাকান। সেটা কিন্তু সত্যি-কারের পাশ্চাত্ত্য প্রভাব নয়। সত্যিকারের পাশ্চাত্ত্য বলতে বোঝায় ইংরাজী, ফরাসী, ইটালিয়ন ও জার্মানী। অনেকে রাজনৈতিক কারণে ও মুখো হতে চান না। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ইংরাজীর স্থান দিনে দিনে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। ইংরাজী পড়ে অনেকে বুঝতে পারেন না। যাঁরা ইংরাজী বোঝেন না তাঁরা ফরাসী, জার্মান বা ইটালিয়ান বুঝবেন এটা আশা করা যায় না।

তবে আগের চেয়ে অনেক বেশী লোক বিদেশে যাচ্ছেন। এবং সেই সূত্রে বৈদেশিক ভাবধারা আমাদের সাহিত্যে আসছে। বিদেশ যাত্রা যদি নিষিদ্ধ হয়, যেমন ছিল মধ্যযুগে, তাহলে আবার আমাদের সাহিত্য অচলয়াতনে পরিণত হবে। বই পত্রের আমদানিও কমে আসছে। কারণ দেখানো হয় যে বিদেশী মুদ্রার অভাব। অন্য একটা কারণও থাকতে পারে। সেটা বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়। আমার মতে

সাহিত্য বা দর্শন বা বিজ্ঞান আলো হাওয়ার মতো সর্বত্র সঞ্চারিত হবে। এটাই ঠিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবের জোয়ার এসেছিল বলে কি আপনার মনে হয়?

জোয়ার এসেছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এসেছিলো কিনা আমি জানি না। এই কালটাকে আমি একটা উন্নতির কাল বলে আমি মনে করি না। উন্নতির কাল ছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের পর বছর বিশেক সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালটা কিছু দিয়েছে, একেবারে যে দেয় নি তা নয়, তবে আগেকার মত নয়।

এই যুগে বাংলা সাহিত্য কি এমন কিছু দিয়েছে যাতে বিশ্বসাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে?

চট্ করে কিছু বলা যায় না।

বিশেষ করে গত দশ বছর বা বিশ বছরের মধ্যে যে কাজ হয়েছে তার মূল্যায়ন করার সময় এখনও হয় নি। ত্রিশ বছর আগে কী হয়েছে তার একটা মূল্যায়ন করা যায়।

তবে 'জীবনানন্দ' সম্পর্কে অনায়াসেই বলতে পারা যায়—যে হ্যাঁ তিনি কিছু দিয়ে গেছেন যা অনায়াসেই স্থায়ী হবে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরীকে'ও কালোত্তীর্ণ বলা যায়। কিন্তু আমার জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অন্যের লেখা পড়তে সময় পাই খুব কম।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা ২

অরুণ ভট্টাচার্য

আপনার মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি

সাহিত্যের উদ্দেশ্য এক কথায় বলা মুসকিল। তবে প্রত্যেক মানুষই তাঁর জীবনে কোন না কোন সময় একটা আধ্যাত্মিক চেতনার আস্বাদ উপলব্ধি করতে চায়। এই আধ্যাত্মিক শব্দটি অবশ্য আমি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি না, যে অর্থে মানুষ নিজেকে 'সাবলিমিটি'র দিকে পৌঁছে দিতে চায় সেই অর্থে ব্যবহার করছি। সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বোধ হয় মানুষকে ঐ আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণ করতে সাহায্য করায়, আমার মনে হয় এটি তার প্রধানতম কারণ হওয়া উচিত। এর থেকেই অবশ্য অন্যান্য প্রশ্নগুলি আসে, রসতত্ত্বের কথা সৌন্দর্য-বোধের কথা এগুলো আস্তে আস্তে এই বোধটি থেকেই এসে পড়ে। অনেকটা ইংরাজীতে যাকে বলে 'মিস্‌টিসিজম্'। আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 'মিস্টিক' হতে বাধ্য এবং সেখানেই তার চিরকালীনতার ব্যাপারটা লুকিয়ে থাকে।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সাহিত্য ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার ওপর বাইরের কোন প্রভাব আসতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে সাহিত্য রচনা করতে বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মত কি ?

এ ব্যাপারটা, এর সমস্তটাই এর interpretation এর ওপর নির্ভর করছে। আমি যে কথাটা বলেছি, তার যুক্তি হিসাবে আমার দু'জন প্রিয় লেখকের নাম আমি করতে পারি যাঁদের লেখা আপনাদের বিচারে হয়তো ব্যক্তিগত বলে মনে হতে পারে কিন্তু চিরকালের লেখায় উত্তীর্ণ

হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও উইলিয়ম ব্লেক। আমি নিজে ব্লেকের খুব ভক্ত, রবীন্দ্রনাথের তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমরা বর্তমান জীবনকে কল্পনাও করতে পারি না। তাঁদের যে লেখা আমাকে মুগ্ধ করে, যেমন ব্লেকের "সংস অফ ইনোসেন্স এণ্ড এক্সপিরিয়েন্স" অথবা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'। এগুলো কি বাইরের কোন আঘাত থেকে আপাতদৃষ্টিতে এসেছে? নিশ্চয় একটি মানব যখন জীবন যাপন করে তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের আঘাত লাগে। সমাজের ভালো দিক মন্দ দিক সমস্তটাই তার জীবনের ওপর পড়ে। এ ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। সে অর্থে ব্যক্তি মানুষ বলে কিছু নেই। কাজেই যখন সে কোন কিছু রচনা করবে স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে সমাজের ছবি আসবে--এটা একটা সোজা সরল সত্য। এটা মেনে নেওয়া ভালো। 'গীতাঞ্জলি' পড়তে পড়তে অবশ্য মনে হয় কবি ভিতরের কথা উন্মোচন করছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে লোকটি রচনা করছেন সে লোকটি ব্যক্তিগত সমস্ত দিকের দরজা জানলা বন্ধ করে নিজের ঘরের মধ্যে বসে লিখছেন, তা কখনই নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সবই ছিল। সব নিয়েই তিনি পূর্ণ মানব, সুতরাং তাঁর রচনায় এ সব কি করে বাদ পড়ে? কাজেই কোথাও সমাজচিত্রটা সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করেছে, কোথাও প্রকট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ চিন্তার বাইরে যেমন কোন মানুষ চিন্তা করতে পারে না, তেমনি তার যে ব্যক্তিগত দিক আছে তাও ঠিক। এ দুটির মিলনেই প্রকৃত সৃষ্টি সম্ভব, সুতরাং 'গীতাঞ্জলি'র মত লেখা বা 'সংস অফ ইনোসেন্স এণ্ড এক্সপিরিয়েন্সে' এর মত লেখা এ যুগেও সম্ভব। কেননা যে মানবেরা এ-কাব্য দুটি লিখেছিলেন তখনকার চিন্তাধারার প্রতিফলন আজকের দিনে মানবিক জীবনেও রয়েছে। তখনকার সমস্যাবলীও রয়েছে। তখনকার আধ্যাত্মিক চেতনা বা মিস্টিক ভাবধারা রয়েছে। কাজেই আগামী কালে যতই আমরা সভ্য ও সংস্কৃতিবান লোক হই আগামী কালেও যে এই ধরণের রচনা হবে

না এমন কথা বলি কি করে ? আজকের অবশ্য এ প্রশ্নটা আপনার খুবই সংগত যে আমরা যা কিছু করি, যা কিছু লিখি তাতে বাইরের আঘাত, বাইরের সংঘাত প্রতিনিয়ত আমাদের পীড়িত করে এবং তার প্রতিফলন আমরা দেখতে চাই লেখার মধ্য দিয়ে কর্মের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, কিন্তু এমনও হতে পারে যে একজন লেখককে কোন আঘাতই পীড়িত করতে পারল না। এমন কি সম্ভব নয় ? এবং যেটা আপন জগৎকে বেছে নিল, অর্থাৎ সাহিত্যে সমাজের দর্পণটাই বড় কথা, না সাহিত্যে আনন্দবোধের কথাটাই বড় কথা— এই একটা মৌল বিষয় এসে পড়েছে। আমার তো তাই মনে হয়। এখানে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে একটা প্রশ্ন এসে পড়েছে। প্রশ্নটা এই যে, সমাজে আমরা ভালো কিছু করতে চাই, এজন্যই কি সাহিত্য ? যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বার বার আমাদের বলেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে—সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি মানুষকে জানতে হবে, কাজ করতে হবে মানুষকে সেই ভাবে। তাঁর চরিত্র এই ধরনের সিম্বলিক প্যাটার্ণের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তা দেখি না। এমনকি শরৎচন্দ্রের ভালো লেখায়ও তা দেখি না। ব্লেকের কথাতো আসছেই না। আরো একজন বড় লেখকের কথা বলছি, যিনি সর্বদেশে সর্বকালে শ্রেষ্ঠ লেখক—উইলিয়ম সেক্সপীয়র, তাঁর চরিত্রগুলো আজ থেকে ৪০০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। এখনো কি আমাদের কাছে অত্যন্ত আধুনিক মনে হয় না ? হ্যামলেটের বা ওথেলোর চরিত্র—আজও মানুষ অবাক বিস্ময়ে সেই সব নাটক দেখে। এর পিছনে যদি তৎকালীন সামাজিক চিন্তাই এক মাত্র কাজ করত তাহলে ৪০০ বছর পরেও তাদের নিয়ে আমরা এত আনন্দ পেতাম না, এত বেদনাও অনুভব করতাম না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের কোন শাখা তুলনামূলক ভাবে বেশী ঐশ্বর্য্যবান ?

আপনার এই প্রশ্নটি অত্যন্ত দুরূহ, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া বড় মুসকিল। আমি নিজে কবিতা লিখে থাকি। কবিতার ওপর আমার একটা সহজাত প্রবণতা ও টান আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে কবিতা যেমন উন্নত স্তরে গিয়েছে, ছোট গল্পের দিক থেকে বাংলা সাহিত্য ততটাই উন্নত স্তরে গিয়েছে, কিছু কম যায় নি। কারণ বাংলা ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে শুরু হয়েছিল। সে ছোট গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অসাধারণ গতিতে এগিয়েছে। বিভিন্ন দিকে তার বিভিন্ন মোড়, বিভিন্ন টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোট গল্প আজকের দিনে বিশ্ব সাহিত্যের পর্য্যায়ে নিশ্চয়ই পড়ে, এ হচ্ছে আমার সরল স্বীকারোক্তি। কিন্তু কবিতাও পিছিয়ে পড়ে নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কবিতার মোড় ফিরিয়েছিলেন, জীবদ্দশাতেই ৩০-এর যুগে। এমন কি আর একটু আগে বলা যায়, বলাকার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার পরিবর্তনের একটা দিক সূচনা করে যান নিজের হাতে। ক্রমশ আমরা মুক্তছন্দ বলাকা থেকে, গদ্যছন্দ লিপিকাকে পেলাম। লিপিকাতে তিনি যে পথ দেখালেন সেই পথ আমরা আজও পরিত্যাগ করতে পারি নি। বরং তাকে প্রবল ভাবে আঁকড়ে ধরেছি আমরা। বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ দেখে গিয়েছেন এবং সেই পটভূমিকায় তাঁর বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়েছে শেষের দিকে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি যে প্রশ্নটা করছেন সেটা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের প্রথম সারিতেই রয়েছেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিগণ। এঁদের পরিমণ্ডলটা কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। কারণ একটা জিনিস আমি মনে করি, মানুষ বারবার তার শৈশবে ফিরে যেতে চায়। এই শৈশবের প্রতি তার এত দুর্ণিবার আকর্ষণ কেন? এত দুর্ণিবার এইজন্য শৈশবকালের যে সমস্ত স্মৃতি তার থাকে, তার রোমন্থন করেই সমস্ত জীবনটা কাটে। ঠিক সেই-

ভাবে প্রত্যেক কবি তাঁর বোধ হয় শৈশবেই তৈরী হয়ে যান। তাই এই সমস্ত কবি যাঁদের রবীন্দ্র পরবর্ত্তী বলছি, তাঁদের মানসিক গঠন শৈশবেই হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁদের শৈশব যৌবন কেটেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর। তাদের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কবি বলেই আমরা ধরতে পারি। প্রকৃত ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবও তাদের ওপর পড়েছে। বিষ্ণু দের ওপরে নিশ্চয়ই পড়েছে, সুধীন্দ্র দত্তের 'সংবর্ত' কবিতায়তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এরা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবি বলতে আমরা মনে করছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাদের মানসিক গঠন তৈরী হয়েছে এবং আমি নিজেও সে সময়ের অংশীদার বলে নিজেকে মনে করি। আমারই অগ্রজ কবি বিশেষ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার সরকার এবং আমার সমবয়সী কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, আমার পরবর্ত্তী কালের কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার এঁদের কবিতা…যাঁদের কবিতা আমার ভালো লাগে, পড়ি, অনেক সময়ে অনুপ্রাণিত হই।

মঙ্গলাচরণ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়, তাঁর কবিতার কথা, এক সময়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—তখন আমার যৌবন কাল। সেই যৌবন কালেই তিনি অসাধারণ কবিতা সৃষ্টি করেছেন, দুঃখের বিষয় এখন সেরকম লিখতে পারছেন না। কিন্তু যে সৃষ্টি তিনি করে গিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে, সেই কবিতাগুলো ভীষণ ভাবে আমার মনকে টানে। এবং আমার মনে হয় আজকের দিনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কবিতা আমরা যে অনুবাদের মাধ্যমে পড়ি, সেদিক থেকে বাংলা কবিতা, আমাদের প্রবীণদের বাদ দিলেও, আমাদের সমকালীন এখন যারা লিখেছেন—তাঁরা পৃথিবীর যে কোন দেশের কবিদের সমগোত্রীয় কবি—এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বে জার্মানী থেকে একটা সংকলন গ্রন্থ বেরোয়, সৌভাগ্য-ক্রমে আমার কিছু কবিতা তার মধ্যে ছিলো, এবং তাদের ভারতীয়

সংকলন একটি বেরোয়। আমি তাতে দেখেছি যে কি ভীষণ ভাবে সেগুলো তাদের মনে রেখাপাত করেছে। আমি চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানতে পারি। সেখানকার লোক্যাল এডিটর আমাকে জানান যে, আমাদের কবিতা জার্মান মানসে কি অসাধারণ রেখাপাত করেছে! তাঁর কাছেই আমি শুনি যে আমাদের বহু কবিতা তরুণ জার্মান কবিরা তাঁদের ছোট ছোট সাহিত্যিক আড্ডায় পাঠ করেছে, আনন্দ পেয়েছে—বইটার নাম কল্লোল (একটি বাংলা নাম)। কিন্তু জার্মানীতে সংকলন গ্রন্থটি বার করেছিলেন—ভারতীয় কবিতার অনুবাদ। সেই অনুবাদে সুধীন্দ্র দত্ত, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কবিতাও যেমনি ছিল, আমারও বেশ কিছু কবিতা ছিল। আমাদের পরবর্তীদের মধ্যে আলোকরঞ্জনের কবিতা ছিল। কবিতাগুলোর জার্মান মানসে সমাদর পাবার মূল কারণ হচ্ছে যে জার্মান মানসিকতা ও আমাদের মানসিকতায় দর্শনের দিক থেকে অনেকটা মিল আছে; যে কারণে জার্মানরা বরাবরই ভারতীয় ধ্যানধারণার এত পক্ষপাতী তাঁরা এত আগ্রহে ভারতীয় সমস্ত জিনিসকে টেনে নেয়। আমি অবাক হলাম সম্পাদকের একটা চিঠি পড়ে, যখন আমাকে লিখলেন যে আমার 'ঘর' কবিতাটি একটি ছোট সাহিত্যিক আড্ডায় তারা পাঠ করেছিলেন। এবং প্রায় আধ-ঘণ্টা আমার কবিতাটি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন। এটাকে যে কোনো পুরস্কার পাবার চেয়ে আমি সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি। এটা আমার কবিতা বলে আমি বলছি না—একথা বলছি যে আমার কবিতাটি যদি সেই ভারতীয় কবিতার পটভূমি থেকেই রচিত হয়ে থাকে তাহলে ভারতীয় মানসের প্রতি তাদের যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা রয়েছে তার একটা প্রমাণ এখানে থাকছে। আমাদের যে অন্তরের প্রেরণা তাঁরা নিজেদের মতো করে বুঝতে পেরেছেন—আমাদের আজকের দিনের কাব্য সেটা যে দেশের গণ্ডীর বাইরে এভাবে সমাদৃত হচ্ছে এবং সম্প্রতি আমেরিকাতেও আমাদের

অনেকের কবিতা কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে—এর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারছি যে জার্মান মানসিকতা এবং আমেরিকান মানসিকতা—নানারকম পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় মানসিকতাকে গ্রহণ করেছে. নিজের মতো করে নিয়েছে।

হয়তো এটা ঠিক যে আমরা জীবনানন্দের সমগোত্রীয় কবি নই, সে-রকম ঐশ্বর্য আমাদের কাব্যের মধ্যে এখনো দেখা দেয় নি—কিন্তু আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যে কবিতা আমরা লিখছি, তার যে কোন সংকলন পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় তো বটেই।

যেমন হাল আমলের ইংরাজী কবিতা—আমি যতদূর জানি, ডিলান টমাসই ওদের শেষ বড় কবি, তারপরে যে সমস্ত কবিতা লেখা হচ্ছে তাদের থেকে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক তরুণ কবি ভালো কবিতা লেখেন। এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয়, এ বিষয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকবার কথা তো নয়ই, আমরা অনেক দেশের কবিদের থেকেই এগিয়ে গেছি।

আমাদের আরেকটা বড় কবিতার মোড় ফিরেছে— যখানে আমি . নিজেকে একটা বড় অংশীদার মনে করে, মনে গর্ব অনুভব করি।—যুদ্ধোত্তর কালীন কবিতার মধ্যে একটা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তার বহু বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু আজ প্রায় দশবছর ধরে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে একটি নতুন জায়গায় পৌছুবার চেষ্টা সব কবি করছেন। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা কবিতার কয়েকটা লাইন আমি এখানে পড়ে শোনাচ্ছি –

আমাদের কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত
যেন আমি হেটে যাই।

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আমার কাজ)

এই কবিতাটির মধ্যে কাব্য-সৌন্দর্য যদি খুঁজতে চাই খুব বেশী খুঁজে পাবো না। তবে একটা সরলতার সৌন্দর্য আছে। সরলতার সৌন্দর্য, যেমন আমরা চণ্ডীদাসের কাব্যেপাই—আমি অবশ্য তুলনা করছি না, শুধু বলছি সরলতার যে সৌন্দর্য আছে সুভাষ সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এরকম আরেকটা কবিতার দুটো লাইন পড়ছি -

আমি তোদের বুকের মধ্যে জেগে উঠতে চাই
তোদের দুখের কথা শুনতে নয়।

আমি এ প্রসঙ্গেই আমারও একটি কবিতার কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি, অধ্যাপক অমলেন্দু বসু উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং একটি ইংরেজী সংকলনেও তিনি সেটি অনুবাদ করে দিয়েছেন -

কিছু কিছু শব্দ হাসতে জানে হাসায়
কিছু কিছু শব্দ কাঁদতে জানে কাঁদায়
কিছু কিছু শব্দ অলীক ভালোবাসায়
হঠাৎ জেগে ওঠে। (অরুণ ভট্টাচার্য, 'শব্দগুলি ইচ্ছেমত ')

এই তিনটি কবিতাই অত্যন্ত সহজ কবিতা, এরমধ্যে না বোঝার কোন কারণ নেই এবং আমার মনে হয় ক্লাশ টেনের একটি ছেলেও এই তিনটি কবিতার অর্থ সহজ ভাবে করে দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে পেরেছি যে কবিতা আবার সহজতার দিকে যাচ্ছে। সরলতার দিকে যাচ্ছে। জানি না আবার একটা দিন আসবে হয়তো আবার কবিতার দিক ফিববে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তরুণ কবিরা এই রাস্তা বেছে নিয়েছেন, আমার মনে হয় এর থেকেই আমরা মিস্টিক রহস্যময় সুন্দর কবিতার দিকে পেঁছুতে পারবো, যেখানে সরলতার মধ্যে গভীরতার স্পর্শ পাওয়া যাবে।

এ কালের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলাফল কি রকম?

কবিতায় আমার মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট, পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব

আমরা যাদের ক্ষেত্রে বলি সেই সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র—আপনারা জানেন প্রত্যেকে প্রায় -কিছু না কিছু পশ্চিমী কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, এবং অনেকের মধ্যে এসব প্রভাব এত সুস্পষ্ট ছিল যে অনেক সময় আমাদের মনে হত যেন অনুবাদ পড়ছি। আমি সে সব কবিদের নিন্দাবাদ করছি না কিন্তু প্রভাব আপনা থেকেই এসে পড়েছে। ধরুন বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিয়টের প্রভাব, সুধীন দত্তের কবিতায় মালার্মের প্রভাব, জীবনানন্দের কবিতায় ইয়েট্‌সের প্রভ ব, বুদ্ধদেবের কবিতায় বোদলেয়ারের বা রিল্‌কের প্রভাব এসে পড়েছে। কিন্তু আমাদের আনন্দের কথা এই যে সেই প্রভাবের শুরু এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরগুলো তাঁদের উপর দিয়ে গেছে, আমাদের সমবয়সী কবিরা হয়তো দু একজন জীবনানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন, কিন্তু তিরিশের কবিদের মতপশ্চিমীকবিদের দ্বারাপ্রভাবান্বিত হন্‌ নি। এঁরা প্রথম থেকেই সচেষ্ট ভাবে সক্রিয় ভাবে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে চেয়েছেন। আমি যে তিনটি উদ্ধৃতি দিলাম তা থেকে মনে হয় আপনি বুঝতেপারবেন। আমি এখানে আরো তিনটি কবিতা তুলে ধরছি, যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা আমার নিজের মনে হয়েছে যে বাংলা কাব্যক্ষেত্র থেকে যদি একশ'টি কবিতা বেছে নেয়া যায় তবে তার মধ্যে এই কবিতাটি থাকবে। আমি যে তিনটি কবিতা পড়ব, সেই তিনটি কবিতাই এরকম অ-সাধারণ কবিতা, অবশ্য একটি কবিতা আমার নিজের, কাজেই সংকোচের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। জানি না তার স্থান কোথায়, কিন্তু বাকি দুটির স্থান সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

প্রথম কবিতাটি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—

> **ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে**
> **একে একে তার রূপের অলঙ্কার**
> **খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে**

তিন ভুবনকে ঢেকে
সে সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ যায়
স্বর্গমর্ত্য পাতাল নিরুদ্দেশে,
দেখি আর ঘুম পায়।

অরুণকুমার সরকারের একটি প্রেমের কবিতা। আমরা সবাই জানি যে প্রেমের কবিতায় অরুণকুমারের হাত অসাধারণ দক্ষ। কবিতাটি আমার ভীষণ প্রিয় কবিতা, প্রেমের কবিতা মানুষ যতদিন পছন্দ করবে আমার মনে হয় এই কবিতাটি তাদের ততদিন ভালো লাগবে।

ও প্রেমিক, তুমি কোথায় যাচ্ছ, শোনো,
অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখব বলে।
দ্যাখো কত ভীড় জমেছে পথের পাশে, বারান্দায়,
মধ্যিখানে আমিও আছি, আমাকে দেখবে না?
দ্যাখো আমায়, দ্যাখো, প্রেমিক কাতর আমার মুখ
একতরফা ভালোবাসায় মন যে ভরে না
এই যে আমি, আমায় দ্যাখো।

ওদের হাতে মালা, প্রেমিক, আমার শূন্য হাত,
ওরা রঙের ঢেউ তুলেছে, আমি ছিন্নবাস।
কিন্তু ওরা ভিড়ের, ওরা তোমার কেউ না।
আমি তোমার, তোমার শুধু, আমি তোমার।
আমি তোমায় ভালোবাসি, প্রেমিক, আমায় দ্যাখো।
হৃদয় জুড়ে গন্ধ আমার, পূর্ণ আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ।
ওদের শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।
এই যে আমি রুদ্ধ জোয়ার, প্রেমিক আমায় নাও।

তৃতীয় কবিতাটি আমার নিজের; এটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি অনেক প্রশংসাসূচক চিঠি পেয়েছি, সেই ভরসাতেই কবিতাটি আমি পড়ছি।

বাঁশি বাজলে যেতে হয়।

যতদূর দেখা যায়
সামনে কিছু নেই, শুধু
দীঘিকালো অন্ধকার।
অতীতে তাকালে কিছু ক্ষতচিহ্ন।

তাহাকে পাবার নেই, তাহাকে দেবার কিছু নেই।

চারিদিকে শূন্যতার মাঝে
থেকে থেকে ট্রেনের সুতীক্ষ্ণ স্বর কানে বাজে :
বাঁশি বাজলে চলে যেতে হয়।

এ তিনটি কবিতা থেকেই আপনি আবার বুঝবেন যে কোন পশ্চিমী কবির, এমন কি আমাদের দেশের কোন কবিরও প্রভাব নেই। তিন জন কবি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের সাহসিকতায় নিজের কাব্য চেতনার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। এবং এই সাহসটি আমরা গর্ব করেই বলতে পারি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আমরা বাংলা কবিতায় একটা দিক পেয়েছি, সরলতার মধ্য দিয়ে গভীরতার সন্ধান। কিন্তু কতটা পেরেছি জানি না কিন্তু প্রচেষ্টাটি চলেছে যে সরলতার মধ্য দিয়ে গভীর ব্যঞ্জনীয় পৌঁছানো এবং নিজের পায়ে দাঁড়ান। এই দুটি দিক মনে হয় আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও কয়েকজনের নাম করতে পারি, কমল কুমার মজুমদার, অমিয় ভূষণ মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, আরো পরবর্তী কালে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এদের কথা আমি বিশেষ করে বলছি এইজন্য যে গল্পকে আজ এরা আন্তর্জাতিক একটা স্তরে পৌঁছে নিয়ে গেছেন।

উপন্যাসে কে কতটা দক্ষ এক কথায় আমার বলা মুসকিল কিন্তু

গল্পে এঁরা যে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এইজন্য আমি গল্প ও কবিতা এই দুটো শাখাতেই আমি গর্ব অনুভব করি, বাংলা ভাষার বর্তমান প্রেক্ষিতে।

বর্তমান (গত ১০।১৫ বছরের) দুর্বলতাগুলি আপনার মতে কী ?

এ প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া বড় মুশকিল। তার কারণ দুর্বলতা তাদের মধ্যেই আছে যারা কিছুটা অক্ষম লেখক। যারা প্রকৃত শক্তিশালী লেখক যেমন একজনের কথা বলি, সতীনাথ ভাদুড়ী, যাঁর প্রথম বইটি আমাদের বিস্ময় জাগায় চমকজাগায়, সেই রকম লেখকদের বই আমরা যদি ধরি তাহলে দুর্বলতা খুবই কম পাব। বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা যদি ধরি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা যদি ধরি, এদের দুর্বলতার কথা খুঁজতে গেলে সারা দিন-রজনী কেটে যাবে। কিন্তু দুর্বলতার প্রশ্নগুলো আসে অপেক্ষাকৃত অক্ষম লেখকদের কাছ থেকে। অথচ যারা জনপ্রিয়। এইরকম জনপ্রিয় অথচ অক্ষম লেখক তাঁদের দুর্বলতা অনেক। যেমন ভাষার শৈথিল্য দেখেছি বহু উপন্যাসে, এমনকি আমি এখানে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিকের কথা বলছি, যিনি কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়ে গেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমি মস্ত ভক্ততো বটেই এবং তাঁর প্রায় সমস্ত বইগুলোই আমি পড়েছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তিনি চিরকালের সাহিত্যের আসরে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু তিনি একটি দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন, তা ভাষার শৈথিল্য। তিনি ইচ্ছে করলেই তাঁর বড় বড় উপন্যাসগুলিকে আরো ছোটো করতে পারতেন, তাঁর ভাষা যদিও অত্যন্ত সহজ কিন্তু সেই সহজ ভাষা অনেক সময় জড়িয়ে গিয়েছে। এবং আমার মনে হয় সেই সমস্ত লেখকদের মধ্যেই এই ভাষার শৈথিল্যটা এসেছে যারা ভাষার দিকে নজর দেন নি। বিষয় বস্তুর উপরে বা ভাবের গভীরতার উপরেই সব সময়ই জোর দিয়েছেন।

আসলে এই তিনটি বিষয়ের দিকে একই সঙ্গে জোর দিতে হবে. যে জন্যে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এ ত্রুটি পাই না, বিভূতিভূষণেও পাই না। যদিও অনেক পাঠকের কাছে, যেমন বিভূতিভূষণের নামে শুনেছি, আরণ্যক 'বোরিং' লাগে—আমার 'বোরিং' লাগে না। তার কারণ আরণ্যকের মত বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি তো বোধ হয় এক নিঃশ্বাসেই পড়ে গিয়েছি। তার কারণ সেই পটভূমিকা ধরতে পেরেছি। এই পটভূমিকে ধরতে না পারলে এটা ঠিক যে আরণ্যকের মধ্যে বহু জিনিষ রেপিটিশান হয়েছে, রিপিটেশান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে একটা সব সময়েই ফিরে যাওয়ার থাকে home coming, যাকে অর্থাৎ বলে home coming এর ব্যাপারটা সব সময়ই আরণ্যকে ছিল। বড় বড় সাহিত্যের তা একটা বড় লক্ষণ। এই home coming আমি গ্রীক মিথলজির কথায় বলছি না ; এই home coming টা হচ্ছে একটা central point, লেখকের একটা বিশেষ ঘর—যেই ঘর নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন এবং বার বার সেই ঘরে তিনি ফিরে আসেন। এটা একটা মস্ত জিনিষ। এই শক্তিটা যার আছে তাঁর লেখায় কখনও শৈথিল্য বা অবসাদ জাগতে দেয় না। তারাশঙ্কর বাবু নিজেকে ছড়িয়ে ফেলেছেন। গোটাতে জানেন না। এই গোটাতে জানেন না বলেই তাঁর অনেক সময় বড় বড় উপন্যাসগুলোয় ভাষার দিক থেকে একটা শৈথিল্য এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইদানীং কালের একজন লেখককে যদি আমরা ধরি, বিমল কর—বিমল করের লেখায় ভাষার শৈথিল্য কখনও পাওয়া যাবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে (তাঁর প্রথম দিনকার লেখা থেকে আমি তার সঙ্গে জড়িত) আমি জানি তার অভ্যেস একটি লেখাকে পাঁচবার ছ'বার কাটাকুটি করবার পরে সে লেখাটিকে দাঁড় করায়। এখন সে পরিণত লেখক—তৎসত্ত্বেও মনঃপূত না হলে সে পুরো চ্যাপ্টার কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে এও আমি জানি। এই যে পরিশ্রম, এই পরিশ্রমটি প্রত্যেক শিল্পীর

দরকার। আমি একজন শিল্পীর কথা বলছি তিনি বাংলা দেশের প্রখ্যাত শিল্পী—আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন—গোপাল ঘোষ। আমি জানি তাঁর কত ছবি দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন। হাজার হাজার ছবি তিনি এঁকেছেন, ঠিক ততগুলিই তিনি নষ্ট করেছেন। এই যে নিজের প্রতি নিজেব নিষ্করুণতা, নির্মম ভাব এইটি প্রত্যেক শিল্পীর দরকার। এইটি যাদের নেই তাদের নিশ্চয়ই দুর্বলতা আছে। এইটি যাদের আছে তাদের লেখায় দুর্বলতা আসে না। আজকালকার দিনে অনেক জনপ্রিয় লেখক হয়েছেন তাঁদের নাম আমি করতে চাই না, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু তাঁদের লেখায় শৈথিল্যের কারণ তাঁদের পাবলিশারদের কাছ থেকে অনবরত তাগাদা আসে, অনবরত তাঁদের লিখতে হয়—এটা একটা কারণ।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ তাদের নিজেদের কাছে নিজেদের যে 'অনেষ্টি' অর্থাৎ আমি যা লিখব তার প্রতিটি শব্দ যেন পাঠক ভুল করে এড়িয়ে যেতে না পারেন—তা থাকা দরকার এই জন্য কবিরা অনেক বেশি ভালো গদ্য লেখেন বলে. আমার ধারণা। কারণ প্রত্যেক কবি তাঁর প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে সচেতন। প্রত্যেক সৎ গল্প লেখক তাঁর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য সম্বন্ধে সচেতন। এই ভাষার দুর্বলতাই একটা মস্ত বড় দুর্বলতা।

এ ছাড়া আর একটা দুর্বলতার দিক দেখা যাচ্ছে, সেটা আঙ্গিক-সর্বস্বতা। আমি অনেক গল্প পড়েছি যেখানে দেখা যায় যে কিছুই আমার মনের মধ্যে reac· করল না; এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেছি যে কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে দিয়ে অতিরিক্ত আঙ্গিক সর্বস্বতার জন্য লেখাটি আমার মনের মধ্যে r‹ act করল না। আপনি বলতে পারেন যে আপনার মন সেভাবে তৈরী নয়। হতে পারে। হয়ত আরো আধুনিক যুগের লেখকের মন সেভাবে তৈরী হয়েছে। তাঁরা সেই আঙ্গিককে ধরতে পেরেছেন, আমি ধরতে পারি নি। কিন্তু এটাও ঠিক যে এতগুলি লেখা পড়ে একজনের লেখাও তো আমার ভালো

লাগবে অন্তত:। কিন্তু তাও লাগছে না। এঁদের লেখা শুধু আঙ্গিক সর্বস্ব, যেমন কবিতার ক্ষেত্রে একদা কামিংস খুব হৈ-চৈ ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই কামিংসের কথা আমরা কেউ উচ্চারণ করি না। আমরা ঘুরে ফিরে আবার সেই ব্লেকের কাছে যাই বা কীট্‌সের কাছে যাই। এমন কি চসারের কাছেও যাই।

একদা আমার মনে আছে আমার শ্রদ্ধের শিক্ষক অমিয় চক্রবর্তী কামিংসের অনুকরণে কিছু কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু সেই কবিতাগুলি আমরা আর পড়ি না। বরঞ্চ তাঁর সেই 'বৃষ্টি' কবিতাটি আমার এখনও মুখস্থ আছে। 'বৃষ্টি' কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীর নিজস্ব কবিতা, তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু কামিংসের অনুকরণে যে কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন তাতে তিনি কোন সাড়া পান নি পাঠকের কাছে। এমন কি কামিংস-এর নামও আজ আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

কাজেই এ দুই দুর্বলতার কথা আমি বলতে পারি। একটি হচ্ছে ভাষার শৈথিল্য, অন্যটি আঙ্গিক সর্বস্বতা। এবং আবার বলছি কোন সৎ লেখকের মধ্যে এই দুর্বলতা আমি দেখি নি।

আমি দেখেছি মোটামুটি অক্ষম অথচ জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে। এই একটি শ্রেণী হয়েছে। যেমন সমস্ত শিল্পী সব দেশেই সবকালে হয়ে থাকে। বেশ কিছু জনপ্রিয় শিল্পী লেখক কবি থাকেন তাঁরা আদতে অক্ষম কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তৎকালীন একটা সমাজের ব্যাপার নিয়ে নাড়া-চাড়া করেন বলেই তাঁরা জনপ্রিয় হন। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তা বেশিদিন টেঁকে না। যেমন সাহিত্যে টেঁকেনি, শিল্পে টেঁকে নি। তাঁদের লেখা অনেক সময় তাদের জীবদ্দশাতেই লোকে ভুলে যায় এবং পরবর্তী কালে তা ভুলে যায়ই। কাজেই প্রকৃত সৎ লেখক প্রকৃত সৎ কবি প্রকৃত সৎ গল্পকার নিশ্চয়ই এই দুটো দুর্বলতার থেকে মুক্ত বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যের কোন কোন সৃষ্টিগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের বিচারে প্রথম শ্রেণীতে আসতে পারে?

সময়ের কালটা যদি আমি চল্লিশ বছর ধরি, যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল ধরেন, তাহলে তিরিশ বছর ঠিক আমি মনে করতে পারছি না মানিকবাবুর "পুতুল নাচের ইতিকথা" কবে বেরিয়েছিল বা বিভূতি ভূষণের "পথের পাঁচালী" কবে বেরিয়েছিল -- এ দুটো গ্রন্থ যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বেরিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই যে কোন দেশের যে কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গে এ দুটি গ্রন্থ অন্ততঃ তুলনীয়। আর তারপর আমাদের সমকালীন কবি বা সাহিত্যকদের বেশ কিছু রচনা—গল্পই হোক কবিতাই হোক—তুলনীয়। আমি মানিক বন্দোপাধায়ের কথা বলেছি, আমি বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের কথা বলেছি এবং পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে আমি ছোট গল্পের দিক থেকে বিশেষ করে এক জনের নাম আমার আগেই বলা উচিত ছিল বলতে ভুলে গিয়েছি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উনি এককালে অসাধারণ ছোট গল্প লিখতেন এবং বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে নতুন যে মনস্তত্ত্বের দিক, সেই দিক থেকে বিমল কর পরবর্তীকালে অনেক প্রকৃত ভালো গল্প লিখেছেন— তার প্রথম পথিকৃৎ কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

আমার মনে আছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অসমতল' বইটি পড়ে আমি এবং বিমল কর সেই লেখককে খুঁজে বার করবার জন্য সমস্ত দুপুর একদিন হাঁটাহাঁটি করেছিলাম কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়। সেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিশ্চয়ই অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক কিন্তু তিনি বহু লেখার ফলে — নানা কারণে তাঁকে বহু লিখতে হয়েছে বলে তাঁর লেখার ধার ইদানীং কমে এসেছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে যদি বিচার করি যেমন 'রস' (চতুরঙ্গ পত্রিকায় বেরিয়েছিল), আমি জানি না পৃথিবীর অন্য কোন্ দেশে কোন্ সাহিত্যে রসের মতো কতগুলি গল্প আরও বেরিয়েছে।

ঠিক এইভাবে আমার মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কয়েকটি গল্প 'শালিক কি চড়ুই' (চতুরঙ্গে বেরিয়েছিল) অমিয়ভূষণের অসাধারণ উপন্যাস 'নয়নতারা' (এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম) আমার মনে

হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঠামোতে এতো সুন্দর উপন্যাস আর কেউ লিখতে পারেন নি। তেমনি একটি অসাধারণ সার্থক সৃষ্টি কমল কুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা'। এই সমস্ত কথাই আমি বলছি বিশ্বসাহিত্যের পটভূমি মনে রখে এবং বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত ভেবে। কবিদের কথা বলা আমার পক্ষে একটু মুসকিল, ব্যক্তিগত কারণে। কারণ বেশির ভাগ কবি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবুও বলি অন্ততঃ যাদের কবিতাগুলো আমি পড়লাম তাঁরা প্রত্যেকেই শক্তিশালী কবি বলে আমার ধারণা এবং জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ;এই শেষনামটি যদিও আমাদের দেশে অত্যন্ত neglected-ই বলব আমি। কিন্তু তার কিছু কিছু প্রেমের কবিতা অসাধারণ কবিতা ; তুলনায় কোন কবির থেকে নিকৃষ্ট নয়। তিনি তার জীবনে খ্যাতি পান নি। কালের বিচারে হয়ত পাবেন বলে আমার ধারণা।

মণীশ ঘটকের কিছু কবিতা—সব নয়, কিছু কবিতা, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় পড়ে এবং আমাদের কালেই আবার বলছি যে কিছু কিছু কবিতা আমাদের সমবয়সী বন্ধুদের এবং আমাদের পরবর্তী কালের কবিদের কবিতা—আমি নাম আগেই করেছি একবার, আপনার হয়ত মনে আছে তাদের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে যে যমস্ত কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে আমরা পাই তাদের থেকে মোটেই নিম্নশ্রেনীর নয়। অনেক দিক থেকে হয়ত উচ্চশ্রেণীর। এই দিক থেকে উচ্চশ্রেণীর যে আমরা গভীরতার সন্ধান বরাবর করেছি, আমরা mysticism এর মধ্যে আমাদের কবিতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছি। সেই গভীর অর্থে ব্যাপক অর্থে আধ্যাত্মিকতার দিকে যেতে চেয়েছি ; সেই জন্য আমি গর্ব অনুভব করি যে বাংলা ছোট গল্প এবং বাংলা কবিতায় বহু লেখক বহু কবি আজকে বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদার অধিকারী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা ৩

শঙ্খ ঘোষ

আপনার মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী?

সাহিত্যের উদ্দেশ্য—এটা নিয়ে এক কথায় কোনো রায় দেওয়া চলে বলে আমার মনে হয় না। আর এই প্রশ্নটার মধ্যে দুটো দিকও লুকোনো আছে। একটা, যিনি লিখছেন তাঁর দিক থেকে। আরেকটা, যিনি পড়ছেন তাঁর দিক থেকে। আমি প্রথমে লেখকের দিক থেকে ভাবতে পারি। এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, প্রত্যেক লেখক তাঁর জীবন সম্পর্কে, জগৎ ও বিশ্বসংস্থান সম্পর্কেকতকগুলো প্রশ্ন তার চারিদিকে তৈরি করেন এবং সেইগুলোর ভিতর তার উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। তিনি পৃথিবীকে কী ভাবে দেখছেন সেটি বলবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টাটাই হল সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য—আমার কাছে। আর এই জন্যেই পাঠকের দিক থেকেও এইটেই হওয়া [উ]চিত বলে মনে হয় যে, তিনিও তাঁর জীবন-যাপনের একটা pattern বা নক্সা খুঁজছেন পড়াশোনার মধ্য দিয়ে।

আজকাল সাহিত্যের উদ্দেশ্য অনেক দেশে আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।—এ ব্যাপারে আপনার কী মত?

এদেশে বা কোনো দেশে সাহিত্যেরউদ্দেশ্য ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশ্নটার মধ্যে এই কথাটাহয়তোলুকোনোআছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সাহিত্যের ওপর খানিকটা হাত দিচ্ছে। হয়তো এই প্রশ্নটা আছে, কিংবা যদি নাও থাকে, যদি এটা বলে দেওয়া যায় যে, কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়, ধরা যাক, কোন সমালোচকমণ্ডলী বা কোনো প্রতিষ্ঠান ঠিক করে দিচ্ছে যে সাহিত্যের এই উদ্দেশ্য। যদি এরকম হয় কোথাও এবং সেই ঠিককরা নিয়ে যদি কেউ সাহিত্য চর্চা করেন, তাহলে

সাহিত্য সমূলে নষ্ট হতে বাধ্য। আমি খুব দৃঢ় ভাবেই এটা মনে করি যে, যিনি লিখছেন তার উপর কারো কোন খবরদারি চলে না। কিন্তু যিনি লিখছেন তাঁর নিজের কতকগুলো শর্ত থাকতে পারে। তিনি তাঁর দেশ, সমালোচনা, রাষ্ট্র এ সমস্ত নিয়ে কোনো সর্ত তৈরী করে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কখনই তাঁর সেই বোধের বাইরে আর কিছুকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন, আর কিছু আরোপকে নিজের উপর নেবার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে নিশ্চিতরূপে ক্ষতিজনক বলে আমার মনে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের কোন শাখা তুলনামূলক ভাবে বেশী ঐশ্বর্যবান ?

গত ১৫ বছরে যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে বাংলা কবিতা অন্য সমস্ত শাখার চেয়ে যে অনেক এগিয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে এটুকু জুড়ে দিতে পারি, হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধের যে গতি ছিল, এই ২৫ বছরে তার খানিকটা উন্নতি দেখা গেছে। অর্থাৎ প্রবন্ধ লেখার দিক থেকে, চিন্তা ভাবনার দিক থেকে খানিকটা এগোবার লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই ভালো যে গল্প উপন্যাসে নিশ্চিত অবনয়ন ঘটেছে।

ছোট গল্পের পশ্চাদপসরণ কী অর্থে আপনি বলতে চাইছেন ?

এই অর্থে বলছি যে, ধরা যাক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তার কিছু আগে, আমরা এমন কিছু গল্পের কথা বলতে পারতাম যেটা গর্বের বিষয়। নাম করেও বলা যায়—যেমন ধরা যাক সে আমলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, তারাশংকরের গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প (যিনি পরে খুব খারাপ লিখেছেন, কিন্তু তাঁর প্রথম আমলের গল্প)

বা বিভূতিভূষণের গল্প। এই সব গল্পের মধ্যে যে নতুন ভাবে জীবনকে দেখবার একটা চর্চা ছিল, সেই জিনিসটা সেই অনুপাতে গত ২৫ বছরে আর বাড়ে নি। যেটা গত ২৫ বছরে হয়েছে, সেটা আসলে তারই খানিকটা অনুবৃত্তি। অনুবৃত্তি মানে নকল যে তাও নয়। আজকের দিনে, হয়তো দু-একটা অনুষঙ্গ, আজকের দিনের প্রাত্যহিক সমস্যা কোনো একটা হয়তো এসেছে, যেটা ৪০ বছর আগে সেভাবে আসতে পারত না। কিন্তু দেখার দিক থেকে—যেটা আমি বলেছিলাম সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে, যে ভাবে জীবনের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন তুলতে হয়, সেই প্রশ্নের দিকথেকেনতুন কোনো মাত্রা বা ডাইমেনশন তৈরি হয় নি গল্পে। কিন্তু তবু যে আপনার হঠাৎ গল্প নিয়ে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছে, তার কারণ হয়তো এই যে, গত ১৫ বছরে গল্পের কতকগুলি নতুন টেকনিক আমরা বার বার শুনেছি, নতুন রীতির আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর আরো নানারকম আন্দোলন। অর্থাৎ টেকনিক্যাল কতকগুলো নতুনত্ব করবার চেষ্টা হয়েছে—সেটা করতে গিয়ে আমরা বার বার দেখেছি যে, আসলে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই ফিরে যাচ্ছেন অল্প সময়ের মধ্যে পুরোনো একটা কোনো জগতে আমাদের সমসাময়িক বন্ধুদের মনে হয়েছিল যে, যেটাকে আমরা ভাবছি গল্পের নতুন ডাইমেনশন, সুনীলের গল্পে বা উপন্যাসে সেটা আসতে পারে হয়তো। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেই জায়গাটা থেকে সুনীল সরে এসেছেন। 'যুবক যুবতীরা' বা 'আত্মপ্রকাশের' মধ্যে যে সম্ভাবনাটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে পরের দিকে সরে যাচ্ছে। এটা একটা নাম বললাম মাত্র এরকম আরো উদাহরণ হাল আমলের লেখকদের দিয়ে দেখানো নিশ্চয় যায়।

এরকম একটা মতবাদ আমরা শুনেছি যে প্রাচীন কালে মহাকাব্য, প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত কবিতা আর বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে উপন্যাস সাহিত্যে

প্রাধান্য লাভ করেছে এবং করবে। কিন্তু আপনি বলছেন বর্তমান কালে বাঙলায় গল্প উপন্যাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যাপারটা একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে বলে কি আপনার মনে হয়?

এই প্রশ্নের মধ্যে অনেক তর্কের ব্যাপার রয়ে গেছে। সেগুলো আমি তুলছি না। কারণ ওতে অনেক মাস্টারি কথা চলে আসতে পারে। আগে মহাকাব্য ছিল, পরে কবিতা, এখন উপন্যাস—এগুলো অনেক বিশ্লেষণ এবং বিতর্ক সাপেক্ষ বিষয়। আমি ওর মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু শেষ যে কথাটা বলা হল যেখানে যদি ভর করা যায়, উল্লেখযোগ্য লেখা হচ্ছে না—একথাটার কিন্তু মানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। তার মানে এই নয় যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লেখা হচ্ছে না। আসলে তার চরিত্রটা উল্লেখযোগ্য নয় এটা আমার বক্তব্য। এখনকার পাঠকের কাছে বা এখনকার লেখক বা প্রকাশক মহলে উপন্যাসটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কবিতা তো নয়ই, এমন কি গল্পও নয়। গল্প তো প্রায় পিছনে সরে যেতে বসেছে। শুধু আমাদের দেশেই নয় অবশ্য, এ প্রায় সব দেশের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নানা কারণে। কারণটা কী? গল্প যে সরে যাচ্ছে সেটা কি টের পান আপনারা? গল্প অনেক লেখা হয়, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে, গল্পের বই সে তুলনায় ছাপা হয় কম। স্বভাবতই বিক্রি হয় না বলে ছাপা হয় না। অনেক গল্পের বই আছে, পাঠকের বোঝার উপায় নেই যে, সেটা গল্পের বই, ওপরে একটা নাম, ভিতরে কোন সুচিপত্র নেই। পাঠক মনে করছে এটাই হল গোটা উপন্যাসটার নাম। ১৬ পৃষ্ঠা পাতার পর সে বুঝতে পারছে যে ওই নামে গল্পটা ফুরিয়ে গেল, তারপর আরেকটা গল্পের শুরু। তার কারণ, নাটক বা গল্পের বই দেখলে কেউ কিনতে চাইছেনা আর। এবং আগেই বলেছি এটা আমাদের দেশে শুধু নয়, এটা পৃথিবীব্যাপী অসুখ একটা। তখন প্রশ্ন ওঠে কেন হচ্ছে এটা। গল্পের বই দেখলে কিনতে চাইবে না

তার একটা খুবমজার উত্তর আছে। আমরা তো এক সময় শুনেছিলাম, স্কুল কলেজে শিখেছিলাম যে, আমাদের হাতে সময় এখন খুব কমে যাচ্ছে বলে গীতিকবিতা বা ছোট গল্পের দিকে ঝোঁক। আমাদের মহাকাব্য থেকে গীতিকবিতায় এবং উপন্যাস থেকে ছোট গল্পে কেন আসছি? কেন না আমাদের সময় নেই। অল্প সময়। কথাটা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে উল্টো হয়ে যায় কখনো কখনো। অর্থাৎ সময় নেই বলেই বেশি জিনিস দরকার আমার হাতের সামনে। অনেকদিন আগে এক ফরাসী দার্শনিক একটা কথা বলেছিলেন—কথা নয় একটা চিঠি লিখেছিলেন, খুব লম্বা চিঠি—তাঁর বন্ধুকে; লিখে শেষে পুনশ্চ দিয়ে বলা ছিল, 'একটু ক্ষমা প্রার্থনা করি যে, আমার হাতে সময় খুব কম, সেজন্য চিঠিটা খুব লম্বা হয়ে গেল, কিছু মনে কোরো না।' এই ব্যাপারটার কিন্তু একটা মানে আছে। মানেটা এই যে সময় যখন আমার হাতে প্রচুর নয়, অর্থাৎ আমি যখন মনটাকে স্থির করতে পারছি না, তখন আমার দরকার কিছু ছড়ানো জিনিস। মনটাকে সংবৃত করতে পারছি না বা মন লেখার ওপর রাখতে পারছি না। সেজন্যে আমি চাই ছড়িয়ে পড়া জিনিস। ছোট গল্পের একটা মজা হল, যদিও জায়গা নিচ্ছে অল্প কিন্তু পাঠকের মনোযোগ সে অনেক বেশি তীব্র ভাবে চায়। এখন, আমাদের দেশের দিকে তাকালে তো খুব সহজেই চোখে পড়ে কতকগুলো ব্যাপার। উপন্যাসের একটা বড় পাঠকশ্রেণী হচ্ছে যাঁরা প্রত্যেক দিন ট্রেনে করে অফিসে আসছেন, ট্রামগুমটি থেকে, বাসগুমটি থেকে বসতে পাচ্ছেন এবং অফিসে যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে প্রায়ই দেখবেন বড় বড় বই। অফিসটফিসে গিয়ে একটা বই খুলে গল্প পড়লেও সুবিধে হয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে যেটা ভেবেছিলাম, সেটা তো এ নয়। এ শুধু সময় কাটানো, কোনরকমে মনটাকে লগ্ন না করে সময় কাটানো। এই ব্যাপারটা করতে করতে হালকা লেখার দিকে আকর্ষণ খুব বেশি হয়েছে পাঠকের। এটা প্রকাশকরা বা লেখকরা টের পাচ্ছেন; ফলে

লেখকরাও সেই জিনিস তাদের দিয়ে যাচ্ছেন। এই রকম একটা চক্র তৈরী হয়ে গেছে, আমাদের মধ্যে। ফলে উপন্যাস লেখা হচ্ছে বিস্তর, কিন্তু সেই সময় নেই, সেই মন নেই ধরবার। পাঠকেরও নেই, লেখকেরও নেই। এইটেকে প্রধান দুর্বলতা বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের দেশের সাহিত্য-জগতে বানিজ্য বৃত্তিটা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া খুব শক্ত। চারদিক থেকে আস্তে আস্তে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের ওপর সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে পৌঁছচ্চে, আজ বাংলাদেশে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এবং শারদীয় সংখ্যা এই হচ্চে লেখবার সময়। সমস্ত লেখাটা নির্ভর করছে পুজোর সময়ে প্রকাশ হবে, পাঠকরা পাবেন। প্রকাশ করবে কতকগুলি পত্রিকা। এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার চেহারা নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ক্রমশঃ এটা বেড়েছে। তার ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যাঁরা লিখতেন সেই লেখকরাই দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে যে লেখা লিখছেন তাতে মস্ত প্রভেদ হয়ে গেছে, এর খুব ভালো একটা উদাহরণ তারাশঙ্কর। তারাশঙ্করের ১৯৫০ পর্যন্ত লেখা, আর তার পরবর্তী লেখা একেবারে ভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া যায়। একটা প্রশ্ন তার পরেও থাকে যে, এই যে দুর্বলতা Commercialisation লেখকের তো প্রতিরোধ করা উচিত। সেটাই আমাদের দুঃখের, সমস্যার। তেমন লেখক খুব কম আছেন, যাঁরা নিজের লেখার উপরে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি নিজে এক সময় বলতাম জীবনানন্দের কথা। জীবনানন্দের সেই সাহস ছিল। কিন্তু আজকাল আমার কখনো কখনো সন্দেহ হয় যে, এমন কি জীবননান্দও পারতেন কিনা এড়িয়ে যেতো। জীবনানন্দের জীবনকাল পর্যন্ত এই ভাবে গ্রাস করে নেয় নি গোটা ব্যাপারটাকে বানিজ্যজগৎ। কিন্তু এখন যে ভাবে নিয়েছে, তাতে কোন লেখকের পক্ষেই সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে থাকা শক্ত অথচ সেই ক্ষমতা অর্জন করা ছাড়াও আর কোন পথ আছে বলে মনে

হয় না। এখন মুস্কিল হচ্ছে, নিজের ওপর নির্ভর করতে পারেন, সেই রকম স্পর্ধা (ভাল অর্থে আমি স্পর্ধা কথাটা বলছি) এরকম সত্যি-কারের অহংকার কমে এসেছে খুব, আর সেই কারণেই উপন্যাসের দুর্গতি চারদিকে চলছে। আমি বলছি, উপন্যাসে নয়—দুর্গতিটা অন্যত্রও ছড়িয়েছে। তবে স্বভাবতই উপন্যাসের ক্ষেত্রে বা গল্পের ক্ষেত্রে এটার সমস্যা আরও প্রত্যক্ষ সমস্যা। কেন না কবির কাছে এটা তত বড় সমস্যা সব সময় নয়। তিনিও এড়িয়ে থাকতে পারেন না, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হতে পারে যে, কবিতা কজন লোকই বা পড়ে, কজন লোকই বা এটাকে আদর করবে। এটা বরাবরই হয়ে এসেছে। অনাদর পেতে পেতে খানিকটা অভ্যস্তই হয়ে থাকেন তিনি আজকে অবশ্য আদরের একটা ঘটা লেগে গেছে চারদিকে, তাই কবিদেরও একটু বিপদ হয়েছে। কিন্তু গল্প উপন্যাসে তো সামনা-সামনি পাঠকের মুখ দেখতেই হয়, তার ফল এটা হয়েছে।

কতটুকুর মধ্যে গল্প লিখবেন বা কতটুকুর মধ্যে উপন্যাস লিখবেন এটাও আজ প্রায় ঠিক করে দেওয়া আছে এবং লেখকরা সেইটে প্রায় মেনে নিয়েই লিখছেন! তার ফলে যে পূজো সংখ্যায় আটটা উপন্যাস থাকবে তাতে পঞ্চাশ বা ষাট পৃষ্ঠা করে একেকজন পাবেন, সেরকম ভাবেই তাঁরা লিখছেন। একটা জিনিস গোড়ার দিকে হ'ত, সেই বইটাই যখন উপন্যাস হিসেবে ছাপা হচ্ছে, তখন বিজ্ঞাপন থাকত পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত এইসব, আজ কাল আর সেটারও উপায় নেই। কেন না এই ব্যাপারটা প্রায় গরম রুটির মত এমন বিকোচ্ছে যে, যখন ছাপা চলছে পত্রিকাটি, প্রায় তখনই বই হিসাবেও ছাপা চলছে সেটা। ফলে সেটা শোধন করে দেবারও সময় নেই। ফলে হয়েছে এই রকম যে এই একটা অদ্ভুত আয়তন তৈরী হয়েছে উপন্যাসের, যেটা না গল্প না উপন্যাস। কি জিনিস লেখক তৈরী করতে চাইছেন, কিছু বোঝা যায় না।

লিটল ম্যাগাজিনগুলিই এখন বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে? আপনার কি মনে হয়?

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যে এখন বড় কতকগুলো ভাগ হয়ে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তের কথা যদি বলা যায়, তাহলে কিছু কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন আছে, যারা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী কথাবার্তা বলবার জন্যেই পত্রিকা করছে, নানা রকম লেখা, নানারকম ভাবনার মধ্যে আছে এবং এই পত্রিকাগুলো সত্যিকারের লিট্‌ল ম্যাগাজিন। তারা কতদূর এগোতে পারবে সেটা অন্য সমস্যা, কিন্তু একটা সমাজে, একটা মুহূর্তে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর যে ভূমিকা, সেটা তারা অর্জন করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ প্রতিবাদের সাহিত্য বলতে যা বোঝা যায় কিন্তু সাধারণভাবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের চরিত্র এই দশ-পনর বৎসরে অনেকখানি পালটে গেছে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে হয়তো আমি ব্যাপারটা বোঝাতে পারব। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যখন লিট্‌ল ম্যাগাজিন কেউ বার করছেন, কোন সদ্য তরুণ দল—তাদের একটা এই সাহস ছিল যে, তাঁরা তো নিজেদের লেখার জন্যেই পত্রিকা বার করছেন এটা বলতে তাঁদের কোন সঙ্কোচ ছিল না—'আমরা আমাদের লেখা বার করতে চাই আমরা আমাদের লেখা অন্যেরা ছাপে না, কিন্তু আমরা মনে করি আমরা লিখছি, অতএব আমাদের লেখার জন্যেই এই পত্রিকা।'—এই যে সাহসটা, প্রায় দশবছর ধরে দেখতে পাচ্ছি—এটা লুপ্ত হবার পথে। যেমন আজকে নতুন লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরুলেই তাঁরা প্রথমেই দৌড়ে যান প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছে। আমি বলব, কিছু প্রতিষ্ঠানগত লেখকের কাছেও। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছে নতুন লিট্‌ল ম্যাগাজিন যাবে কেন? তাদের বিরুদ্ধেই তো তার অভিযোগ হওয়া উচিত, এবং সেই সামর্থ্য থাকা উচিত যে, আমরা আমাদের লেখা দিয়েই পত্রিকা চালাবো। কেন পুরোনোদের

লেখা ছাপা হবে? তার উত্তর তারা খুব সরাসরি দেয়। তারা অনেকেই এই কথা বলেছে, তাহলে তো বিক্রী হবে না, কয়েকটা নাম থাকা দরকার, যে নাম দেখে লোকে কিনবে। আমি মনে করি এই উত্তরটাই প্রমাণ করে দেয় যে, তারা লিট্‌ল ম্যাগাজিন নয়।

কৃত্তিবাস পত্রিকা যখন বেরিয়েছিল, ১৯৫৩ থেকে ৬০ সাল পর্যন্ত, এই পত্রিকাকে—এই পত্রিকার মধ্যে যারা লেখক তারা ছাড়া আর বিশেষ কেউ লক্ষ্যই করে নি। কৃত্তিবাস বেরোলে সুনীল পত্রিকা কাঁধে করে নিয়ে কফি হাউসে যেতেন, এবং কবিবন্ধু যারা, তাদের মধ্যে বিতরণ করতেন এবং স্টলে রেখে দিতেন। বিক্রী হলে হত, না হলে নেই; প্রত্যেকটি সংখ্যা বেরিয়েছে বন্ধু-বান্ধবদের টাকায়, প্রধানতঃ সুনীলেরই টিউশ্যানের টাকায়, কেননা সুনীল ছিলেন লাজুক এবং খানিকটা অভিমানীও বটে। সবসময় সকলের কাছে চাইতেও পারতেন না। এইভাবে সাত-আট বছর বেরোবার পর যখম হঠাৎ একটা সোর-গোল পড়ে গেল তখন সবাই কৃত্তিবাসের দিকে লক্ষ্য করছে, ছুটে আসছে, ভালো বলছে, গালাগাল দিচ্চে—নানারকম ব্যাপার। কিন্তু এই সাত আট বছর তো তাকে সইতে হবে। আজ-কালকার লিট্‌ল ম্যাগাজিনদের দেখছি তারা একমাসও সইতে রাজী নয়, তারা প্রথম সংখ্যা থেকেই চায়, এই ধরণের কোন একটা সাফল্য, যেটা ব্যবসায়িক বা প্রচারগত সাফল্য। চার, পাঁচটা সংখ্যা বেরোবার পরই এই লেখকদের কারু কারু লেখা হয়তো বড়ো কোনো পত্রিকায় বেরুল। ফলে তার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের কাজ ফুরিয়ে গেল, পত্রিকা আর বেরুল না। অর্থাৎ এ হয়ে দাঁড়ালো একটা সিঁড়ি মাত্র। ফলে এই যে ভূরি পরিমান লিট্‌ল ম্যাগাজিন, তার চরিত্র অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। তবে এটা ভালো যে, পুরোটাই এই চেহারা নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতিফলন কি যথোপযুক্ত ?

এই প্রতিফলনের কিছুটা চেষ্টা হয়েছে, এই পর্যন্ত মাত্র বলা যায়। কিন্তু ওই আগে যে রকম আলোচনা হচ্ছিল, সেই সূত্র টেনেই বলা যায়, নানা কারণে সেটা যথোপযুক্ত হতে পারে না, যে কয়েকজন লেখকের মধ্যে বিশেষতঃ উপন্যাস বা গল্প লেখকদের মধ্যে এই প্রতিফলনের একটা ভালো রকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল (যেমন সমরেশ বসু) তাঁরাও —ওই আগে আমি যে সব কাজের কথা বলেছি—সেই সব কারণেই খানিকটা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। এখনও পর্যন্ত, অবশ্য সমরেশ বসুর চেষ্টা আছে সেই সামাজিক পুরো চেহারাটা দেখবার, কিন্তু সেই চেষ্টাটা এখন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে অনেকখানি। গোড়ার দিকে আমরা যেরকম ভাবছিলাম, ওঁর কাছেই হয়তো পাবো এ সময়কার একটা পুরো ইতিবৃত্ত বলা যেতে পারে, এখন আর ঠিক ততটা আশা করা যায় না। অন্য লেখকদের মধ্যে যেটা হয়েছে সেও আমি আগেই বলেছি যে, সমসাময়িক ঘটনার কতকগুলি উপরিতলের ছায়া তারা ব্যবহার করেছেন। ফলে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রায় একটা সাংবাদিকতা ধরণের সমাজ বিষয়। 'জার্নালিজম্' বলতে যা বোঝায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলাফল কি রকম ?

এ প্রশ্নটার মধ্যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, একটা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আছে। কিন্তু সব সময় হয়ত সে রকম কিছু নেই। অবশ্য সাহিত্য তো খুব বড় করে বলা হ'ল ; যদি আলাদা আলাদা করে বলা যায়— এখানে গল্প উপন্যাসের কথা প্রথমে মনে হয়, একটা সময় যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের নতুন যুগের লেখকেরা সব বিদেশী লেখা

পড়ছিলেন। শুধু যে পড়ছিলেন তাই তাই নয়, সে লেখার কিছু আবহ তৈরীও হচ্ছিল, তাদের লেখায় খানিকটা নিয়ন্ত্রণও করছিলেন ভালো অর্থে। যেমন, ন্যুট হামসুন, কিম্বা ম্যাক্সিম গোর্কি কিম্বা অন্য দিক থেকে ডি, এইচ, লরেন্স এঁদের লেখায় এঁরা খুব অভিভূত বোধ করেছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কল্লোল থেকে বা বলা যায় প্রথম যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত সেই সময়কার বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় প্রভাব যতটা, তার পরবর্তী স্তরে ততটা নয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, গল্প উপন্যাসে এতটাই প্রায় বলা যায় যে, কোন প্রভাবই নেই! দু-একটা আলাদা কোন বইয়ের কথা যে, এটা অমুক বই দেখে লেখা হয়েছে—সেতো প্রায় নকলনবিশী যেমন 'ইডিয়টে'র কথা হয়ত মনে পড়বে। কিন্তু যাকে প্রভাব বলে সদর্থে, সে ভাবে বিদেশী লেখা পড়ে আত্মস্থ করার চেষ্টা এই সময়ে তুলনায় কম হয়েছে। কিন্তু এই সময় তো কিছু সে রকম নাম শোনা গেছে, কাফ্‌কা বা প্রুস্ত এ রকম কিছু নাম কিম্বা টমাস মান। কিন্তু টমাস মান বা কাফ্‌কা বা প্রুস্ত এসব নাম যে ভাবে শোনা গেছে বা কাম্যু তাদের সে ভাবে ব্যবহার করার কোন আয়োজন এই পর্বের লেখায় দেখতে পাইনি প্রায়। খুব ক্ষীণ আকারে বা হয়ত ফল্গু স্রোতের মত—কমল মজুমদারের লেখার মধ্যে খানিকটা ব্যাপার আছে সেটা উনি পশ্চিম থেকে খুব কৌশলে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেও খুব বড় কোন ব্যাপার নয়। কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য একটু অন্য রকম হয়েছে। কবিতায় ১৯৬০-৬১ এই সময় থেকে অর্থাৎ 'কৃত্তিবাসে'র যে সময়টার কথা বলছিলাম একটু আগে, সেই সময় খুব স্পষ্টতঃই একটা বড় প্রভাব কাজ করেছে। একটা সর্বাত্মক প্রভাব বলা যায়। এর কিছুদিন আগে থেকেই বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় এবং সেই অনুবাদ যেমন বুদ্ধদেবকে গ্রাস করল অনেকটা, তেমনি খুব তরুণ কবি যাঁরা তাঁরাও অনেকটা মুগ্ধ হয়ে গেলেন বোদলেয়ারের লেখায়। আর তখন থেকেই বোদলেয়ার

বা র‍্যাঁবো কিছুটা কিছুটা ছায়া ফেলছিলেন এই তরুণ কবিদের ওপর (যদিও মালার্মেও বলা হয়েছে কিন্তু মালার্মে কবিতায় কখনও আসেন নি তেমন করে)। কিন্তু সেটা হতে হতেই একটা ঘটনা ঘটল—'৬২ তে খানিকটা আলোর ব্যাপার এল বলা যেতে পারে। '৬২ তে গিন্‌সবার্গ এসেছিলেন কলকাতায় এবং এই কৃত্তিবাসের কোন কোন কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে থেকে ছিলেন। গোটা পৃথিবী জুড়ে তখন কবিতার যে একটা উথাল পাথাল ব্যাপার হচ্ছে, নতুন জেনারেশন নানা জায়গায় তৈরী হচ্চে—'অ্যাংরি জেনারেশন' এই ধরণের নাম দিয়ে—তার কিছু আভাস লাগল এসে এদের গায়ে। জীবন যাপনের একটা প্রণালী প্রায় তৈরীই করে তুলছিলেন এখানকার তরুণ কবিরা। তাঁরা খানিকটা প্রশ্রয় পেলেন গিন্‌সবার্গের কবিতায় বা তাঁদের জীবন যাত্রার ধরণে। এবং এটা বলা যায় না, যেটা অনেকে বলবার চেষ্টা করেছেন যে, গিনস্‌বর্গের কবিতা থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কবিতা তৈরী হল। এটা আমি মনে করি না। বরং উল্টোও কখন কখন হয়েছে যে সুনীল বা শক্তির কোন কবিতা অনুপ্রাণিত করেছে গিনস্‌বার্গকে। কিন্তু এটা বলা যায় যে, এটা একটা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার হল। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে যে তরুণ মানুষের বিক্ষোভ সে শুধু ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, এখানেও সেটা স্বভাবতই ছিল, তার একটা যোগসূত্র তৈরী হয়ে গেল তার ফলে কবিতায় তার পরবর্তী স্তরে কিছুদিন পর্যন্ত হয়ত ভাবা যায় যে একটা ব্যাপক অর্থে, আধুনিক পশ্চিমী প্রভাব খানিকটা কাজ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু কি পেয়েছেন যা বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারে অভিনব?

প্রশ্নটি যে পুরো বুঝতে পেরেছি তা বলা মুশকিল। একটা হতে পারে, বিশ্ব সাহিত্যেও নেই এমন কিছু এখানে হয়েছে কি না।

অভিনব কথাটার মানেই তাই। কিন্তু হয়ত সেই অর্থে আপনারা এখানে বলছেন না। হয়তো এই অর্থে বলছেন যে, বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, সেই রকম কোন লেখা আছে কি না? এটা ভীষণ গোলমেলে প্রশ্ন।

তার কারণ বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে বলতে কি বোঝা যায় সেটা কেউ জানে না। অনেক সময় এরকম একটা হিসেব করা হয়, অনেক বড় মনীষীও করেছেন। যেমন আমি কালকেই একটা বই পড়ছিলাম হেনরী মিলার লিখছেন র‍্যাঁবো বিষয়ে, খুব ভালো বই। তার মধ্যে হঠাৎ দেখলাম উনি একটা তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী, ইত্যাদি করে লেখকদের একটা শ্রেণী-ভাগের চেষ্টা করেছেন। নীরোদ চৌধুরী যেমন কিছুদিন আগে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে, তাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাবে তা এখনো ঠিক করতে পারেন নি তিনি। এখন, ওগুলো আমার কাছে একটু অস্পষ্ট মনে হয়। হয়তো যাঁরা বলছেন তাদের কাছে একটা স্পষ্ট কোন ধারণা আছে। কিন্তু আমি যদিও ক্লাস পড়াই তাহলেও সাহিত্যে কি ভাবে নম্বর দিয়ে, শ্রেণী ট্রেনী করা যাবে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। একটা সহজ কথা এই হতে পারে যে, অন্যদেশের পাঠক এই লেখা পড়ে তৃপ্ত হবে কি না—যদি এই দিক থেকে ভাবি, বিশ্ব সাহিত্যে কিছু দেবার আছে কি না—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়ত বা নেই, কারণ অনেক সময় এটা ঘটে যে অন্য দেশের পাঠক আরেকটা দেশের লেখাকে ঠিকমত নিতেই পারে না। এ ব্যাপারটার একটা মজা আছে। ধরুণ ফরাসী দেশে কিছু একটা লেখা হচ্চে, আমেরিকার কোন পাঠকের পক্ষে সেটাকে তার ঠিক মূল্যে বিচার করা অসম্ভব নয় তার একটা কারণ, যতই দূরের দেশ হোক, কোন একটা জায়গায় মূলগত ভাবে সংস্কৃতির ঐক্য আছে—যেটাকে আমরা পশ্চিমী সংস্কৃতি বলতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে জীবন এবং সংস্কিতর ধরণটা এমনই, তার ধারণা, ভাবনা, চিন্তা তার পটভূমিতে এমন ভাবে রয়েছে

যেগুলো বোঝা বাইরের কোন লোকের পক্ষে খুব মুশকিল। তার ফলে যে মুহূর্তে এটা অনূদিত হবে, তক্ষুনি এটার মূল্য হারিয়ে যায়। ফলে আমি বিচার করব কি করে? আমি হয়তো একদিক থেকে কোন একটি লেখাকে বলছি এটা বিশ্ব সাহিত্যে পরিবেশিত হবার যোগ্য। কিন্তু আমি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যান্য পাঠকদের কাছে নিয়ে দেখছি যে, তারা মনে করছে এটা তাদের আস্বাদনের যোগ্য নয়। তখন কি বলব যে এটা বিশ্ব সাহিত্য হল না! খুব ভালো উদাহরণ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলছি যে রবীন্দ্রনাথকে যে যাই লিখিত ভাবে বলুন, তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খানিকটা ভুল বোঝেন নয়ত খানিকটা বানিয়ে বলেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে সত্যটা এই যে, গোটা পশ্চিম জগতে এবং জাপান চীনেও (আমি কিছু জাপানী চীনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি) তারা প্রায় কেউ এখন রবীন্দ্রনাথের নাম শুনতে প্রস্তুত নয়। অনেকে পড়ে নি। যারা দুচারজন পড়েছে, তারা পড়ে' বলে যে খুবই খারাপ লেখা। এখন—যখন তারা বলছে এটা, তখন তা শুনতে হবে। তাদের রুচিতে এটা নিচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তো আমি এটা ভাবতে পারছি না যে, সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন। ফলে বিচারটা সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে হবে। আমার কাছে বিচার করতে হবে এই ভাবে যে, আমি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের খুব ভালো সাহিত্য পড়ে যে ধরণের তৃপ্তি পাই, এই সময় বাংলার কোন লেখা পড়ে সেই রকমের কোন তৃপ্তি পাচ্ছি কি না। ফলে আমার কাছে উল্টে আসবে ব্যাপারটা। প্রশ্নটা যদি এই রকমের হয় তাহলে আমি বলব যে নিশ্চয়ই সে রকমের কিছু লেখা আমি পড়েছি যেটা মনে হয়, বিদেশী লেখা পড়তে যে রকম তৃপ্তি পাওয়া যায়—খুব বড় লেখা; সে রকম কিছু কিছু লেখা হয়েছে। এর তালিকা অবশ্য করা মুশকিল।

[অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তাঁর বাড়ীতে এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে, সকাল বেলায়। অরুণ ভট্টাচার্যের, যে মাসের তেইশ তারিখ সকালে—তাঁর বাড়ীর পাশেই একটি বাড়ীতে, শঙ্খ ঘোষ তাঁর শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে মে মাসেরই আট তারিখে সন্ধ্যায়। প্রশ্ন করা, টেপ থেকে অনুলিখন প্রভৃতি সমস্ত কাজ করেছেন নমিতা চক্রবর্ত্তী, রণজিৎ চক্রবর্ত্তী, তপতী ভাদুড়ী, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য এবং কল্পনা চক্রবর্ত্তী। এরাই বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা পরিষদের পরিচালনায় গবেষণার কাজটি চালাচ্ছেন। সম্পাদক : উত্তরসূরি]

কবিতাবলী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দয়ালিনী

তোমার উরুতে হাত রেখেছি উর্ব্বশী।
সে কী যে প্রপাত তাই সমস্ত শরীর দেখি শিহরিত হয় দূর্ব্বাঘাসে
পীবর উর্ব্বর!
কি কাজ আকাশে—
তারার আগুনে লেখা প্রাক-অন্ধমসী?
এ সবুজ আশীর্ব্বাদ সেখানে পায়নি প্রীত ঘর।

ওখানে কেবল কান্না—কান্না—প্রেতকান্না আর কিছুই যে নেই
মৃত্যুর আক্রোশে আক্রমণে!
তাকিও না সে আকাশে, মনের শমনে
কে ছ্যায় প্রশ্রয়। জন্ম-মৃত্যু-জন্ম নাচে ঘিরে ঘিরে তোমাকেই
তুমি নাচো আমি আসি অপূর্ব্বশরীরে ফিরে জন্ম-জন্মান্তরে
এঘরে ওঘরে।

সব দ্বার খোলা, তোলা সব যবনিকা,
বিরস সরস পালা, যাই হোক, অভিনীত মন্দিরে মন্দিরে যাত্রাপথে।
তুমি তো আগুন নও, স্ফুরিত কুসুমদল শিখা
ওখানে বাড়াই হাত, নির্ভয়, আমরা মনোরথে॥

অমর অমল

তোমাকে জানতে কোথা যাব বিয়েত্রিচে ?
বিয়েবাড়ি ঢের। চন্দ্রাতপ। আমি বসে আছি নীচে
ত্রিকোণের ধাঁচ
যে জায়গা পেয়েছি খালি, সামনেই নাচ
খালিপায়ে ফ্রকে তোলে খুকু,
বলছে বুড়োর মতো : 'আমারই তো বিয়ে'।
পাড়ার প্রবীণ প্রৌঢ়, মরালিষ্ট, বললেন ঠোঁট শুকু শুকু :
সত্যি খুকুমনি মরালিকা
কে তোমার বর ?

ত্রিকালে পৌঁছেছি আমি, বিয়েত্রিচে আমাকেই নিয়ে
শুনলাম জ্বাললে যে পঞ্চমাগ্নি শিখা !
সলজ্জ সে প্রৌঢ়, বন্ধ নেয়া তার বিয়ের খবর।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি, দেবলোকে, প্রজাপতি, যদি থেকে থাকো
শোনো, সে নরক হতে অমর অনল
অমল করেছে খুকু তারপর রেকাবিতে রোজ ফুল এনে
শুধু তার নাম লেখা পেতে
একটি ছড়ায়। আমি সমস্ত সরিয়ে দেখি সাঁকো
স্বর্গ আর নরকের মৈত্রী, নাকতলা—বাঁশদ্রোনী ঠিক নীচে
গঙ্গাজল
অমল অনল নীল ছিল যেন পার্গেটরি পৃথিবীর ক্ষেতে,
দ্রোনফুল আজও ছায়, তারি প্রতিভাসে মহাকাশে তারা অমর
অনল নিই মেনে।

৯-১১-৬৪ ইং

অরুণ ভট্টাচার্য

সময় অসময়ের কবিতা

১. ইতিমধ্যে কয়েকটি বসন্ত গেছে।

তোমাকে যে মনে মনে গড়ে তুলেছিলুম,
তিল তিল করে প্রতিমার অবয়ব
আমার সম্মুখে ভাসতো
হঠাৎ কোন্ ঝড়ের ঝাপটায় সব
উলট-পালট হয়ে গেল।

এখন আমি অস্পষ্ট দেখতে পাই, কুহেলিকায়
সমাচ্ছন্ন একটা শরীর মাত্র।

২. তুমি কথা বললে।
যেন অনাদিকাল-থেকে এই স্বর শুনছি
যেন আমার হৃদয়ের জানালা কপাটগুলো
তোমার হাসির শব্দে, গানের শব্দে
ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল।

আমি এতকাল তারি মধ্যে বন্দী ছিলাম।
কে যেন আমাকে আলোকমালার হাত ধরে
উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিলে।

সেই থেকে আমি অনাদিকালের স্বর শুনবো বলে
আজো বসে আছি।

৩. হঠাৎ তুমি ঘরে ঢুকলে ঝড়ের মত
টেবিল-চেয়ার খাট পালঙ্ক তছনছ করে দিলে
বললে, ঘর ছেড়ে দাও,

বেরিয়ে পড়ো এই মুহূর্তেই।
দেরী করলে আর সময় পাবে না।

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কতক্ষণ যে কেটে গেছে জানি না।
যেমন সে এসেছিল দমকা হাওয়ার মত,
উধাও হয়ে গেল মুহূর্তে।

রেখে গেল আমার জন্য সারাজীবনের দীর্ঘশ্বাস।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

অনিঃশেষ

‘মেলা দেখতে যাবি ? চল্‌

পথে পিতা প্রশ্ন করে ‘বল্‌ কী কী নিবি ?’

‘মেলাটাই কিনে দিও, বাবা’

মুহূর্তে চকিত পিতা মগ্ন কণ্ঠে বলে ঃ

‘তারো পরে থেকে যাবে অপার পৃথিবী ॥’

যে ভূখণ্ডে আছো

যে ভূখণ্ডে আছো তার পরিচর্যা করো ।

যেটুকু আকাশ ছাখো তাকে দাও শস্যের সুঘ্রাণ ।

জলস্রোত, বায়ুস্রোত, বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ধাবিত নিসর্গস্রোত—

এদের প্রবাহে বহমান

হতে হলে একদিন ।

ভেবে নাও কী করে তখন

চিহ্নিত করবে সেই ঘূর্ণাবর্তে একাকার—ভগ্নাংশ পৃথিবী—

যা একদা ব্যক্তিগত, একান্ত নিজস্ব ভেবেছিলে ?

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

মৃত্যুর নীরব শান্তি

তুমি না দেখলেও তিনি দেখেন তোমাকে
তোমার চুলে গুচ্ছে, মগডালে পাতার আড়ালে মৃত্যু হেসে
বসে আছে ;
তুমি না দেখলেও ঠিক দেখেন তোমাকে ;
দুটি শিউলি করবী, দোয়েল ফিঙে
ঘরে এলেই তাকিয়ে থাকেন,
জন্মদিনে উৎসবে দাঁড়িয়ে থাকেন দরজায়
প্রদীপের নিচে অপেক্ষা করেন শেষ ফোঁটার জন্যে
তুমি না দেখলেও তিনি দেখেন তোমাকে।
তুমি না দেখলেও মুখ
হাতের নরম
মুখের উজ্জ্বল পাল্টে যায়
তুমি না জানলেও ঠিক চলে যাও
ঘুরতে ঘুরতে
উৎসব পেরিয়ে
ফাঁকা মাঠের ওপারে স্তব্ধ নিরব শান্তিতে।

সবাই একবার প্রেমিক হও

সবাই একবার মাতাল হয়
যে কখনো হয় নি সে ঘুমের থেকে উঠে শান্ত মাথায়
মানুষ খুন করতে পারে।
যে দ্বিতীয় বার প্রেমিক হতে পারে নি
সে শৈশবের হাত ধরে বুড়ো গাছের নিচে দাঁড়ায়।

দেখে বুড়ো মাটিতে হাঁটু ডুবিয়ে বসে আছে
বাতাসে কব্জি ডুবিয়ে বেঁচে আছে
নদীতে মাথা নুইয়ে চুল ভিজিয়ে নিচ্ছে
ভিজে চুলে প্রজাপতির গন্ধে থরথর কেঁপে ওঠে ;
সবাই একবার প্রেমিক হয়
যে হয় নি সে মানুষ করে
ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

দেখা হলে আরেক মানুষ

দেখা হলে আরেক মানুষ।
যখন ঠিকানা খুঁজি, সেই
পুরনো মানুষটাকে ডাকলে এখনো চলে আসে
যখন যেমন থাকে দেখা পাই
যখন ঠিক'না ধরে খুঁজে খুঁজে
পুরনো গলিতে সিঁড়ি ভেঙে উঠি
পুরনো মানুষটাতে হাত রাখি
ঃ পুরনো দেয়ালে মাখামাখি
অথচ জানি না কেন
দেখা হলে আরেক মানুষ।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

মন ছুটি চায়

তোমরা সবাই কেন ছুটি চাও মেঘ, আকাশ, মৌসুমি বাতাস
কত অপরাহ্নবেলা খেলার মাঠের ওপর দিয়ে গিয়েছে গড়িয়ে
হ্রদজলে পা ভিজিয়ে হাতে দিয়ে কত হাততালি
যে যার হৃদয় থেকে অনাবশ্যকের ভিড় করে গেছে খালি
বাড়িফেরা বক যেমন মাঝে মাঝে সন্ধ্যার অতীতে চলে যায়
মাঝে মাঝে চাঁদ কিংবা জ্যোৎস্নাধারা
জানলা দিয়ে বিছানায় এসে মুখ লুকোয়
মনে হয় আমরা সকলেই কতকাল এমনি একসঙ্গে ডুবে
মিশে আছি
কতকাল সম্পৃক্ত গভীরে, নিঃসঙ্গ অথচ
তবে কেন ছুটি চাও—দিবসান্ত দেখো রোজই হয়
রোজ পথে এক মুখ দেখি না
আমরা ত ছুটির মধ্যেই আছি
তবে কেন মন ছুটি চায়।

নিজেকে হারিয়ে

কী একটা হারিয়ে ফেলেছি ঠিক কী যে বলতেই পারছি না
জানলা খুলে ভোরবেলা ভাবলাম আকাশের দিকে চোখ রেখে
কিছুতেই মনে পড়ছে না কো—কেবল মেঘের মত পেঁজা তুলো
মনের ভিতরে জমছে,
একথা সেকথা জমছে,
দীর্ঘ দ্রাঘিমার কাছাকাছি অস্তিত্ব কোথায় ফেলে এসে
এখন কী জন্যে বলো জল মাপছি এই জল প্রশান্ত সাগরে
হয়ত হারাই নি কিছুই

রোজ রোজ ঘুম থেকে উঠে আমার কালকের আমি
হারিয়ে ফেলেছি
আমি রোজই এক একটি পাপড়ি খুলে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি
রোজ রোজ নিজেকে আমি যে।

তিনি এসেছিলেন

তিনি এসেছিলেন যখন আমরা কেউই ছিলাম না
অথবা আমরা ঘুমোচ্ছিলাম
কারণ রাস্তার কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করেছে
দু-চারজন ফেউয়ের মত ছেলে তাঁর নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজ নিয়েছিল
নিজেই দু-এক গ্লাস জল খেয়ে খালি গ্লাস টেবিলে রেখেছেন
হয়ত বসেওছিলেন কিছুক্ষণ যেহেতু চেয়ারখানা
সরানো এপাশ থেকে ওইপাশে
আমরা নিশ্চিত জানি না কিন্তু বুঝতে পারি
কোন চিঠি দেন নি, কিংবা টেলিগ্রামও করেন নি
পাঠান নি লোকমুখে খবরও একটা
নিজে এসেছিলেন অথচ
তিনি কি গোপন গোয়েন্দার মত দেখতে এসেছিলেন
আমরা কেমনভাবে আছি
তবে কেন বসলেন না খানিক
একে একে বলতাম সমস্ত
আমাদের অভাব এবং কত অভিযোগ
না কি তিনি কিংবা অন্য কেউ আসেন নি মোটেই
ফিরেছি আমরাই
মনে মনে মাঝে মাঝে আমরা যারা এখানে থাকি না।

শোভন সোম

চলতি

গাছটা আমাকে পেরিয়ে গেলো, না আমি গাছটাকে পেরিয়ে এলাম,
দাঁড়িয়ে দেখতে গেলাম যখন তখন আমার শিকড় গভীরে
চলে যায় আমি হয়ে যাই গাছ।
যে যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে সামনে এগোয়,
স্থির থাকে নদী, শুধু তার জল বাতাসের মত কোথায় যে যায়…
কেবল বাতাস ওড়ায় উদোম ঘর ভাসানিয়া, দিক ভুলানিয়া
ঘুমের ভিতর কাঁপে অবিরল স্বপ্নের তাপে স্মৃতির ঝালর।

বৃষ্টি

ঘুম থেকে ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ জাগিয়ে দেয়
আশৈশবের নদী আর কিশলয়ে রূপোলি মর্মর।
বৃষ্টি থেকে বৃষ্টির মধ্যে
দরজায় নিরন্তর করাঘাত।
সকালে বারান্দায়
ঘুম থেকে ঘুমের মধ্যে হানা দিয়ে যাওয়া জলভেজা পায়ের ছাপ।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অথচ এক এক দিন

কুর্চি ফুলের আড়াল থেকে এক এক দিন
হলুদ প্রজাপতি উড়ে উড়ে আসে
এক এক দিন শালিখ কি চড়ুই
রোদ্দুর মেখে উঠোনে ধান খুঁজে ফেরে
বাতাসে কখনও কখনও বকুলের সুবাস
দূর উপবন থেকে ভেসে আসে কেকাধ্বনি ;

কলকাতার বুকে এ সমস্ত অবান্তর, অথচ এক এক দিন
আশ্বিনের আলোয় ছুটির সানাই বাজলে
বুকের মধ্যে স্থলপদ্ম পাঁপড়ি মেলে ভ্রমরকে ডাকে
যা হবার নয় তা যখন ঘটে যাচ্ছে দুর্নিবার
তখন চৌরঙ্গীর ট্র্যাফিককে উদ্‌ভ্রান্ত করতে একদল
হলুদ প্রজাপতির অভিযান মন্দ নয়,
বেশ ভালো লাগে !

ভালোবাসা ভালোবাসা

ভালোবাসা ভালোবাসা করে
দিনগুলি পাগল
ভালোবাসা ভালোবাসা করে
রাতগুলি পাগল
ভালোবাসায় চন্দ্রসূর্যের আকাশে
ঋতু বদল
ভালোবাসার অলৌকিক বিস্ফোরণে
ভালোবাসা
প্রশান্ত হাওয়ায় ভালোবাসায় ফুলের নির্যাস
দুরন্ত রৌদ্রে ভালোবাসায় আততায়ী প্রেমিক
ভালোবাসা ভালোবাসা করে
দুপুর গড়িয়ে বিকেল

তবু কারা যেন খুঁজে ফিরছে ভালোবাসা
ভালোবাসা চাই বলে বৃষ্টি নামছে
ঝড় উঠছে আকাশে বাতাসে
ছায়া সরে যাচ্ছে ধীরে রাত্রি নামছে
গভীর গোপন

কিন্তু ভালোবাসা, হায়, কোথাও ভালোবাসা নেই ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

নিষ্ঠুরতা

'আসি' বলে তুমি চলে গেলে। ঠোঁটের ভেতরে ঠোঁট
নিমেষের ভেতরে নিমেষ রেখে
উড়ে গেল পাখি।
এ রকম নিষ্ঠুরতা কতকাল ঘটে যাচ্ছে প্রহরে প্রহরে—
সাক্ষী থেকো হে ঈশ্বর,
সাক্ষী থাক্ তোমারই বিষণ্ণ দুটি আঁখি।

উৎসর্গ

বহুদিন কেটে গেছে, আরো যাবে অবিশ্বাস্য সুখে ও অসুখে-
তুমি নেই। তবু কাটে দিন, কাটে রাত।
এবং দুর্দিন
সহসা এলেই মনে পড়ে
পূজোয় বলির পাঁঠা এবারও লাগবে ছয়, সাত।
ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে ঋণ, হাওয়া নেই, বাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
তোমাকে এসব বলা বৃথা। দেনা শুধতে
প্রিয় রাজহাঁস
এবারও বিলিয়ে দিতে হবে।
বাকি থাকবে দু ফুট আকাশ।
তাও দেব দেবতার নামে এবং যা বাকি থাকবে, সব!
আগামী দুর্ভিক্ষে দেব অবশিষ্ট একমাত্র শৈশব।

উঁচু থেকে দেখা

সেবার উঠেছি আমি রাজগীর পাহাড়ে,
আহা, দেখেছি মানুষগুলি, কোথাকার রাজা যেন সেপাইসমেত ছিল
নিচু পথে—পথের বাঁ ধারে।
উঁচু থেকে মনে হল কত ছোট ! ছোট !
আছি নিম্ন-সমতলে তোমাদের বাগান বাড়ির নিচু খাদে।
ইচ্ছে হয়, তোমাদের কার্ণিসে দাঁড়িয়ে দেখি—
আছি কি এখনো তত বড় ?

সোমেনের প্রতি সতর্কতা

সোমেন, তুই তো এখন পথ হাঁটছিস
সহরতলির বাজার দেখতে দেখতে অরণ্যের দিকে।
যা, সন্ন্যাসের সময় হলে সকলেই যায়,
সমতলে বিছিয়ে রাখিস ভালোবাসা।

বলা যায় না,
হয়তো হঠাৎ করে তোর মনে পড়ে যাবে, বয়স বাড়ছে।
কিংবা অতর্কিতে ভাববি ছেলেবেলার সেই আকাশটার কথা
তখন তুই রাস্তা চিনবি কেমন করে ?
যা, সন্ন্যাসের সময় হলে সকলেই যায়,
সমতলে বিছিয়ে রাখিস ভালোবাসা।

এখনো মানুষ

মানুষ এখনো কাঁদে, কান্না আজও ভালো লাগে বলে
বাসা বাঁধে, ভালোবাসে, কিবা দুঃখে
আবছা করে ঘর।
কখনো বিস্মৃতি আসে, কখনো বা প্রতিশ্রুতি
অবিশ্বাস্য তারা হয়ে জ্বলে—
আকাশ উন্মুক্ত হয় অসুখের পর।

কি করে বোঝাই তাকে

চতুর্দিকে চোখ রেখে রাস্তা হাঁটে বুড়ি,
এখানে গাছটা তো নেই, ছিল যে অশ্বত্থ এক, ছিল তার ঝুড়ি
ওখানে চড়ক হত, পুকুরের ধারে ছিল প্রকাণ্ড বকুল—
সে গাছটা কোথায় গেল?
ওখানে ফোটে না কেন ফুল?

রাস্তা আঁকাবাঁকা
ছিল না এখানে কোনোদিন, ছিল যে সবুজে নীলে ঢাকা!
সে সব কোথায় গেল? সোজা পথ?
পুনরায় প্রশ্ন করে বুড়ি।

কি করে বোঝাই তাকে শহর করেছে সব চুরি?

মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী

ভূমিকা অনুবাদ অনুসঙ্গ : নিখিলকুমার নন্দী

কলকাতা ১৮৪২। হিন্দু কলেজ ইয়ংবেঙ্গল মধুসূদন দত্ত ও গৌরদাস বসাক। 'সেকাল' স্বকালের অষ্টাদশবর্ষীয়ান যুবকদের ক্রোধ বোধ দ্রোহবুদ্ধি বিদ্রোহ ; সঙ্গে কবিব্যক্তি ও ব্যক্তি কবিত্বের স্ফুরণ স্ফুলিঙ্গ বাসনা ও ব্যসন 'বলীয়ান রোদ ও আমোদ—'সেকাল-একালের অচলায়তন ও সচলমতি গতির সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব বেগ বিরোধ আবেগ সঙ্কট কত বিচিত্র শ্রুতি প্রতিশ্রুতি, কত অতিশয়োক্তি, কত উচ্ছল সচ্ছল উচ্চারণ। একটা উথাল-পাথাল পর্বান্তর। একটা সমুদ্রমন্থনের উত্তাল উচ্ছ্বসিত উদ্বেগ। গোটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যক্তিত্ব চারিত্রের বৈভব ও বিষণ্ণতাবত সঙ্কলিত নবীন প্রবৃত্তির নাটকীয় ইতিবৃত্ত—একটা বিশিষ্ট বিশিষ্টতম অয়নচিত্তের বলয় বদলী তারতম্য তৎপর সচেষ্ট প্রাণবত্তা—বহু ক্রম ও উপক্রমে জড়িত, বহু দুঃসাহসী গ্রন্থীসেবনে আলোড়িত, বহুতর রাতের অবরোধ প্রতিরোধে সংক্ষুব্ধ-স্বগত জীবনে, জীবনগত কাব্য-নাটকে, নাট্যকাব্যগত জীবন, যৌবন ও সমাধিতে প্রছন্ন, আসন্ন এক মাহেন্দ্রক্ষণ, দুর্মূল্য যুগমুহূর্ত, অস্ফুট-প্রস্ফুটনের লগ্ন, সংক্রান্তির, 'আত্ম-প্রকাশ'--একটা দুর্লভ যন্ত্রণা উজ্জ্বল"নগ্ন" আত্মপ্রকাশের' সংক্রান্ত ক্ষণ : "The poetarouses with a naked sword"। অদ্ভুত আমোদে আনন্দে অস্থির সেই বয়স, সেই কাল, সকাল, সেই আকুতি, ব্যাকুলতা। সংকল্প ও সম্ভাষণ। সঠিক ও অমোঘ কবিকল্পনা, তার উপযুক্ত উচ্চারণ, ভাষা ও প্রকাশ তখনো তাঁকে জিতে নেয়নি, তবে আক্রমণ করেছে—করেছে ; বিভ্রমে শোধনে পতনে উত্থানে নির্ভুল নিশানায় সেই

[হিন্দুকলেজ কাল : গৌরদাস বসাককে লিখিত]

যুগন্ধর কবিব্যক্তিসত্তা এগোচ্ছে বিদ্যা-চিত্ত-প্রতিপত্তি পেরিয়ে (এড়িয়ে নয়, বরং জড়িয়ে ও ছাড়িয়ে) - কল্পনা প্রতিভার সুনিশ্চিত সন্ধানে, বিনিদ্র সাধনায়, অপ্রকৃতিস্থ প্রায় দুরন্ত পরাক্রমে ও প্রকৃতিস্থ প্রত্যয়-বান সিদ্ধার্থে ঃ "যাদঃপতি রোধ্য যথা চলোর্মি আঘাতে"।

অথচ অতঃপর-গুরুতর তখনো অসাধিত, কিন্তু অসাধ্য নয়, মনে হয়। তথাপি প্রায় সার্ধযুগকাল-পরে তিনি সেই কবিকামনার মোক্ষধাম' অত পরার্থের মহালক্ষে পৌঁছবেন, মীলার্মে যার কথা এড্গার অ্যালান পো উপলক্ষে লিখেছিলেন ঃ 'Giving a purer meaning to the words of the tribe'। কিন্তু সে তো কথার কথা নয়। তাই তার প্রস্তুতি-পর্বও কি কম স্মরণীয় ? সেই হিন্দু কলেজ 'দ্বিতীয় শ্রেণী জ্যেষ্ঠ বিভাগ' থেকে সাময়িক ও চির পলায়ন ? 'ওল্ডচার্চ' ফোর্ট উইলিয়ম হ'য়ে বিশপ কলেজ পিতৃশাসন এবং 'মাতৃক্রোড়' থেকে সেই মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাস ? তারপর পুনরাবর্তন, প্রত্যাবর্তন — কলকাতায়—কলকাতা, আবার ! এবং অতঃপর উদ্যোগ, উদ্যম, জয় ! 'রিবেল' থেকে 'রিভোলিউস্যনরী' রূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আত্মত্যাগ ! সেজন্য নিরন্তর যুদ্ধ, ক্ষত, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব—'O strugg'e of the hostile earth and ether !'

তারই আংশিক, তবু অনেকখানি স্পন্দন, স্থির ও অস্থিরচিত্র ধ্বনি-প্রতিষ্ঠান, এই প্রিয়তম বন্ধুসমীপস্থ পত্রাবলীর ছত্রেছত্রে আভূমিহৃৎ-কম্প সমেত বিধৃত, বিকিরিত, মূর্ত। যথাসাধ্য বিশ্বস্ত তবু স্বচ্ছন্দ-স্বাধীন অনুবাদে সেই অমূল্য আলেখ্য ও দলিলের প্রতিলিপি এখানে সমগ্রতায়-প্রথম বিন্যস্ত হলো। স্মরণীয় যে, গৌরদাসের মধু তখনো 'মাইকেল হন নি'—বর্ষমধ্যেই হবেন—তখনো তিনি এম. এস. ডি. বা ম, স, দ, এবং কখনো শুধু নির্ভেজাল 'দত্ত,' নিরলঙ্কৃত। কিন্তু নিরহঙ্কার নন। তা যে আদৌ অসম্ভব। কারণ সেই তো তাঁর দোষ গুণ মাহাত্ম্য ও গৌরব, তাঁর রূপ ও স্বরূপ। সুতরাং তা-ই, তাও আমাদের অতঃপর সহ-প্রসঙ্গত দর্শনীয়, লক্ষণীয়, লভ্য।

এই পত্রাবলীর ১ থেকে ৭ তারিখ হীন চিঠি। দিনচিহ্নহারা, কিন্তু দিকচিহ্নহীন নয়। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে একটির রচনাকাল ১৮৪১ শেষার্ধ থেকে ১৮৪২ প্রথমার্ধ। বাকি-সব নিশ্চিতভাবে ১৮৪২]

১.

প্রিয় বন্ধু,

কোনরূপ দাক্ষিণ্য-যোগ্য ছেলে তুমি নও। কতবার তুমি আমায় নিরাশ করেছ তা তো বেশ জানো। যা হোক তোমার সুবিধা মতো যে-কোন সময় এলে আমি খুশী হবো। বাবু বি, এন ১কে আমার অভিবাদন জানিও। গতকাল মিঃ কার ২যে পদকটি ৩আমায় পাঠিয়েছেন, তা পেয়েছি। আজ যে রবিবার, গৌর, তাই আর-কিছু তোমায় লিখতে পারছিনে। মাপ কোরো।

ইতি ঃ তোমার নিয়ত,

ভালো কথা, আমি একটি দীর্ঘ কবিতা ৪লিখছি।

২.

প্রিয় গৌর,

ভ্যাখো বি, ৫ক ও এম, ৫খ কে যদি সঙ্গে আনতে না পারো, তবে আজ সন্ধ্যায় এসো না, মানে আমার নৈশ-ভোজে। অবশ্য তুমি দেখা করতে আসতে পারো স্বাগতম্। এসো। আমার পদকটী ৫বাবার কাছে আছে—একটি কাব্য ৬প্রেসে পাঠাবার কাজে আমি খুব ব্যস্ত রয়েছি (প্রকাশের জন্য নয়, কেবল একটি প্রুফ কপির 'আত্মনেপদী' গরজে)। বলাই ৭কে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আজ সন্ধ্যায় তুমি না এলে অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত হবো। তোমায় আমার অনেক কথা বলার আছে। এই কাগজের অন্য পিঠে বি ৫কের জন্য একটু করে লেখা যাচ্ছে।

ইতি তোমার

৩.

প্রিয় গৌর,

তোমায় গত পত্র লেখার পর থেকে আমি খুবই দুর্ভাগ্য ও মর্মপীড়িত আছি। প্রথমত, আমার বেচারী মা অসুস্থ; দ্বিতীয়ত, কলেজে আমার অন্যতম বন্ধু ৮একরূপ শেষ শয্যায় শায়িত। গত চারদিন যাবৎ আমার এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। কী আর করতে পারি? প্রিয় গৌর, আমার সঙ্গে তুমিও ধৈর্য্য ধরো, শীঘ্রই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইতি তোমার স্নেহার্থী

৪

বাবু তোমার জানা উচিত যে, আমার অধীনে আর পঞ্চাশটি লোক হুজুরে হাজির হয়ে নেই যে, আমি যা খুশি তাই করতে পারি, যেখানে খুশি যেতে পারি। অনন্ত কালাবধি তোমার টুপিটি আমার সঙ্গে রয়েছে। এমন কেউ আমার কাছে ছিল না যে, সেটি তোমায় সরাসরি পাঠিয়ে দেবো। এই বিলম্বের জন্য মার্জনা চেয়ে সেটি এখন পাঠাই; আর এই আশ্বাস সেই সঙ্গে যে, (যদিও তুমি আমায় ভুলে গেছ) আমি তোমায় একদা যেমন সাগ্রহ স্নেহে ভালবাসতাম, এখনও ঠিক তেমনি বাসি।

ইতি প্রকৃতই তোমার

৫.

বাবু গ, দ, বসাককে বাবু ম, য, দত্তের অভিবাদন সহ সবিনয় জ্ঞাতব্য এই যে, সময় ও কিছু অর্থের বিসর্জনে সে এখানে এসেছিল— বাবু গ-র সঙ্গলাভে আনন্দিত হ'তে। এমন মনে হওয়া সর্ব্বৈ উচিত যে, বাবু গ, আজকাল সচ্ছন্দে বাড়ি না থাকতেই অদ্ভুত ভালবাসে। বাবু ম, তাই তার নৈরাশ্যের তীব্রতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে হয়রান। কিন্তু সে যাই হোক, এই যখন অবস্থা, বাবু ম-র 'প্রস্থান' ছাড়া গত্যন্তর নেই। সে একা-একা ব'সে থাকতে পারে না।

৬.

প্রিয় গৌর,

অস্বীকার করতে পারি না যে, তোমার অনুযোগের কারণ আছে, কিন্তু ব্যাপারটা এই—আমি স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুবই উদ্বেগজনক ভাবে বিগড়েছি—শিরঃপীড়া ইত্যাদি ইত্যাদি—প্রাচীন যন্ত্রণাকর উপসর্গগুলি গত সারা মাসটাই আমায় বিব্রত করেছে; তাছাড়া আমার সময় কাটছে অত্যধিক ব্যস্ততায় পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছি! সে-বিষয়ে তুমি কী বলো, যেমন লাতিন কবি বলেছেন, O tempus! —O mores! অর্থাৎ সাদাসিধে ইংরিজিতেঃ 'ও! দি টাইমস্! ও! দি ম্যানারস্!' (সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই!)। ভালো কথা, ক'দিন আগে এক সন্ধ্যায় আমি যে তোমার ওখানে গিয়েছিলাম সে বিষয়ে তোমার জাহান্নমী ভৃত্যবর্গ কিছু তোমায় বলে নি ব'লেই আমার ধারণা। তুমি বেরিয়েছিলে। আচ্ছা, আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় যুবকদের মধ্যে এখন যে-দোষগুলি অত্যন্ত প্রবল, সে-সবে তুমি নিজেকে জড়াচ্ছো না তো-কেমন আশঙ্কা হচ্ছে! তুস্—গুলি মারো, কী যে ছাই লিখছি আমি নিজেই জানি না—আমার মাথার কোম ঠিক নেই—তা ব'লে ভেবো না যে আমি মাতাল হয়েছি। আসলে বাত, গেঁটে বাতের ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলছে আমার উপর—বেচারা হাড়গুলোকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

ইতি তোমার
বাতাক্রান্ত ব্যথাকাতর

৭.

হয়তো আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার সাক্ষাতে আসছ না—আমি গেলে আশা করি যাবো—উপরতলার হল ঘরে থাকবো। সেখানে তুমি "পাশ" ছাড়া যেতে পারছ না। ডি, এল, আর, ১আমায় একটি দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে চাই নি—কারণ আমি জানতাম

না যে, তার দরকার আছে। তোমার জন্য যে আর-একটি চাই নি সে-বাবদ শোচনা হচ্ছে। তুমি গেলে আগে ভেগে যেয়ো। ডি, এন, আর ৯এর দরজায় দাঁড়িয়ো। আমি সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা করব এবং সম্ভব হ'লে একটি পাশ জোগাড় করবো।

ইতি তোমার : হিন্দু কলেজ

৮.

সত্য প্রিয়তম গৌর! অবশেষে আমার ওপর কশাঘাত উঁচিয়ে ঝড় এসে পড়ল! আমার এই স্বস্থান ছেড়ে আজ রাত্রেই দেশের বাড়ীতে প্রস্থানের নির্দেশ এসেছে! কিন্তু হায়! কোথায় আমি যাই? হৃদয়কে খুলে-মেলে ধরার ক্ষমতা যদি থাকত, তোমায় দেখাতে পারতাম আমার অনুভূতির অবস্থা! ভাষায় তার বর্ণনা অসাধ্য! আমার ভালবাসার বন্ধুদের ফেলে যাওয়া—বিশেষত সেই একজনকে (বলো তো সেই "একজন" কে)—ভাবতেও আমার হতভাগ্য হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি কি কবির ভাষায় আক্ষেপ করে বলতে পারি—"হায় দুর্বহ? হায় দুঃসহ দুঃখ!" তোমায় যদি সাক্ষাতে পেতাম কিন্তু হায়, তা হবার নয়! অনুমতি নেই! প্রিয়, সুপ্রিয় গৌর!—প্রিয়তম বন্ধু! আমায় যেন ভুলো না!

আজ রাত্রে যদি যাত্রা না করি, কাল কলেজে দেখা করব। বেলেঘাটা যখন যেতেই হবে, সেখানে যাওয়ার পথে একবার কলেজে নেমে যাব। মি, কার-এর কাছে (সই) সর্বনেশে পত্র কাল যাচ্ছে। তোমার বায়রণও কাল ফিরিয়ে দিচ্ছি। বিদায়! জানি না কবে আমি দেশের বাড়ি থেকে ফিরব। মেকানিক্সে১২ (গিয়ে) হরিশকে১২ আমার অভিবাদন জানিয়ো। 'চিরবিদায়' ইতি প্রিয়তম গৌর, আমি তোমার সেই চিরবাধ্য, চিরানুরক্ত কিন্তু ভাগ্যহত বন্ধু।

খিদিরপুর, রবিবার

৭ই আগষ্ট ১৮৪২

পুঃ এতৎসঙ্গী "ফরগেট্ মি নট"-এর কপিটি তোমাকে উপহার। বাঁধিয়ে দেওয়ার সময় পেলাম না। দোহাই, আমার নামে নিজেই বাঁধিয়ে নিও। এটি হতভাগ্য উপহার-দাতার শ্রদ্ধা সম্মান ও প্রীতির নিদর্শন।

৯.

নিত্যপ্রিয় বন্ধু,

কোন অতি-গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়াই তোমায় লিখেছিলাম ব'লে আমায় অবজ্ঞা কোরো না। বোলো না—"তোমার লোকটি গৌর গৌর করে অতিষ্ঠ হ'য়ে আমার কাছে এসেছিল" এবং ইত্যাদি আর সেই একদা-প্রদর্শিত কাটা-কাটা, ক্ষতাক্তকর, তীক্ষ্ণভেদী, খুনে ও শূল বেঁধা ভঙ্গিতে যেন কখনও না। এ পর্যন্ত কোন কবিতার ভূমিকা - প্রস্তাবনা—গৌরচন্দ্রিকা—অথবা তোমার মন যা চায় তাই বলো। প্রিয় গৌর তোমায় আমি দীর্ঘকাল দেখি না—দীর্ঘকাল, আমি বলছি। এবং হয়তো আরও কয়েকদিন দেখার আনন্দ (আহা, গ্রাম্য শব্দ আহ্লাদ এর চেয়ে এটি ঢের বেশি মনোরম) থেকে বঞ্চিত হবো। আমি চলে যাচ্ছি, যশোরে নহে, বাবার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কাছে। তমলুকের রাজা। গত বুধবার মেকানিক্‌সে১০ গিয়েছিলাম—অঙ্কন শিখতে নয়—"আহা, তার চেয়ে—তারও চেয়ে ঢের বেশি উল্লাস সন্ধানে !! অর্থাৎ তোমায় দেখতে। কিন্তু দরজা বন্ধ ছিল। ভালো কথা, আমি এখনও "গ্রিনার"১২ পাইনি। ভিখিরী কারী ১২খ তো সেটি আমায় পাঠায়নি, যদিও আমি তাকে লিখেছিলাম। আজ আবার লিখছি। তুমি কি ব্লসম্ ১২খ পেয়েছ (আমি পাইনি) দোহাই আমায় পাঠিও। হা ঈশ্বর, তোমার কী একটা খবর দিতেই না ভুলেছি, ছাখো—গত মঙ্গলবার'ব্ল্যাকউড-এর১২ সম্পাদকের কাছে আমি কিছু কবিতা পাঠিয়েছি ! যেমন ইচ্ছা ছিল তেমন করে হয়নি, কবিতাগুলি তোমার নামে উৎসর্গিত, উৎসর্গ করেছি কবি উইলিয়ম

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে আমার উৎসর্গ-পত্রটি এরূপ দাঁড়িয়েছে, এই কবিতা-গুলি তাঁর প্রতিভার একজন বিদেশী সমঝ্‌দার কর্তৃক সশ্রদ্ধচিত্তে উৎসর্গিত হলো। মিঃ উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিবরেষু—লেখক।” হায়, কী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় না আমি নিজেকে ন্যস্ত করেছি! এই ভাবছি, সম্পাদক এগুলি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন, আবার মনে হচ্ছে, তিনি এগুলি বাতিল ক'রে দেবেন।

কাল কি তোমার সাথে মেকানিক্‌সে১০ আমারদেখা হবে? আমার দোহাই ভাই, এসো। প্রসঙ্গত, তুমি তো আচ্ছা নির্বোধ, অবিবেচক লোক হে, আমার দীনজন কুটীরে তোমার পবিত্র পদস্পর্শের কথা দেখছি তুমি ভুলে গেছ! কবে তা করছ? যদি তা না করো তো তোমার বা রাজকেষ্টোর১৪ সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ হবে যথার্থই শেষ। কত বড় চিঠিই না লিখে ফেললাম! কিন্তু তোমায় লিখতে বসার ইচ্ছা নিয়ে কলম ধরলে তো অন্যথারও উপায় পাই না। বি, বি, ডি, ১৪ক কোথায়? ভিখিরীটা কি বাড়ি গেছে? আমার ইউট্রোপিয়াস (লাতিনে লেখা রোমান ইতিহাস) কোথায়? গৌর, তুমি এই ছুটিতে কোন-একদিন আমার কাছে এখানে না এলে তা আমার পক্ষে হৃদয় বিদারক হবে—নাঃ তবে আমিও সেই মাটিতে আর পা রাখব না, যেখানে জনৈক বসাকের বাড়ি দাঁড়িয়ে। ইতি অভি-বাদন-ধন্যবাদ-সম্মান-প্রীতি-সম্ভাষণ-স্নেহসহ, প্রিয়তম গৌর, প্রকৃতই তোমার।

খিদিরপুর ৭ অক্টোবর' ৪২

পুঃ তোমার বায়রণ দ্বিতীয় খণ্ড ও ক্র্যাব-১৫ এই সঙ্গে ধন্যবাদ সহ ফেরৎ যাচ্ছে।

১০. খিদিরপুর ১৩ অক্টোবর ১৮৪২

প্রিয়তম গৌরদাস, তোমায় একথা জানাতে আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত যে, একটি অশ্রুত, অভাবিত, অকল্পিত উপলক্ষ এসে আমাদের

সেদিনের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। আমার এক জ্ঞাতিভাই ১৬
অসুস্থ—ভীষণ অসুস্থ—সংক্ষেপে, পীড়ার অন্তিম পর্যায়ে সে শায়িত :
বেচারা! আমি তার কষ্ট দেখে সত্যই অভিভূত।

আচ্ছা, আসছে কার্ত্তিক পূজার ভাসানদিনেই তবে—বিশ্বাস করো
জাগতিক কোনকিছুই আমাদের ঠেকাতে পারবে না। তোমার কোন
বন্ধুকে যদি সেদিন (আগামী সোমবার) সঙ্গে নিতে চাও মনে রেখো,
উদারপন্থী বন্ধু শ্রেণীর যেন হয়। কারণ, মহদাশয় গৌর, আমার
তোমার সান্নিধ্যে সুরাদেবতার তর্পণ করি—এটুকু আনন্দের উপভোগ,
কী বলো—এর আগে কখনো যা করিনি। সেদিন নিশ্চিত জানি,
তুমি আমায় নিরাশ করবে না। ঐদিন, ঐ ঘটনাচিহ্নিত দিনে—
আমাদের নৈশ ভোজ আসবে মারস্ অ্যাণ্ড স্টোন্ থেকে। বজরায়
একটিমাত্র বন্ধুকে আমি সঙ্গে নেবো—মানুষটি (মানে যুবকটি)
তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনায় মরছে। সে আমার সঙ্গী—
আমার সাকরেদ। এর থেকেই তার প্রকৃতি তুমি বিচার করবে।
এবিষয়ে বিস্তারিত লিখবে : ভালো কথা, আজ আমাদের
"পবিত্র সঙ্কেতস্থানে" ১০ দেখা হচ্ছে না? 'প্রেক্ষিতাঙ্কণ' আমার
পছন্দ নয়; কিন্তু তোমার চোখের মতো অমন মনোহর
দৃষ্টিভক্তির গৌরব যেখানে বিরাজ করবে, সেখানে যাওয়ার প্রলোভন
দমাতে পারে কোন্ শয়তান? সেই দৃশ্যসুখে বিমুখ হওয়া?—আমি
পারব না, আমায় বিশ্বাস করো, আমি তা পারব না। শেক্সপীয়র
ও হরকরা ১৭ আজ পাচ্ছো না—কাল পাবে! বন্ধুদের কাছে বাইরে
আছে। হয়তো মেকানিক্সে (আমাদের 'সঙ্কেতস্থান'—পুণ্যক্ষেত্র!)
সেপুটি পেয়ে যাবে। কিন্তু না—আর ভাঁড়ামি ও তামাসা নয়।
গম্ভীর হওয়া যাক্। "পেচকসুলভ গাম্ভীর্যে" আশ্বস্ত করি তোমায়
আমি প্রকৃতই তোমার।

পুঃ ল্যাভেণ্ডারের জন্য লোকটিকে বলেছি।—আশা করি এই চিঠি
তুমি সানন্দে পড়বে।

১১· খিদিরপুর

তোমার গত শনিবারের গর্জনবহুল পত্র আমার কাছে বজ্রপাতের মতো হাজির হয়েছে। আঃ, কত না দুরু দুরু বুকে আমি সেটি পড়েছি! প্রতিটি পঙক্তির প্রতিটি শব্দে ঝঙ্কৃত হচ্ছে ক্ষোভ-ক্রোধ-জাহান্নম-মৃত্যু ঠিক কথা, আমি দোষ করেছি, আর সে জন্য আমি বারবার ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার বন্ধুরা যদি ভদ্রলোক হন, আশা করি তাঁরা তা-ই, "একগুচ্ছ উদারপন্থী জীব"—যেহেতু তাঁরা তোমার বন্ধু, আমার ত্রুটিজনিত দুঃখ স্বীকার স্বচ্ছন্দে মেনে নেবেন। আগামী কাল বিশ্বাস করো জাগতিক কোনো কিছুই কোনো কিছুই আমার সম্মান পুনরুদ্ধারে বাদ সাধতে পারবে না; জগন্নাথঘাটে নৌকো থাকবে এবং আমি দশ, এগারো, বারো, এক দুই অথবা তোমাদের সুবিধামতো যে ঘটিকায় বলো, যাবে, মিলিত হবো, ভেসে পড়ব কেননা (এখান থেকে) আমার পক্ষে একেবারে নৌকো নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। প্রসঙ্গত, আজ এক গৌরবের দিন তামাশা১৮ দেখতে গেলে কেমন হয়? যদি তাই যাও তো জানাও আমি সন্ধ্যা ৭টায় তোমার কাছে পৌঁছে প্রমোদভ্রমণে রওনা হয়ে পড়ি!
প্রিয় বন্ধু, মিনতি করে বলছি, এতে যেন নিরাশ কোরো না। কাল যে ভোজ্যবস্তু আমি সঙ্গে নিতে চাই তাহলে (যদি চাও) বিস্কুট ও মাংসের পাটিসাপটা। মনে রেখো সাপ্টাগুলি কাঁচা মাংস দিয়ে তৈরী১৯ তোমার হরকরা ১৭ ও শেকসপীয়র ধন্যবাদসহ ফেরৎ দিচ্ছি: আশা করি এ-পত্রের কোন ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর তুমি লিখবে না।
নম্র হও; গৌরদাস যাকে বলে তোমায় অনেকদিন আগে যেমন বলতাম—"অমায়িক ভদ্রলোক'। আমার জ্ঞাতিভাইটি ১৬ এখন অনেক ভালো। ইতি তোমার

তমলুক ৩রা কার্তিক ১২৪৯ মঙ্গলবার সকাল

১২.

নিত্যপ্রিয় বন্ধু

পঞ্চাশ মাইলের দূরত্ব থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি; সপ্তমী পূজোর দিন, না, রাত্রে আমি পিতার সঙ্গে কলকাতা ত্যাগ করি এবং নবমীর দিন সকালে এখানে এসে পৌঁছাই। সর্বোত্তম সমাদরে আমরা স্বাগত হয়েছি। এখানে একটা চমৎকার যাত্রা হলো···বিশ্বাস করো গৌর, যদিও সর্বাধিক সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমাদরে আমরা গৃহীত হয়েছি, কিন্তু আমি কলকাতার জন্য বাসনায় মরছি; আমার যাবতীয় আনন্দ-স্বপ্ন অর্থাৎ আমার গৃহে তোমার আগমন এবং তোমার ওখানে আমার উপস্থিতি আলনাস্পরের দুর্গবৎ উধাও হয়েছে। তাই ভাবছি বার্ণস ২০ক যথার্থ বলেছেন:

> "সর্বশ্রেষ্ঠ ছকে ফেলা মূষিক ও মানুষী জল্পনা"
> —কী রকম প্রায়শই ভেসে যায়—

(দ্বিতীয় ছত্রটি মনে পড়ছে না) এখানে আমি কেবল খাইদাই ঘুমাই, আর মাঝে মাঝে ক্যাম্বেলের ২০খ অল্পস্বল্প এবং 'ইতালির চিঠি' নামের একটি বই থেকে কিছু কিছু পড়ি ব্যস, আর কিছুই করি না।

এখানে আমাকে তোমার কিছু লেখার দরকার নেই; আগামী সোমবার কলেজে তোমার সঙ্গে মিলছি; ভালো কথা, এই ছুটিতে তুমি তো কই আমার গৃহকে তোমার 'রাজকীয় উপস্থিতি' দিয়ে সম্মানিত করোনি! কিন্তু (মনে রেখো) কার্ত্তিক পূজা, শ্যামা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি অন্যান্য উপলক্ষ দ্রুত এসে পড়ছে। এখানে আমার একটি ছোট্ট প্রণয় ব্যাপার ঘটল:—তবেই দেখছো আমি সাধু সন্ন্যাসী থেকে একেবারে নিশ্চিত লম্পটে পরিণত হচ্ছি। (বুঝলে তো) বি, বি, জি ওখানে থাকে তাকে আমার অভিবাদন জানিও। আর তোমার প্রিয় পিতৃব্যকে আমার কথা বোলো। আমাদের স্কুল

খোলার আগে তোমার ওখানে গিয়ে তোমায় অবাক করে দেব, ইচ্ছা আছে।

আমি পূর্ববৎ তোমারই আছি। থাকবোও চিরকাল। ইতি প্রকৃতই তোমার।

১৩.

প্রিয় গৌরদাস,

তমলুক থেকে এই আমার শেষ চিঠি তোমাকে লিখতেই হচ্ছে সম্ভবতঃ আজ রাতে এই নোংরা জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, তবে আসি খুব শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে। বিদায়।

ইতি তোমার

তমলুক ২০শে অক্টোবর, ১৮৪২

১৪.

প্রিয় বন্ধু,

তমলুক, শুক্রবার

গত শুক্রবার যে চিঠি লিখেছি আশা করি তা ইতিমধ্যে পৌঁছেছে। সে চিঠিটা সম্ভাব্যে সর্বাধিক ব্যস্ততার লেখা হয়েছিল। আমার মনে পড়েছে তোমায় লিখেছিলাম যে, আজ রাতে রওনা হচ্চি; কিন্তু তা হয়নি; এমনকি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তা হ'তে পারবে এমন আশাও দেখছি না। আমি জানি, আগামীকাল আমাদের স্কুল বসছে; কিন্তু কলকাতায় উড়ে যেতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখন আমি এই নোংরা জায়গায় বাবার সঙ্গী হয়ে আমার ইচ্ছায় আমার সম্মতিক্ষণকে শাপান্ত করছি। কাল যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছেনা সে কথা ভেবে আমি মর্মাহত; কিন্তু গৌর, আমার একটি সান্ত্বনা আছে। আমি সেই সমুদ্রের আরো কাছে এসেছি

যা কিনা একদিন (মনে হয় সেদিন সুদূর নয়) ইংলণ্ডের গৌরবময় উপকূলে তার বুকে পথ কেটে আমায় পৌঁছে দেবে হয়তো। তখন থেকে সমুদ্র খুব দূরে নয় কতগুলিই না ইংলণ্ডগামী জাহাজ আমি দেখলাম। যাক বিষয়ান্তরে আসি। যে-ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পাইনা তাকে লিখে যাওয়াটা ঝকমারি কাজ। এজন্য যে লেখক জানতে পাননা যাঁকে তিনি লিখছেন এতে তাঁর মন বিরক্ত হচ্ছে, না, খুশী। অবশ্য, না গৌরদাস কখনোই এমন অলস আশংকাকে প্রশ্রয় দিইনা দিতে পারিনা যে তুমি আমার এহেন নিত্য পত্রচালনায় বিরক্ত হচ্ছো, যদি হও, দয়া ধর্মের দোহাই, তা গোপন রাখো। এখানে অবস্থার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই, আমায় চিঠিপত্র লিখোনা কিছু। তোমার থেকে এত দূরে যত সুখে আমি থাকতে পারি, ততটাই আছি আর কী! বিশ্বাস করো আমি তোমারই। দত্ত।

পুনঃ যদি কোন ভুল ভ্রান্তি করে থাকি তো মাপ কোরো। সময়ভাবে যে কী লিখেছি তার বিচার আর অসম্ভব ।

ম. স. দত্ত

১৫.

প্রিয় গৌরদাস, তমলুক। ২৮ অক্টোবর ১৮৪২

তোমায় যে চিঠিপত্র লিখছি, পাচ্ছো তো? বিশ্বাস করো, এই যে ব্যথাদীর্ণ অনি শ্চয়তা এর চেয়ে ক্লেশকর, যন্ত্রণাদি আর কিছু নয়। তোমার কোন দোষ নেই। আমি নিজেই লিখতে নিষেধ করেছি তোমায় যেমন দেখে এসেছি, যদি তুমি সেখানেই অবিচল থাকো অর্থাৎ আমার জন্য ভাব ও অনুভবে যদি ইতিমধ্যে কোন মহাবিপ্লব ঘটে না থাকে, তো এই নিত্যপত্র চালনায় তোমার বিরক্তি সম্ভাবনায় অলস আশঙ্কা ভিত্তিহীন। অন্যপ্রসঙ্গে আসি। তোমায় জানাতে দুঃখ হচ্ছে যে,

ইংরেজি ব'লে যেটুকু আয়ত্ত করেছিলাম তার অর্ধেক এর মধ্যে ভুলেছি কবিতা লেখার সামান্য শক্তিও গিয়েছে। এবং জেনে রাখো, সম্প্রতি কোন এক বিষয়েকটি পদ২১ লিখতে চেষ্টাও করছিলাম। প্রায় চারঘণ্টা সময়ে একটি ছত্রও প্রকাশ পায়নি২১। হয় তোমার সঙ্গে আমার কাব্যলক্ষ্মীকে ২১ রেখে এসেছি অথবা তিনি আর নেই। (অবশ্য) ভেবো না যে, আমার "দিন শেষ হয়েছে।" আমার বিশ্বাস, যেখান থেকে আমি লিখছি সেই তমলুকে কলালক্ষ্মী ২১ "আবির্ভাবে নারাজ।" কিন্তু কলকাতা গিয়ে আমি তোমায় কবিতার বন্যায় ডুবিয়ে দেব। তমলুক থেকে এই আমার শেষ চিঠি, মনে হয়। আমরা আজ রাতে অথবা কাল রওনা হচ্ছি। আচ্ছা তবে আগামী সোমবার কলেজে দেখা হচ্ছে। নিশ্চিত থেকো। আর জেনো আমি তোমার নিত্য প্রকৃত, স্নেহার্দ্রতম

ম· স· দত্ত

১৬· খিদিরপুর। ২৫ নভেম্বর ১৮৪২। রাত্রি

প্রিয় বন্ধু,

আশা করি তোমার মনে আছে, ডি, এল, আর৯ এর অনুপস্থিতি কালে কলেজ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত, আসলে বাসনার কথা আমি একবার প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছিলাম। এখন আমি মনঃস্থির করেছি, ডি, এল, আর৯ এর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, তা সে যতদিনই হোক, আমি কলেজ যাচ্ছি না। আমায় ভালোবাসে ও আমি ভালোবাসি এমন গুটিকয় প্রাণী ছাড়া কলেজীয় কোন সতীর্থ সম্পর্কেই আমার কোন মহানুরাগ নেই এবং আমি পাপিষ্ঠ কার২ কে ঘৃণা করি। এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না—কিছুই যাবে আসবে না—

হুত্তোর ওই তোর বিদ্বানের যশ।

বৃত্তি আর পুরস্কার, ধিক্ মনস্কাম।

একটি মাত্র প্রবল প্রীতির আকর্ষণ যা ব্যতিক্রম আমার পক্ষে সে-ই হবে বঞ্চনা, তোমার সঙ্গ সুখের মাধুর্য যাকে আমি এত তীব্র ক'রে চাই, সেই তার বিরহ। তোষামোদের মতো শোনালেও এ তা নয়, এ সত্য। এই বিশাল পৃথিবীতে; তোমার মতো আর কাউকে এত মূল্য আমি দিই না: তোমার মধ্যে মহত্ত্ব, নির্লিপ্তি, কোমলতা, ঔদার্য ইত্যাদি যাবতীয় গুণের সমাবেশ আমি দেখেছি। বৎস, ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন! এই আমাদের 'ছলনাজাল' জড়ানো জগতে তোমার ঐ সদন্তঃকরণ, প্রকৃতমিত্রের মহৎপ্রাণতা আমার পক্ষে এক আশাস্বপ্নাতীত অভিজ্ঞতা। যতদিন বাঁচব, যে-দেশকালেই আমার ভাগ্য আমায় টেনে নিয়ে যাক, তোমার স্মৃতি আমার মনে বন্ধুত্বের স্নিগ্ধতম অনুভবে চিরজাগ্রত থাকবে। ইংলণ্ডে যখন যাবো, মনে হয় তা সুদূর নয় (আগামী শীত ঋতু)—আমি তোমার একটি ছবি সঙ্গে নিতে চাই—যে-মূল্যেই হোক্। এজন্য দরকার হ'লে আমার পোষাক পর্যন্ত বিক্রি ক'রে দেব, তোমার একটি ছোট ছবি আমার চাই-ই। আজ একথাই ভাবছি খালি: আমায় তা যেতেই হবে। অবস্থা অনুকূল হ'লে ইংলণ্ড যাত্রার আগে তা ক'রে ফেলতে চাই। কোন দেশী বা ইংরেজ শিল্পীর সঙ্গে তোমার পরিচিতি থাকলে আমায় জানিয়ো। তোমার মধুর-সত্তান্বিত একটি চিত্ররূপ আমায় পেতেই হবে, এ হ'লো পাকা সিদ্ধান্ত মনে হয়, এ বিষয়ে অনেক লিখে ফেললাম। একে তোষামোদ ভেবো না-না, না-কখনো না। আগামী রোববার কি তোমার কবিকে দেখতে এখানে আসবে? এলে, মতিকে সঙ্গে এনো। জানিয়ো, যাতে আমি তোমার মতো সুশোভন অতিথির আপ্যায়নে প্রস্তুত (আমি যা দরিদ্র!) থাকতে পারি! কিন্তু এসবই অলস জল্পনা, আমি জানি তুমি আসবে না আমার 'দীনজন কুটীর'কে তোমার প্রীতিকর উপস্থিতিতে সম্মানিত করার কোন ঝোঁকই নেই তোমার! ইতিমধ্যেই এ-চিঠি যথেষ্ট দীর্ঘ হয়েছে। যা হোক; আরো ক'টি পংক্তি লিখতে দাও।

আগামী কাল আমার পিতা তাঁর এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কাছে যাচ্ছেন। আমাদের 'যাত্রা'২২ শোনা হচ্ছে না। কলেজ গিয়ে মতি, মাধব ও বন্ধুকে আমার কথা বোলো, যদি অবশ্য ভিখিরিগুলো আসে। ভুলো না। আমার সুপ্রিয় বায়রনকে নিয়ে লেখা টম মুরের২৩ জীবনীটা২৪ পড়ছি—আমার কথা বিশ্বাস করো, একটি চমৎকার বই। আহা! আমি যদি মহাকবি হই, তো তোমার লেখা আমার 'জীবনী'২৫ না জানি কতো উপাদেয় হবে, ইংলণ্ড যেতে পারলে যে আমি তা হবো এ বিষয়ে আমি নিশ্চিতপ্রায়।

ইতি

বিশ্বাস করো তোমার স্নেহার্দ্রতম বন্ধু

ম. স দত্ত

পুঃ এ চিঠির প্রত্যুত্তর, প্রিয় গৌর, খুব—খুব—খুবই তৃপ্তিকর হবে! দ্বিতীয় পুঃ আমি জানি যে, এখানে উত্তরযোগ্য কিছুই নেই—তবু ভাই, লিখো-লিখো-লিখো! ম. স. দ.

১৭ খিদিরপুর। ২৬ নভেম্বর ১৮৪২। রবিবার

প্রিয় বন্ধু,

এই সঙ্গে এক বোতল (অথবা যা বলো) পমেটম—তোমার জন্য। ধন্যবাদ চাই না। তবে তোমার অনুজ্ঞামতো আমার তৎপরতার প্রশংসা তোমাকে করতেই হবে। এখনো তোমার ল্যাভেণ্ডার সংগ্রহ করতে পারিনি, এজন্য দুঃখিত। মার্জনা কোরো। লোকটিকে আমি খুব তাগাদা করছি—এ সবের যোগান দেয় যে দোকানীটি, তাকে। কাল আমি কলেজ যাচ্ছি না, সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কলেজে আমার বিতৃষ্ণা ধ'রে গেছে। কার২কে ঘৃণা করি। বি২৬কেও। এখন আমি আমার পিতামাতার বিরুদ্ধে অভিসন্ধি করছি। (তা আর ব্যাখ্যা করব না বুঝে নাও)। ভালো কথা, কাল সন্ধ্যায় তুমি আমাকে

(এম, আই১০তে) ধৃষ্টতাবশত বলেছ যে, তুমি আমার ইংলণ্ড পালাবার অভিলাষ বাবাকে জানিয়ে তা পণ্ড করতে চাও। এ যদি তোমার প্রকৃত মনোভাব হয় তো জেনো, তুমি আমার বন্ধু নও। এই যদি তোমার ভাব ও অনুভবের দৌড় তো গোল্লায় যাও! আমি মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে চাই ব'লে হয়তো তুমি আমায় খুব নিষ্ঠুর ভাবো হায়! বন্ধু! আমি সবই জানি, সবই বুঝি! কিন্তু "কবিতার অনুগামী হ'তে গেলে" (এ, পোপ২৬ বলেন) "মা-বাবাকে ছাড়তেই হয়"। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি জ্ঞানী লোক, ভেবে দেখো। তোমায় একটি লম্বা চিঠি লেখার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু একগাদা বন্ধু (পরিচিত) আমায় ঘিরে ব'সে আছে। দাবা—আমার প্রিয় দাবা খেলায় ডাকছে। যত বড়ো চিঠি লিখতে ভালো লাগে, লিখো। তোমার কাছ থেকে দীর্ঘ পত্র পেতে আমার ভালো লাগে। এই পত্রের উত্তর মনে হয়, এভাবে আরম্ভ হবে "যথার্থই তুমি আমায় অঢেল উপহার পাঠাচ্ছো ইত্যাদি"। কেমন আমার তীক্ষ্ণ আমার স্মৃতিশক্তি! তোমার চিঠিগুলি আমি এতই অভিনিবেশ সহ পড়ি যে, আমি সেগুলির (প্রতিটির) পুনরাবৃত্তি করতে পারি—প্রতিটি শব্দ ধ'রে ধ'রে—আর অমি কিনা কাল সন্ধ্যার এম. আই১০এ আমার একটি চিঠির (বেশ) কিছু অংশ মনে করতেই পারলে না!

এই লজ্জাজনক আবোলতাবোল (লেখা) মার্জনীয়। আমার কলমের ডগার নষ্টামিকে আমি কিছুতেই শায়েস্তা করতে পারি না মনে রেখো, আমি কাল কলেজ যাচ্ছি না। পাপিষ্ঠ কারে২র কাছে একটি চিরকুট পাঠিয়ে আমি দু'মাসের ছুটি চাইব। আশা করি সেটি তিনি মঞ্জুর করবেন। যদি না করেন, আমি গ্রাহ্য করিনে। কিন্তু অনুপস্থিত আমি থাকব, থাকবই।

এ চিঠি দীর্ঘ নয়! ঠিক এ-মাপের একটি (এর চেয়েও দীর্ঘতর যদি চাও, পারো) চিঠি লিখো যেন, আর বিশ্বাস রেখো—তোমার নিয়ত স্নেহাকাঙ্ক্ষী।

১৮.

২৩ নভেম্বর। রাত্রি

এই তো!—আমার দীর্ঘদেহী পত্রের উত্তরে তোমার বামন চিঠির সমালোচনা দিয়ে তবে শুরু করি। আরম্ভ করেছ—"টু স্টাম্বল অ্যাট দি থ্রেসহোল্ড্ ইজ নো গুড্ ওমেন্"—মনে রেখো, লিখছ—"আই সেল্‌ভ ইউ দি 'শেক্সপীয়র'।" গৌর, তুমি আমার ছাত্র হ'লে—ঠিক জেনো—আমি তোমায় বেতিয়ে মারতাম বা আরো খারাপ-কিছু করতাম। "দি আর্টিক্‌ল্ 'দি' ('এ' টু) ইজ নেভার ইউস্‌ড্ বিফোর এ প্রপার নাউন "ইত্যাদি ইত্যাদি। "আবার, "দি মুর'স্ পোয়েম !!!" ইত্যাদি। ভবিষ্যতে সতর্ক থেকো। আমার চিঠি তোমার ভালো লাগে"—সত্যি? আমার অহংবোধ তৃপ্ত—খুবই তৃপ্ত—আমি তুষ্টিত, আহ্লাদিত। টম মুরে ২৩র 'বায়রনের জীবনী' ২৪শেষ করেছি—যে-অধ্যায়ে আমার সুপ্রিয় সম্ভ্রান্ত মানুষটির মৃত্যু পুঙ্ক্ষ বর্ণিত, সেটি আমায় অজস্র কাঁদিয়েছে। টমের (চমৎকার লোক!) রচনার ঐ জায়গাটি চোখের জল ছাড়া কোন্ হতভাগাই বা প'ড়ে উঠতে পারে? তোমার বইটি পাঠালাম—আমার সবিশেষ ইচ্ছা (মনে রেখো তা তোমার অবশ্য মান্য, আমি যেমন তোমাকে মানি), তুমি বইটি যে-কোন মূল্যে পড়বে এবং উল্টেপাল্টে আদ্যন্ত। বইটি এম২৮-এর। তাকেও এই সঙ্গে একটি চিঠি দিলাম, কলেজে তার দেখা পেলে দেবে। তারপর, কেমন চলছে তোমাদের, কলেজিয়ানবৃন্দ! হি, ক,২৯ক হলো কিনা একটি পার্থিব প্যাণ্ডিমোনিয়াম১২৯খ আর এর ঘৃণ্য সহবাসীদের (তুমি ও অঙ্গুলিমেয় অন্য ক'জন ছাড়া অবশ্যই) শীর্ষনেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করি শোচনীয় 'স্যাটান' সুলভ ৩০ গুরুগরিমা! যাক—আজ সন্ধ্যায় তুমি এম-আই-এ আসছ তো? উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' জানতে চাই শুধু। সেখানে লেখা হবে। এম, ১০এ যাওয়া

প্রসঙ্গে (এই) শেষ প্রশ্নটির যেন উত্তর দিয়ো ভাই। ইতি যথাপূর্ব তোমার চিরবিশ্বস্ত।

পুঃ টম্‌২৩এর 'বায়রন জীবনী' ২৪আমায় ফেরৎ পাঠিয়ো। তোমায় বলতে পারি—এ-বইটি পুনর্বার পাঠের অসুবিধা সত্ত্বেও আনন্দ দানে অমূল্য। অন্তত আমার কাছে এর পৃষ্ঠাগুলির চেয়ে মনোজ্ঞ, চিন্তা-কর্ষক আর-কিছু নয়, হ'তে পারে না—পাঠককে যুগপৎ সহর্ষ—বিষন্ন ভাবাকুল করার যাবতীয় ক্ষমতায় তা পরিপূর্ণ।

পুঃ২ (ডি, এল, আর৯এর অনুপস্থিতিকালে কলেজে আর-না-যাওয়ার) মদীয় সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কখনো কখনো তোমার কাছে গিয়ে সহ'সুখ উপভোগের তাড়না বোধ করি। কিন্তু ইচ্ছাটা নিতান্তই বোকার মতো—নয় কি? কী বলো, তুমি, অ্যা?

পুঃ৩ তোমায় একটি ছোট চিঠি লিখব ভেবেছিলাম—কারণ, আমার মনে হয়, ইতিমধ্যে তুমি আমায় দীর্ঘ পত্রে বেশ বিরক্ত বোধ করছ; কিন্তু কী করব, নিয়তি যা হওয়ায়, তা হ'তে দিতে হয়।

১৯·

প্রিয় গৌর খিদিরপুর। ২৭নভে। মধ্যরাত্রি

প্রেমপত্র লেখার পক্ষে এক্ষণ সর্ব্বৈব উপযুক্ত। কেননা এই প্রহরে প্রণয়-প্রেরণা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু হায়! স্বকীয় বিষাদ লক্ষণে চিহ্নিত হৃদয়” তার সব দিকে অসুস্থ রং বিকীর্ণ করছে: যেন আমি-হেন হতভাগ্যতমজীব, যার শিয়রে“ঐ রাত্রি দীপ্ত দীপ জ্বলছে”। কীভাবে প্রণয়লিপি বা আনন্দপত্ররচনা করি আমার সমগ্র বেদনাভার তোমার অবিদিত; কেউ যদি আমায় ফাঁসিতে ঝুলাতো, খুশী হতাম তবু এমি ইচ্ছা (কী যে তেই তীব্র ইচ্ছা!) পোষণ করছি! আজ থেকে তিনমাস পরে আমার নাকি বিবাহে বসতে হবে, কী ভয়াবহ ভাবনা! রক্তের ভিতরে যন্ত্রণায় স্রোত বইছে, উদ্বেজিত সজারুর কাঁটার মতো আমার চুলখাড়া হয়ে উঠছে।আমার বাগদত্তাটি২৮ নাকি

এক ধনী জমিদারের কন্যা, বেচারী! ভবিষ্যতের চির অনির্দেশ্য গর্ভে তার জন্য কত দুঃখই সঞ্চিত আছে! তুমি তো জানো আমার মনে দেশত্যাগের বাসনা বদ্ধমূল দুরপনেয়। সূর্য উদিত হ'তে ভুলে যেতে পারে, আমি তবু এই আন্তরিক ইচ্ছাকে মুছতে পারি নে। আমার একথা নিশ্চিত ব'লে জেনো—এক্ বা দু'বছরের মধ্যে হয় ইংলণ্ড যাচ্ছি, অথবা আদৌ' যাচ্ছি না—এ দুয়ের একটি ঘটবেই! গৌর, তুমি আমার বন্ধু! এসব গোপন কথা অন্যগোচর হওয়া তাই ক্ষীণ সম্ভাবনারও শঙ্কাতীত। এ পর্যন্ত এমন কি তোমাকেও আমি এসব জানাই নি। কিন্তু আর পারিনে; আমায় যে ভাই সহানুভব চাইই আর তা কার কাছে চাইবো? কাল আমি কলেজ যাচ্চি না; এটুকু উষ্ণ মস্তিষ্ক অবশ্যতা মার্জনীয়। তুমি আমার সম্মানিত প্রীতিভাজন, আর তা থাকবেও চিরকাল। মাঝেমাঝেই আমার ক্লিষ্ট অন্তরকে তোমার কাছে মেলে ধরব; কিন্তু কলেজে আমি যাবো না, যেতে পারি না। পাপিষ্ঠ কার আমার কাছে বিতৃষ্ণাযোগ্য। তিনি আমার আন্তরিক অনুভূতিগুলিতে আঘাত হেনেছেন। প্রসঙ্গত বলি: আমায় যে লিখেছ তুমি, "আমি বন্ধুজনোচিত কাজ করে"—ঠিক কী বলতে চেয়েছে? নিজের দিব্যি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে; তুমি আমার কাছে দৃঢ় রহস্যে জড়াচ্ছো, উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা দাও। যদি আজ কলেজ না যাও তো জানাও। তোমার সাক্ষাতে যেতে পারি। কিন্তু এই কলেজ বিরতির পক্ষে তোমার নিজস্ব কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ না থাকলে, যাও—আমি বলছি। আমার জন্যই অণুপস্থিতি অনাবশ্যক সেটা হবে হাস্যকর বোকামি। মাধব ও মতিকে আমার কথা বোলো প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে। আমার টম মুর২৩ পাঠিও এবং তোমার শেক্সপীয়র খণ্ড, যাতে ওথেলো ও হ্যামলেট আছে সবিশেষ বলছি। যদি একটা ওথেলো ও হ্যামলেটনা থকে, দু'খণ্ডই পাঠাবে।

ইতি: তোমার স্নেহবিশ্বস্ত

অনুসার প্রসঙ্গ :—

১। সম্ভ্রম এই উল্লেখে মনে হয় 'ট্রাভেল্‌স্ অব এ হিন্দু' রচয়িতা ভোলানাথ (চন্দ্র)ই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি।

২। মাদ্রাজ প্রত্যাগত এই শিক্ষক ছিলেন হিন্দুকলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ। রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র মধুসূদন তাঁর 'অনুভূতি ক্ষেত্রে' আঘাত করায় (পরবর্তী পত্রাদি দ্র.) এঁর প্রতি বিমুখ, বিক্ষুব্ধ, চিরবীতরাগ হন। এই জেমস কার অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের সাময়িক অবকাশ গ্রহণে তখন অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য স্থায়ী হলেন।

৩। 'নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' বিষয়ক প্রবন্ধরচনায় হয় শ্রেণীভুক্ত মধু যে প্রথম পুরস্কৃত স্বর্ণপদক পান, সে প্রসঙ্গ।

৪। এ সময়ে অধ্যাপক কবি রিচার্ডসনের অনুপ্রাণিত পৃষ্ঠপোষণায় মধু ইংরেজিতে অনেক কবিতাই লিখছিলেন। সে সব 'গ্লিনার' 'কমেট' 'ব্লসম' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ কবিতাটি। "The upsori' বা "Night" "(অসম্পূর্ণ)

৫ ক, খ। বঙ্কু বা ভূদেব (খুব সম্ভবত প্রথমোক্ত); মতি বা মাধব—সবাই সহাধ্যায়ী বন্ধু।

৬। নিশ্চিত রূপে বলা যায় না কাব্যটি 'The upsori' কিনা। গ্রন্থকার কাব্যপ্রকাশের বাসনা কি এখানে প্রচ্ছন্ন? অনুমেয়।

৭। সম্ভবত 'বলাই' নামে মধুর কোন সহপাঠি। বাংলা নামের ইংরেজী বানানে এরকম খামখেয়ালী মজা মধু আরো করেছেন। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তরও মত তাই।

৮। এঁর বিষয় অজ্ঞাত। ইনি যে গৌরেরও অপরিচিত? তা উল্লেখের ধরনে প্রমাণিত।

৯। ডি, এল, রিচার্ডসন। মধুর প্রিয় অধ্যাপক কবি। ১৮৩৬ সনে তিনি হিন্দু কলেজে যোগ দেন। ইংরেজি সাহিত্য বিশেষত সেক্সপীয়ার পঠন-পাঠনে এর কৃতিত্ব ছিল কিম্বদন্তীতুল্য। মধুর তরুণ বয়সের কীর্তিকলাপে এর পৃষ্ঠপোষণ সুবিদিত।

১০। অরুণ বিদ্যাশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানে মধু, গৌর, হরিশ (মুখোপাধ্যায় ?) প্রভৃতি অনেকেই সমবেত হতেন। মেলামেশায় এখানে হিন্দুকলেজ-সদৃশ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা কি সমাধিক ছিল? এখানকার পত্রগুচ্ছ যেন বারম্বার প্রসন্ন ও প্রীত উল্লেখে সেকথা বলে।

১১। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর সুসম্পাদিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' গ্রন্থে লিখেছেন: এই হরিশ নিশ্চয়ই হিন্দু পেট্রিয়ট-এর বিখ্যাত হরিশ মুখোপাধ্যায়। অথচ তাঁর প্রাসঙ্গিক পত্রের মন্তব্য: মনে হয় ১৪১৮ সালে এই পত্র লেখার সময় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।—তবে কি মধু অপরিচয়ের দূরত্ব থেকেই গৌরদাসকে এই তাঁর সাগ্রহ সাদর সম্ভাষণ তাঁকে জানাতে বলছেন;—কেন? 'হরিশ' তো তখন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি নন—মধুর সহপাঠী, বন্ধুস্থানীয়—একটি তরুণ শিক্ষার্থী!

১২। 'লিটারারি গ্লিনার' সেকালীন একটি ইংরেজি মাসিক। মধুর তরুণ বয়েসের কবিতা প্রকশিত হতো এর পাতায়।

১২ ক। এই নামে কাকে বুঝিয়েছেন জানা যায়নি। হয়তো 'গ্লিনারের প্রকাশক মুদ্রককে। পত্রিকাটির পরিচালক ছিলেন Lt. Kaye এবং ডি, এল, রিচার্ডসন স্বয়ং।

১২ খ। সেকালের আরেকটি সাহিত্য-সাময়িকী। মধুর ইংরেজী কবিতা এখানেও প্রকাশিত হ'তো।

১৩। 'ব্ল্যাকউডস এডিনবার্গ ম্যাগাজিন'। প্রথম প্রকাশ ইংরেজী কবিতা ১৮১৭। পরে মধুর সময়ে এর প্রতিষ্ঠা ছিল সবিশেষ, অসামান্য।

১৪। "সম্ভবত মধুসূদনের কোন সহপাঠী বন্ধু।" ক্ষেত্র গুপ্ত ২

১৪। ক মধুর সহাধ্যায়ী বিশিষ্ট বন্ধু বঙ্কুবিহারী দত্ত। এর প্রসঙ্গ আছে একাধিক পত্রে। গৌরদাস ও রাজনারায়ণ বসুর পর ভূদেবেরও পরে হয়তো এর কলেজেরও বন্ধুর হিসেবে স্থান নিশ্চিত তরুণ ও স্বতন্ত্র, "মৌলিক" মধুর কলের ভিতর-বার জীবনসংক্রান্ত স্মৃতি চয়নে এক রচনাটি নৈপুণ্যে, পর্যবেক্ষণে আন্তরিকতায় স্মরণীয় গৌরবের মধুজীবনীরচনায় তাগিদে ও অনুরোধের ইনি ১৮৮৩ সনে এর মধুস্মৃতিসার মূল্যবান রচনাটি লিখে পাঠান।

১৫। ইংরেজ কবি (১৭৪৪—১৮৩২)। মধুর জন্মের ৮ বছর পরে এঁর মৃত্যু হয়।

১৬। ইনি যে কে বা কী এঁর সমগ্র পরিচয় তা অজ্ঞাত। পরবর্তী পত্রে এর অপেক্ষাকৃত 'কুশলে' মধু স্বস্তি বোধ করছেন, দেখি। এ পর্যন্ত 'মধুস্মৃতি' লেখক নগেন্দ্রনাথ থেকে ক্ষেত্র গুপ্ত ও হরফ প্রকাশনীর মধুসূদন রচনাবলী সর্বত্র এই দ্বিতীয় পত্রটিকে পরবর্তী ব'লে দেখানো হয়েছে। এই জ্ঞাতি-ভাইয়ের অসুখ প্রসঙ্গে এবং শেকসপীয়ের ও হরকরা ফেরতের প্রশ্নে মধুর উক্তির তারতম্য আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রমাণ করে আমার পুনর্বিন্যাস সঠিক।

১৭। কলকাতার সমকালীন খ্যাতনামা ইংরেজি সাময়িকীর একটি। পুরোনাম 'বেঙ্গল হরকরা'।

১৮। তৎকালে প্রচলিত ও জনপ্রিয় এক প্রকার নিম্নরুচির দেশজ আমোদ। একবার হিন্দু কলেজের চৌহদ্দির মধ্যেই একটি 'তামাসার' অনুষ্ঠানে স্বয়ং ডিরোজিও তাঁর প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে একত্র দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করছিলেন। এ-সময় তাঁকে আড়াল ক'রে সামনে দাঁড়ানো অন্যতম ছাত্রের প্রতি তাঁর স্বভাবোচিত পরিহাসোক্তি 'You are not transparent my boy' স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯। বৈষ্ণব পরিবার থেকে আগত গৌরদাসকে 'আধুনিক' ও তাঁর প্রীতিকর আমিষ ভক্ষণের দৃষ্টান্ত জানিয়া সকৌতুক 'সতর্ক' করছেন, মনে হয়।

২০ (ক)। স্কটল্যাণ্ডের বিশিষ্ট কবি(১৭৫৯—৯৬)। এখানে অবশ্য তাঁর গোলাপতাজা 'Love lyric' উল্লেখিত হয়নি; তাঁর স্বকীয় 'satire' 'humour' ই উদ্ধৃত হয়েছে, অবশ্য ভগ্নাংশে।

২০ (খ)। স্কটল্যাণ্ডের আরেক কবি (১৭৭৭—১৮৪৪)। আখ্যানমূলক রচনায় ইনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্য এক জীবনী-লেখক ক্যামবেলও ছিলেন। মধু কি তাঁকে সঙ্গী করেছিলেন ইতালির চিঠির সহপাঠে, সেই তমলুকে, সমুদ্র তীরে?

২১। 'কয়েকটি পদে'ও যে 'কাব্যলক্ষ্মী' বা 'কলালক্ষ্মী' অধিরা রইলেন তিনি অবশ্য 'English Muse'—আমাদের বাঙলা-বাঙালীদের বাগ্দেবী বা বানী বীণাপানি নন। তখনো তিনি দূরবর্তিনী। মধু কল্পনায় 'আবির্ভাবে' দেরি আছে তাঁর। গৌরকে যে-'কবিতার বন্যা' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাও তাই অনুরূপ, ইংরেজি।

২২। দেশজ 'যাত্রা' বিষয়ে মধুর অনুরাগ নগণ্য ছিল না তখনো। অন্তত এই পত্র শুরুকালে তিনি সে-সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন।

২৩। আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা টমাস মুর (১৭৭৯—১৮৫২)
২৪। তাঁর সম্পাদিত 'The Letters and Journals of Lord Byron, ই এখানে মধুর প্রিয়, অতিপ্রিয় 'মুরের জীবনী'। এ-প্রসঙ্গে কাম্বামির্জা লিখেছেন: '...the friend of Byron, he destroyed the manuscripts of the latter's memoirs, and gave an apologetic colouring to his biography (the Letters and the Journals etc. 1830) এবং as the editor and biographer of Byron he is still entitled to recognition—সুতরাং ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত এ বিষয়ে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তা অমূলক।
২৫। 'তাঁর 'জীবনী' গৌর লিখবেন এ-সাধ তাঁর পূরণ হয়নি সত্য, গৌর যে সে-বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে কিছুদূর এগিয়েছিলেন, লিখেছিলেন ও লিখিয়েছিলেন (যেমন বঙ্কুকে দিয়ে)—তা অবশ্য নিঃসন্দেহ। আংশিক, অসম্পূর্ণ সত্ত্বেও সে-দুটি রচনা যেমন তথ্যপূর্ণ, যথোচিত, তেমনি অকপট সনবন্ত। অবশ্য শোচনীয় এই যে, সেগুলি পূর্ণাবয়ব পায় নি।
২৬। এ- উল্লেখ এখন পর্যন্ত অপরিষ্কার রহস্যাবৃত।
২৭। আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮—১৭৪৪)। ড্রাইডেনের সঙ্গে সমোচ্চারিত 'কীর্তিবান' কবি ও সমালোচক। রোমান্টিক আন্দোলন বশত সাময়িক পদচ্যুতি ঘটে তাঁর; কিন্তু পুনরুদয় ঘটে এলিঅট প্রমুখ বিশাশতকী পুনর্মূল্যায়নে।
২৮। সহপাঠী বন্ধু মতি বা মাধব ?
২৯ ক, খ। হিন্দু কলেজ। এ সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ক্রমবর্ধমান। অধ্যক্ষ কার-কে কেন্দ্র করে তাঁর তিক্ততা ও বিরক্তির তীব্র প্রকাশ এখানে। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্টে' বর্ণিত স্যাটানের দানোবহুল অরাজক 'কারখানা' প্যাণ্ডিমোনিয়াম হিন্দু কলেজে (রিচার্ডসন-বিরহিত) নবায়তন পরিগ্রহ করেছে, এই তাঁর উষ্মা জড়িত ধারণা।
৩০। মিল্টন বর্ণিত 'স্যাটান' এখানে 'শয়তান' রূপী কার সাহেব—হিন্দু কলেজের তৎকালীন 'অস্থায়ী' অধ্যক্ষ। মধু একে তাঁর একান্ত 'আহত অনুভূতিক্ষেত্রের রক্তক্ষরণে, পীড়ায় শ্লেষাত্মক কশাঘাত করেছেন এভাবে—হ'তে পারে 'সুবিচার করেন নি'; কিন্তু বীতশ্রদ্ধ মনের তাপোত্তাপ, ঘৃণা উদ্গীরণে কার্পণ্য তথা কাপট্য দেখান নি। লেখক,

মণীশ ঘটক

মুঠোয় পেয়েও

সকাল সন্ধ্যাবেলার ফাঁকে
কে যে সাজায় জগৎটাকে
একটি দিনও আরেকদিনের আদলে নয় সাজা,

চলার মেয়াদ প্রায় পেরিয়ে
আজও আমি বুঝি নি যে
কোন পটুয়ার তুলির লেখন নিত্যি নতুন তাজা।

কোথায় থাকে সেই রূপকার
অফুরন্ত এই সুষমার
ভাণ্ডারী যে, মন্তর তার কোন গুরুতে দিল ?

সাত-সমুদ্দুর তের নদীর
ওপার থেকে নিরবধির
সোনার কাঠি আঙুলে তার কে ছুঁইয়েছিলো ?

স্বর্গ খুঁজে বেড়ায় যারা
চোখ না খুলেই খোজে তারা
পরশ পাথর মুঠোয় পেয়েও রাখে নাকো ধরে;

আমার সময় হল
দেখে নিই যা দেখে নেবার
যা দেখি তাই ভালো লাগে আরো অনেক করে।।

১৫.৯.৭৪.

জগন্নাথ চক্রবর্তী

কোনঠাসা হরিণী

আমাকে কোনঠাসা করেই তোমার সুখ
কিন্তু আমার ?
তুমি স্বার্থপর, তাই সুখ খোঁজো
এবং শুধু সুখের জন্যই আমাকে খোঁজো।

আমার বুকের মধ্যে ভয়-পাওয়া হরিণী
কেবলি পালিয়ে বেড়ায়, আর ততোই
তুমি ছুটতে ছুটতে তাকে কোনঠাসা করে আনো।

আমাকে সুখ মনে করে তুমি কেবলি পিছু নাও,
এবং কোনঠাসা করেই তোমার সুখ।
শুধু সুখের জন্যই তোমার সব,
কিন্তু আমার ?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নিজের হাতে

তপ্ত লোহার নলি-বাঁধানো খুরের
শব্দ তাকে কাঁদায়,
কারণ তাকে আগল-তোলা ঘরে
বাঁধছে কারা ধাঁধায় ;
অমন সুঠাম দেহ
না, কেউ নয়—
বেঁধেছে তার নিজেরই সন্দেহ।

শান্তিকুমার ঘোষ

হাইকু

এক

হলদে ফুলে-ভরা ডাল ঝুঁকে পড়েছে
খালের উপর
তলতা বাঁশের সাঁকো
সবুজ সর ভেঙে চলে কালো রাজহাঁস

দুই

চোখ দিয়ে চুমো খাও এই দৃশ্য তুমি
ফুলগুলো নিভে যাচ্ছে মহীরূহ ছায়ামূর্তি
অভ্রের নদীর 'পরে ভেসে যায়
কালো পালের নৌকা

পৃথীন্দ্র চক্রবর্তী

ফুল ফুটবে

ঘোড় হাঁটে টগ-
টাট্টু হাঁটে -বগিয়ে :
খট্টাস রাস্তাতে।

খট্টাস বান্দর তুই
রাস্তা আগ্‌লে ক্যান্‌? হট্‌ যা।
বান্দর দরবার স্থান।

বান্দর দরবার দিস
কাল কালকাতায়। বন্ধ কর
হরতালের ছাতা।

ওই যে বললি বন্ধ্
আমি হাঁটুম তুই হাঁটস্‌—
কানুন কি সব গুম?

খট্টাস খোঁড়ায় টগ-
খট্টাস হাঁটে-বগিয়ে:
বান্দার রাস্তাতে।

হুমকি ছায় প্রাচীর।
গর হয়ে যা রাজরাস্তায়;
নয় তুলো-পেঁজা।

খাস নে চোখ মুণ্ডু,
লুকোসনে লাঙুল, নাক ঘয়,
আর কচলা আঙুল।

বান্দর সেঁধায় টগ-
বান্দর হাঁটে বাগিয়ে:
কেউ নেই রাস্তাতে।

ঘোড়া চুপসোয়. যায়
টাট্টু, হোঁচট খায়, খট্টাসটা
ল্যাজের বাড়ে জট।

খোঁড়ায় সেঁধায় নাক
ষষে; চুপসোয় খায় হোঁচট :
হরতাল ঝাল মিশোয়।

ঝাল নয় ঘোড়ার যম,
টাট্টুর হুকুম। খট্টাসের
বান্দরের যায় ঘুম।

রাস্তারাস্তায় ঘুরলে
ছুটলে চাকা; পা, তবেই
কলকাতায় থাকা।

ঘোড়া ছুটবে টগ-
টট্টু ছুটবে-বগিয়ে
সেদিন ফুল ফুটবে॥

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

আড়ালে যাদুকর

ধানচারা রোপণের খেলা এই জলঢাকা নস্রায় সাজানো
দিগন্ত বিস্তৃত সমতল, সবুজ ঐশ্বর্য
থর থর রহস্যে তুলছে, কানাকনি নূতন শিকড়ে
বাতাসে আকাশে আর মানুষের করুণ নিঃশ্বাসে
স্বপ্নে ও বাস্তবে। মায়াবিনী মৌসুমী বর্ষণ
অকৃপণ, স্থলে জলে অযুত বর্ষের ব্যাকুলতা
আরোপিত ধানের চারায় আর রাখালী বাঁশীতে গান গায়।

খড়ো চাল লালটালি অফুরন্ত তারপর জটলা
জলের দর্পণে মুগ্ধ ছায়া ফেলে রাখে,
কালপেঁচা অদৃশ্যে উধাও আর অবিশ্বাসের প্রাচীর টলমল।

কৃষক অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে কোনো কোনো দিন,—
এই জলে ছায়ায় চারায় পাছে ভূত-দেখা-ভয়ে
ভেসে ওঠে তিন মহলা দালান কোঠার মায়াজাল
এবং অদ্ভুত নাম যাহুকরী কলকাতা দিল্লী ও বোম্বাই।

স্বরজিৎ দাশগুপ্ত

খুন

করতলে ছিল রাতের গভীর নদী,
বাতাসে ফোলানো পাল,
যোজন যোজন বিস্তৃত নিরবধি
চাঁদের মায়াবী জাল :
পলিয়ে বাঁচার নিষ্ফলতায়
হাজার হাজর ঢেউয়ের মাথায়
রূপালি মাছেরা লুটোপুটি খায়,
নিদ্রাবিহীন নৌকো গিয়েছে চলে
বিশাল দূরতা ছিড়ে—
একদিন ছিল এইসব করতলে,
আসবে না আর ঘুরে।

তারপরে এল রাতের গভীর বনে
বৃষ্টির গাঢ় ধারা
শুধু অবিরাম তরল গুঞ্জরণে
আকাশ নিদ্রাহারা :
মেঘে মেঘে কাঁপে কেশ বিস্তার
দূর বিদ্যুতে সংকের কার
দরজায় করাঘাত বারেবার,
তবুও বুকের খাঁচার মধ্যে বসে
পারে নি মেলাতে পাখা—
অসাধ্য সাধ পরাভূত আক্রোশ ।
থাকল ভিতরে ঢাকা।

করতলে আজও রাতের গভীর ট্রেন
জংশনে অস্থির,
লাইনে লাইনে অজস্র লেনদেন
তুমুল দূরের ভিড়
সিগনালে মাখা অমর দ্রাঘিমা
নদী বন মাঠ দিগন্ত-সীমা
ঊর্দ্ধশ্বাস মৌল নীলিমা
ঝনঝন করে শিরায় শিরায় জলে
প্রত্যহ নিদারুণ—
এখানে ওখানে আজও হয় করতলে
নিজের গোপন খুন ॥

দেবপ্রসাদ ঘোষ

মাছরাঙা

জলের অতলে কোনো জল
কন্যাকুমারিকা থেকে, বুঝি কোনো মীন অমন নির্মল
তাকে ডাকে। ডেকে নেয় অমন উতল।
পরক্ষণে উধাও সে উধাও সে মেশে
সুনীল আকাশে অনায়াসে।

এ সবের স্বর
চৈত্রের পৌষের মাঠে নির্ভয় অন্তর
কারো হৃদয়েতে,
কারো সোহাগের হাত
ছুঁয়ে থাকে ঘাস মাটি চরাচর!

তোমাকেই মনে পড়ে তুমি ডাক দিলে
ডুবি প্রবল অতল জলে
ডাক দিলে ভাসি
একবুক আকাশের নীলে।

অসীম রায়

গোলদীঘির জলে

জলেও সন্ত্রাস না না ক্ষিপ্র হরিণ একপাল
গায়ে ডানা পায়ে গলা শরীরের আশ্চর্য বিদ্যুৎ
চমকায় জলে একি স্বর্গ থেকে নামে দেবদূত
কিন্নর কিন্নরী অবলীলাক্রমে খেলে, মায়াজাল

চোখ বাঁধে, প্রাজাপতি, জলযান, না না দেয় তাল
দুঃস্থ বর্তমান কাল, আমাদের দৈনন্দিন খুঁত
অবসন্নতায় জ্বালে শিখা; আমরাও গতিতে অদ্ভুত।
আসলে এমন কিছু আমরা খুঁজি যার নেই কাল

দেশ, হতেও পারে চৈনিক কি ক্যালিফর্নিয়ান
স্পেনের বাসিন্দা যে সে কি যায় না খাইবার পাস?
আচ্ছা, এমন কিছু ভাবা যায় না সমস্ত সকাল
সঙ্গে বাঁধে একসূত্রে মানুষের দেহে সেই গান;
দেহ মন এক হোক এ প্রার্থনা অবিশ্রান্ত কাল,
গোলদীঘির জলে সেই আবহমান কালের কোরাস॥

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

আমার শরীর এখন মুড়ীজল নদী

আমার শরীর এখন মুড়ীজল নদী
স্রোতোহীন, কেউ যদি পায়ে হেঁটে
পার হতে চায়, অনায়াসে
শাড়ীর পাড় দিয়ে জল ছুঁয়ে
চলে যেতে পারে—হৃদয়
অবধি সেই জল কখনই পাবে না পৌঁছুতে।

বর্ষার ঢল যদি
এসে নামে আমার এই নদী হয়ে যেতে পারে
যমুনার জোয়ার—নয়

যৌবন যেখানে যুগে যুগে মরেছে
উল্লাসে।

কেবল দোসর যদি জোটে—
হয়তো বা তবে আবার নাচাতে পারি
ময়ূর-পেখম—নদীর তীরে
হতে পারে দিগন্তের সীমা।

মৃগাঙ্ক রায়

পৃথিবীর ঘরে

তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত
ছুটে পালিয়ে গেল দিনগুলো।

এখন আর মনে পড়ে না
কবে প্রথম
এ ঘরে এসে পা দিয়েছিলাম,
মানুষের অহংকারহীন মুখ
কবে প্রথম দেখেছিলাম,
নোনাধরা পাঠশালার অন্ধকারে বসে
মানুষের ভাষা
অভ্যাস করেছিলাম,
শব্দকে
ছুরির মত ব্যবহার করতে শিখেছিলাম

মনে পড়ে না কবে
পৃথিবীর ভীত মানুষেরা
আমাকে প্রথম ভয় দেখিয়েছিল,
হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'এ সবই
আমরা তৈরি করেছি
এই বাসযোগ্য পৃথিবীর ঘর, দেশপ্রেম
বিভিন্ন মানুষ মানচিত্র উড্ডীন পতাকা,
আলোকিত মনুমেণ্ট,
ভদ্রতা বিবাহ বিলাপ,
কান্নার কারুকার্য শাস্ত্র ও শাসন
ক্যালেণ্ডার, কড়ি খেলা
এ সবই আমাদের তৈরি !'
বলেছিল, 'ভেবো না, আমাদের মত
তুমিও ক্রমশঃ মানুষ হয়ে উঠবে।
মানুষও
আমরাই নির্মাণ করেছি।'

আমি তারপর
ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে উঠেছি।
তারপর আমার অনেকগুলো দিন
তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত
ছুটে পালিয়ে গেছে ;
এখন আমি
মৃত্যুর অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছি,
এখন সপ্তর্ষির উজ্জ্বল উদ্যত খড়্গ
পৃথিবীর আকাশে প্রবেশ করেছে ॥

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

হৃদয়ে লেগেছে মৃত্যু

হৃদয়ে লেগেছে মৃত্যু, অন্য নামে যাকে প্রেম ভেবেছি একদা।
এর চেয়ে বেশি কম দেবার মতন
হয়তো তোমার কাছে কিছু নেই। বাঁচার চেষ্টায় সরে এসে
মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে হাসি ও কথায় ভুলে
থাকতে চেয়েছি। তবু
সিগেরেট খেয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, পান চিবোতে চিবোতে
মানুষের মুখগুলি চোখের সামনেই
সাপের ফনার মত হতে থাকে, দোলে ; অকারণে
লাফিয়ে ছোবল দিতে আসে। দেখে দেখে
আমিও মরীয়া হয়ে তোমাকে ও পৃথিবীকে দুঃখ দিয়ে যাবো,
আক্রোশবশত এই চিন্তা মনে মনে
পুষেছি অনেকদিন। চিন্তা ভেঙে ভেঙে
কঠিন ব্যাধির মত শরীর দখল করে। নখের আঁচড়ে
বুক থেকে তোমাদের উপড়ে ফেলে দিতে গিয়ে আমার অঞ্জলি
রক্তে ভরে ওঠে। কী করি কোথায় রাখি
ভেবে ভেবে আকণ্ঠ তৃষ্ণায় চুপিসারে
আমি তা-ই শুষেছি। এবং
নিজের রক্তের স্বাদ পেয়ে
কে আর তোমাকে চায়। তোমাদের কথা প্রেম—আলুনি, বিস্বাদ।

প্রদীপ মুন্সী

বাইরে

নিঃশব্দ হাওয়া এসে ডেকে নিল
আলগোছে চৌকাঠ ডিঙিয়ে
সুতপা চলে গেল
ইতস্তত পাখীর পায়ের ছাপ
জরির শাড়ীর আঁচল অতি দূরে সরে যায়
সরে যায় সোনালী মেঘের সারি

লম্পট মাতালেরা কেউ জানে না।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

একদিন

ভাবছি, একদিন সাদা পতাকা উড়িয়ে
কলকাতার ময়দানে গিয়ে দাঁড়াবো
মাথার উপরে একশো পায়রা ছেড়ে দিয়ে বলব
খুলে ফেলুন বর্ম, ফেলে দিন ঢাল তরোয়াল
আজ যুদ্ধ বিরতি দিবস।
আজ মোড়ে মোড়ে বটচারা রোপণ করব
প্রতিষ্ঠা করব হাজার পুকুর
আজ ফুটপাথের উলঙ্গ শিশুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব
হাসপাতালে রোগীর শিয়রে রেখে আসব গোলাপের তোড়া

জয় ও পরাজয় ভুলে

আজ বীজাণু বিমুক্ত হয়ে যাবো।

একদিন সাদা পতাকা উড়িয়ে

ভয়ংকর কলকাতাকে ডেকে বলব--

বোমারু বিমান থেকে নেমে আসুন

আজ যুদ্ধ বিরতি দিবস।

মানস রায়চৌধুরী

শরীর হারিয়ে

ওই কাঁধ আদরে আদরে ভেঙে যায়
তাকে বলি—চুপ করে স্বপ্ন বুনে চলো
সবুজ পশমে তোলা ফুল
বারণ মেনোনা বিবেকের, অন্ধকারে
ঢেউ আর উপকূল পথচারী নিজস্ব গানের ভাষা পায়।
কাঁধ থেকে জলস্রোত বুক পিঠ বেয়ে নেমে আসে
পৃথিবীর ভূগোলের বাধ্যবাধকতা নেই, তার অধিকারে
সে শরীর নেই যাকে এতকাল সে নিজস্ব ভেবেছে
"ব্যক্তিগত" এই শব্দ ছেঁড়া পাতা উড়ে যায় ঝড়ে।

নিজেকে নিজের মত ঢেকে রাখা আর কি সম্ভব ?
চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ে সে পায় প্রচণ্ড অগ্নিদাহ
ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়, আচ্ছাদন, স্বাভাবিক স্বাভাবিকতায়
যেভাবে ভেবেছে সব স্বপ্ন হবে সেইভাবে ভেবে
পরিণতি পেয়ে যায় অনর্গল জলস্রোতে শরীর হারিয়ে।

আলোক সরকার

জানালা থেকে

হলুদ আর সাদা মেশানো ফুল ঝাঁকে-ঝাঁকে ফুটেছে পোড়ো
উঠোনের সবটা জুড়ে
জানালা দিয়ে দেখি প্রতিটি পাতায় ফুল পাতা ঢেকে গিয়েছে
এমন ফুল
হলুদ আর সাদা মাঝখানে একটা লাল বিন্দু তাকিয়ে আছে সর্বত্র
তাকিয়ে আছে দক্ষিণে তাকিয়ে আছে বামদিকে দেখছে
উর্ধ্বাকাশের ঘোষণা
বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন জাগ্রত আর নিবিষ্ট খর হাওয়া
দিয়েছে চারদিকে
জানলা দিয়ে দেখি অভ্রান্ত সমতান হলুদ আর সাদা মেশানো ফুল।
ঝাঁকে-ঝাঁকে দুলে উঠছে পাপড়ি ঝরছে না একটিও প্রতিটি পাপড়িই
উন্মোচিত
চোখ মেলে তাকিয়ে আছে হলুদ আর সাদা মেশানো ফুল চোখ
মেলে তাকিয়ে আছে
বৈশাখমাসের মধ্যাহ্ন জানলা দিয়ে দেখি অভ্রান্ত সমতান
আলোর ভিতর আলো গতির ভিতর ধ্বনি
সারাটা পৃথিবী বেজে উঠেছে সমর্পিত ঐকতান পোড়ো উঠানের
একাগ্রতায়
জানলা বন্ধ করতে গিয়ে আর একবার দেখি হয়ে উঠেছে উৎসব
অবজ্ঞাত নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে উৎসব জানলা দিয়ে দেখি
পোড়ো উঠোনে সংগোপন রহস্যময় অন্তরাল লুকিয়ে দোখ।

রবীন সুর

একুশে জুন, ১৯৭৩

দীর্ঘতম বিকেলের পশ্চিমে দাঁড়িয়ে

আমার মতন কেউ এতখানি কখনও নেভে নি—

যাদের দেখ্‌বো বলে ট্রপিক্যাল উজ্জ্বল্যে এবার

সমস্ত শহর চুঁড়ে ধুলোয় মিশেছি

তারা কেউ যথাযথ ধাতস্থ থাকে না

কিংবা সব ঠিক আছে, ব্যবহার বাতিল জামার

মতন আমি বা তারা উভয়ত অনাগ্রহে হিম

অথচ পিছন থেকে রাজপথে যে কোনও নতুন কণ্ঠস্বরে

উজ্জীবিত দ্বিতীয় পৃথিবী

কাছিয়ে আসে না

আকাশ আকাশময় এই দীপ্র গোধূলি অলোকে

কেবল ট্রাফিক জ্যাম অতর্কিতে লোডশেড বাহার দুর্গতি

সময় প্রতিমা কাটে দুর্গতির বিষাক্ত কৃপাণে

অথচ কোথাও দ্যাখো পবিত্র তীর্থের স্থান প্রতিষ্ঠা হল না।

শুভ মুখোপাধ্যায়

তোমার ভুবন

কখন গভীর রাতে নিরুপম সমুদ্দুর ডেকেছে, বাড়ি আছো

বাড়ি আছো তুমি ও মহীন—

আধোলীন অনিন্দ্য আকাশে আকাশে

নিরুপম, সাগর কি মনে তোর,

তিমির কে মনে রাখো নাকি ?

নাট্যাচার্য ভরত ও লোকায়ত মতবাদ

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ভরতের নাট্যশাস্ত্র যদি গভীরভাবে বিচারপূর্বক অধ্যয়ন করা যায়, তাহলে একটি বস্তু প্রতীয়মান হয় সেটি হচ্ছে এই যে আচার্য ছিলেন আদর্শের দিক থেকে মূলত লোকপন্থী, অর্থাৎ লোকরীতি, লোকসমাজের ও লোকনিষ্ঠাকেই তিনি প্রয়োগের দিক থেকে সর্বোপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। এই লোকচিন্তার সঙ্গে সুপ্রাচীন লোকায়ত মতবাদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান। অতএব তৎকালীন দেশাচার অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতার ঈষৎ ছায়াপাত তদীয় শাস্ত্রে ঘটলেও বাস্তব লোকায়ত মতই তাঁর গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকায়ত মতটি যে কী সে সম্বন্ধে স্বল্প আলোচনার প্রয়োজন।

লোকায়ত মতবাদ চার্বাক দর্শনের অন্তর্গত। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সম্যক প্রতীতি নেই। আর্য অধ্যাত্ম দর্শন চার্বাক দর্শনকে লোকসমাজে নিতান্ত হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে এবং এই দর্শন সম্পর্কীয় বিশিষ্ট আলোচনা যাতে লোকসমাজে বিলুপ্ত হয় নিরন্তর সেই চেষ্টার ফলে তার স্বাক্ষর খুব কমই রয়ে গেছে। কিন্তু চার্বাকগণ, তাঁদেরযেভাবে দেখানো হয়েছে,সেরকম ছিলেননা ; তাঁরাও যথেষ্ট শিক্ষিত এবং বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা ঘনিষ্টভাবে বাস্তববাদের সমর্থক ছিলেন। এই কারণে এঁদের এক সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত চার্বাক বলা হয়। এ ছাড়া ছিলেন ধূর্ত চার্বাক, বিতণ্ডাবাদী চার্বাক প্রভৃতিনানা শ্রেণীর লোকায়ত মতবাদের পৃষ্ঠপোষক যাঁরা বিনা যুক্তিতে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোনও

কোনও ব্যাপারকে স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত ছিলেন না। এই দর্শন যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নাম বৃহস্পতি। ইনি যে কোন্ বৃহস্পতি তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

লোকায়ত মত বলতে লোকের (অর্থাৎ ইহলোকের) মধ্যে প্রচলিত বা আয়ত্ত যে আদর্শ তাকেই বোঝায়। এঁরা বিশ্বাস করতেন প্রাণীসমূহের চৈতন্য মাটি (পৃথিবী) জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারটি তত্ত্বকে অধিকার করে আছে। এর বেশী আর কোন তত্ত্বে এঁদের আস্থা ছিলনা। প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনও প্রমাণকে এঁরা স্বীকার করেন নি। পুরুষার্থ বলতে এঁরা বুঝতেন অর্থ এবং কাম। মৃত্যুর সঙ্গে সর্বঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে এইটাই ছিল তাঁদের ধারণা এবং পরলোক বলে কিছু আছে এটা তাঁরা কোনক্রমেই বিশ্বাস করতেন না। এরকম জানা যায় যে বৃহস্পতি এই মতবাদ চার্বাককে প্রদান করেন এবং চার্বাকদের মাধ্যমেই এই মতবাদ একদা প্রসারলাভ করেছিল। যদিচ চার্বাকপন্থীদের অনেকে প্রকাশ্যে তাঁদের মতবাদ প্রচার করতেন কিন্তু অনেকে ছিলেন তাঁদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক ; আবার অনেকে হয়তো ঠিক উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের দর্শনে এই মতবাদ আরোপ করেননি অথচ মূল্যায়নকালে তাঁদের আদর্শকে লোকায়ত আদর্শ ভিন্ন আর কোনও আখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

আচার্য ভরত অনেকটা শেষোক্ত পর্যায়ে পড়েন। তিনি যে অধ্যাত্মবাদীদের হেয় প্রতিপন্ন করে নাটকে কেবল ইহজগতের ভোগবাদকে সমর্থন করেছিলেন আসল সত্য এই যে এটা সত্য নয়, তিনি নাটকের মাধ্যমে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারে ব্রতী না হয়ে, লোকসমাজে প্রচলিত প্রকৃত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে গ্রহণ করে মর্যাদাসহকারে নাট্যে স্থাপন করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। এর কারণ জনগণের নাট্যসমাজের ও জনচিত্তে শিক্ষা সংস্কৃতির উদ্বোধনই তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। আর একটা তত্ত্বে তিনি অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন সেটি হচ্ছে— এমন একটি সরল সংবেদনশীলতা যা শুধু সাধারণ চিত্তকেই নয় বিদগ্ধ

চিত্তকেও সমানভাবে আকৃষ্ট করতে পারে। সমগ্রভাবে বিচার কালে সমন্বয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষায় একটা বিচার প্রচেষ্টা ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয়না।

নাটক বলতে আমরা কি বুঝি এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যা করা হয়ে আসছে,—তার অনুকরণশিল্পই হচ্ছে নাটক। লোকায়ত মতের অন্যতম দৃষ্টান্ত বাৎসায়ণের কামশাস্ত্র। এই শাস্ত্রে বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা বর্তমান। কামসূত্রের জনৈক টীকাকার বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন ঃ

স্বর্গে বা মর্ত্যলোকে বা
পাতালে বা নিবাসিনাম্।
কৃতানুকরণং নাট্যমনাট্যং নর্তকাশ্রিতম ।।

এই শ্লোক থেকে এটা স্পষ্ট যে নাট্য বা নৃত্য যাই হোক না কেন —তা কৃতেরই অনুকরণ। এই অনুকরণাত্মক প্রচেষ্টায় একটি উত্তম পটভূমিকা আছে যা আমরা আচার্য ভরতের বর্ণনা থেকে পাই।

একদা ব্রহ্মার কাছ থেকে মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ নিবেদন করলেন— আমরা একটি ক্রীড়নীয়ক ইচ্ছা করি যা দৃশ্য হবে আবার শ্রব্যও হবে। বেদের যে ব্যবহার প্রচলিত তা শূদ্রজাতির সংশ্রাব্য নয়। অতএব অপর একটি পঞ্চম বেদ সৃজন করুন যা সার্ববর্ণিক হতে পারে। তখনকার পরিবেশ অনুসারে দেবতাদের কাছ থেকে এই প্রকার আবেদনকে অসামান্য উদারই বলতে হবে। আসলে এবম্প্রকার উক্তি থেকে লোকপন্থী আচার্য ভরতের স্বীয় মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। শূদ্রেরা সেযুগে ছিল সর্বপ্রকারেই অন্ত্যজ। আর্যসমাজের একটি সম্প্রদায় ক্রমেই এটা হৃদয়ঙ্গম করছিলেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর বর্ণে যদি শিক্ষার প্রসার না ঘটে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হবে। অথচ, সরাসরি এবম্বিধ প্রচেষ্টার সম্মুখে যে একটা বিপুল বাধা গুরুস্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উপস্থিত হত, এ বিষয়েও তাঁদের সন্দেহ ছিল না। অতএব, সব দিক বজায় রেখে অনুন্নত বর্ণ-

সমূহে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারের একটি চতুর পরিকল্পনা করলেন তৎকালীন কতিপয় বিশিষ্ট চিন্তানায়ক যাঁদের মধ্যে প্রধান অগ্রণী ছিলেন আচার্য ভরত ও তাঁর সম্প্রদায়।

এই যে সার্ববর্ণিক ক্রীড়নীয়ক অথচ শিক্ষাপ্রদ বিনোদ তার স্বরূপটি কি হওয়া উচিত তাও চিন্তা করে স্থির করা হল। এই পরিকল্পনাও একান্তভাবেই বাস্তবাশ্রয়ী। আর্য সৌন্দর্যদর্শনের এই প্রধানতম গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রে এমন কোনও বিষয়ের আলোচনা নেই যা বাস্তবানুগ বা লোকপ্রতীক নয়। যা কিছু সুন্দর তাকে বাস্তব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র থেকেই আহরণ করা হয়েছে। এই চিন্তা অনুযায়ী যে নাট্যের পরিকল্পনা করা হল তা ইতিহাস সম্পর্কিত, অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু পুরাবৃত্ত, কিন্তু তা কাহিনীতেই সীমিত নয়। তার মধ্যে যেসব উপাদান প্রযুক্ত হল তাতে সমস্ত শাস্ত্রের সার এবং সমস্ত শিল্পের নিদর্শন নিহিত রইল। এই প্রয়োগ থেকে ধর্ম, অর্থ, যশ প্রভৃতি সবই যাতে লাভ করা যায়, তারও ব্যবস্থা হল। নাট্যকে এমনভাবে প্রণয়ন করা হল যাতে এটি সর্বকর্ম পথদর্শপ্রকের ভূমিকা গ্রহণ করবে পারে।

এই নাট্যবেদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল লোকস্বীকৃতি। অপরাপর শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধিকার, কিন্তু নাট্যশাস্ত্র সর্বতোভাবে লোকাশ্রয়ী। আচার্য ভরত বারেবারেই নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে লোকের কাছে বিচারের ভার দিয়েছেন। লোকগ্রাহ্য হলেই তা রসোত্তীর্ণ হ'ল এইটাই আচার্য ভরতের ছিল সিদ্ধান্ত।

রস সম্বন্ধে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে ও দর্শনে অনেক তথাকথিত উচ্চস্তরের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু রসবাদের ভিত্তি যিনি স্থাপন করেছিলেন—সেই আচার্য ভরত রসকে একান্ত তৃপ্তিবিধায়ক পদার্থ হিসাবেই দেখেছিলেন। রসকে তিনি বৈদান্তিক স্তরেও উন্নীত করেন নি অথবা আলঙ্কারিকেরা রসকে যে সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেখানেও নিয়ে যাননি। একজন রসানুভূতিকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলেছেন যদি ব্রহ্মাস্বাদ নামক অলৌকিক অনুভূতি সম্বন্ধে

তাঁর এবং তাঁর পাঠকবর্গের কোনও ধারণা থাকবারই কথা নয়।

রস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভরত বলছেন যে রস ব্যতিরেকে কোনও অর্থই প্রবর্তিত হয় না। অর্থ এবং রস একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-সম্পৃক্ত। অর্থের মাধ্যমেই রস পরিস্ফুট হয়। আবার, যে বাক্যে কোনও রস পাওয়া যায় না সৌন্দর্য বিচারে তার কোনও স্বীকৃতি নেই। সে বাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একান্ত কার্যনির্বাহক সংলাপ—তার সাহিত্যিক মূল্য নেই।

রস নামক সংজ্ঞাটিকে তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। যেমন নানা ব্যঞ্জন এবং ভেষজ দ্রব্যাদির সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয় তেমনি নাট্যাদি সাহিত্যে নানা ভাবের উপগমে রসনিষ্পত্তি ঘটে। ভরত রসনিষ্পত্তি বলতে স্পষ্টই রসসিদ্ধি অর্থ করেছেন। তিনি বলছেন আস্বাদ্যত্ব হেতু এর নাম রস। যেমন রসিক সুজন নানা ব্যঞ্জনসংস্কৃত অন্ন আহারের সময় তার রস আস্বাদনপূর্বক হর্ষপ্রাপ্ত হন তেমনি সুমনা প্রেক্ষকগণ নানা ভাব, অভিনয়রঞ্জিত এবং বাক্-অঙ্গ-সত্ত্বযুক্ত স্থায়ীভাবগুলিকে আস্বাদন করেন। যেহেতু ভাবসমূহ বিবিধ অভিনয় সম্বন্ধীয় এই রসগুলির উদ্ভাবন করছে সেহেতু নাট্যপ্রযোক্তাগণ এদের "ভাব" বলে পরিজ্ঞাত হন। রসের উদ্ভাবক বলেই তা ভাব। যেমন নানাপ্রকার দ্রব্যের সহযোগে বহুবিধ ব্যঞ্জনের উদ্ভাবন করা হয় তেমনি ভাবসমূহ অভিনয়ের সহযোগে রসগুলির উদ্ভাবন করে। ভাবব্যতীত রস হয় না এবং ভাবও রসবর্জিত হয় না। যেমন ব্যঞ্জন এবং ভেষজের সংযোগে স্বাদুতার সৃষ্টি হয় সেই রকম ভাব এবং রস পরস্পরকে উদ্ভাবিত করে।

এই হচ্ছে রস সম্বন্ধে আচার্য ভরতের মতবাদ। এর মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। ভরত প্রয়োগ ও প্রয়োজনের দিক থেকে রসের বিচার করেছেন। আসল কথা হচ্ছে এই যে প্রেক্ষকগণ ভাবসমূহের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকেই তাঁরা রস আস্বাদন করেন। এ বিচার একেবারে লোকায়ত বিচার। যাঁরা একে বিকৃত করেছেন

তাঁরা ভরতের নামে নিজেরা এক একটা ফিলজফি করেছেন যা বাক্যবহুল কিন্তু ধারণা করবার মত কিছু নির্দেশ করে না।

আচার্য ভরত তদীয় শাস্ত্রে অভিনয়ের দুটি ধর্মের উল্লেখ করেছেন—একটি লৌকিক বা লোকধর্মী অপরটি নাট্যধর্মী। লোকধর্মী হচ্ছে সেই পর্যায়ের অভিনয় যা স্বভাব দ্বারা উপগত, অর্থাৎ একান্তভাবে স্বাভাবিক শুদ্ধ, অবিকৃত এবং কেবলমাত্রলোকবার্তা এবংলোকক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এতে একেবারেই অঙ্গলীলা থাকবেনা। আর, যে অভিনয়ে ক্রিয়া এবং ভাষণাদি স্বাভাবিকের অতিরিক্ত বা বহুলাংশে কৃত্রিম, লীলা ও অঙ্গহার যুক্ত বিশেষ স্বর ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ তাকে বলে নাট্যধর্মী। যদিচ আচার্যের মতে নাট্য সবসময় নাট্যধর্মী হওয়া উচিত তথাপি তিনি লোকধর্মী অভিনয়কে অস্বীকার করেন নি এবং লোকধর্মী আর্টেরও যে একটি বিশেষ মূল্য আছে তার উল্লেখ করেছেন। এখানেও তাঁর লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক এভাবেই আচার্য দুটি প্রয়োগকে স্বীকার করেছেন একটি আভ্যন্তর এবং অপরটি বাহ্য। যে অভিনয় মার্জিত এবং শিক্ষিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে আভ্যন্তর কারণ এক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োগেই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের আভ্যন্তর সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাহ্য অভিনয় হচ্ছে সেই অভিনয় যা আচার্যগণের অনুপদিষ্ঠ বা শাস্ত্র বহির্ভূত। সাধারণ ক্রিয়া বা আচার অনুসারে বাহ্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আচার্য ভরত যে নাট্যের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে সমস্ত দেশের অভিজাত থেকে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত সকলেই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন। বরঞ্চ যত সাধারণের আনুকুল্য পাওয়া যেত নাটক ততই স্বাভাবিক এবং জীবন্ত হয়ে উঠত। নাটক যাতে উচ্চকোটি অধিকারেই একান্তভাবে না থাকে এবং আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে সাধারণ প্রেক্ষকের পক্ষে দুরধিগম্য না হয় সে বিষয়ে তাঁর মতবাদ তদীয় শাস্ত্রে অনুচ্চারিত থাকে নি এবং বাহ্য অভিনয়ও এই কারণেই অনুমোদিত হয়েছিল।

নাটকের সার্থকতা বিষয়ে আলোচনাকালে আচার্য বিশেষভাবে

বলছেন যে নাট্যের ভাষা সরল অথচ সাহিত্যে গুণান্বিত হওয়া চাই। অভিনয়কালে অভিনেতার ভাষা বিশুদ্ধ বা বেদসংসিদ্ধ হলেই যথেষ্ট হল না তাকে লোকসংসিদ্ধ হতেই হবে। যা সর্বজনের গ্রাহ্য তাই নাট্যে বিধি অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। যাকে আর্ট থিয়েটার বলে আসলে আচার্য ভরত তারই সমর্থক ছিলেন ; তাঁর আমলেই নাটক প্রকৃত রসে রূপে প্রেক্ষণীয় বস্তুরূপে গরিগণিত হয় কিন্তু আর্টের তাবৎ উচ্চগুণকে স্বীকার করে নেওয়া সত্বেও তিনি লোকসামান্য রীতি, নীতি ও গুণ সমূহের প্রয়োগ সম্পর্কে সমান সমাদর প্রদর্শন করেছেন। তিনি যদিচ পৌরাণিক কাহিনীকেই নাট্যে রূপান্তরিত দেখেছেন তথাপি মানবিক উপাদানই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আখ্যানভাগ। আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক বস্তুর অভিনয় সম্পর্কে তাঁর বলবার কিছু ছিলনা এবং সেযুগের সমাজের শাসনের বিরুদ্ধেও তিনি যাননি ; কিন্তু প্রকাশ্যে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন পার্থিব লোকাচার সমন্বিত বিষয়বস্তুর প্রতি। এই কারণেই তাঁকে প্রচ্ছন্ন লোকায়ত মতের পৃষ্ঠপোষক বললে অত্যুক্তি হয় না।

ভরত প্রহসনের উল্লেখ করে গেছেন। এটি তিনি উল্লেখ না করলেও পারতেন ; কিন্তু এটি করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটি হচ্ছে এই যে, সেযুগে যে ব্রাহ্মণ ঋষি সম্প্রদায় সমাজকে শাসন করতেন তাঁদের মধ্যে নানা প্রকার দোষ ত্রুটি বেশ কায়েমী হয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের এই সমস্ত ভ্রষ্টাচারের ইতিবৃত্ত নিয়ে এবং তাঁদের নিন্দনীয় আস্ফালনাদি নিয়ে বেশ কিছু কৌতুকাভিনয় সম্পাদিত হতে আরম্ভ করেছিল। এগুলি সাধারণ দর্শকবৃন্দ বিশেষভাবে উপভোগ করতেন কারণ এই সব "স্যাটায়ার" কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও অসত্য ছিলনা। বলা বাহুল্য, শাসক সম্প্রদায় এতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরা নট সম্প্রদায়কে এর জন্য ভীষণভাবে উৎপীড়নে দ্বিধাবোধ করেননি। বহুকালের জন্য প্রহসনকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এমনকি

নাটকের অভিনয়ও মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। এই প্র:
সারাংশ হল এই যে সমাজের উচ্চকোটী থেকে সব সম্প্রদায়েই
সমালোচনা নাট্যের মাধ্যমে করা হোক এটা নাট্যপ্রযোজকগণ
চেয়েছিলেন কেননা এটা সমাজের পক্ষে হিতকারী হত। কিন্তু এতে
গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়লেন এবং, একটা 'প্রোগ্রেসিভ' প্রচেষ্টা
ব্যাহত হল।

অনেকের মতে সমগ্র নাট্যশাস্ত্র আচার্য ভরতের রচনা নয়, এর মধ্যে
বহু প্রক্ষেপ্ত আছে। হয়ত এটা সত্য, কিন্তু এই প্রক্ষেপ আমাদের
ভরতের মতবাদকে বুঝতে বহুলভাবে সাহায্যই করেছে এবং অত্যন্ত
কালোচিত হয়েছে। যাঁরা এই প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন তাঁরাও প্রধানত
প্রচ্ছন্ন সুশিক্ষিত লোকায়তবাদী এটাও অস্বীকার করবার উপায়
নেই।

কবিতাবলী

বিমান ভট্টাচার্য

তোমাকে আমাকে

জানতে গেলে
জরিমানা দিতেই হবে
আমাকে

সামনে গেলে
চোখের জলে ভাসতে হবে
আমাকে

রাত ফুরোলেই
ব্যস্ত করবে ঘর কন্না
তোমাকে

রাত্রি হলেই
ডাকতে হবে
তোমাকে
আমাকে।

প্রদীপ রায়গুপ্ত

সঙ্গিনী

কাটে না আর দিনযামিনী, কাহাকে আমি সঙ্গী নিই
প্রতিভাহীন লক্ষ্যহীন দেবতাহীন আঁধারে।
ঈশ্বরের মধ্যে বুঝি খুঁজিতে হবে গাধারে,
কিংবা গাধার মধ্যে তোমায়—হে ক্ষমাহীন সঙ্গিনী,
নিছক মিলের জন্য শেষে তোকেই এনে বসালাম,
ছন্দোনিপুণ বন্ধুরা কেউ—নিশীথ কিংবা বীতশোক—
উঠবে হেসে, আর এদিকে তোরও লোলুপ খর চোখ
উঠবে জ্ব'লে দীর্ঘ জিভে খাচ্চো চেটে তিক্ত ঘাম।

জয়ন্ত সান্যাল

নির্বাসনে খুঁজি গভীর ঘুম

জীবন থেকে নিজেকেই নির্বাসন দিতে চেয়ে
আমি একাকী দাঁড়াই বধ্যভূমিতে; সুদেষ্ণার
অভিমানের মতো হালকা জ্যোৎস্না
শীতের হাওয়া মেখে শির্ শির্ করে'
কাঁপে; সরযূর তীরে পৌঁছে ছায়াসিক্ত
বালিয়াড়ে শুধু ঘটে যায় আলো আঁধারের অশালীন
অঙ্গভঙ্গী; আমি চোখ ফেরাতে পারি না
বিস্তীর্ণ বালুতটে খুঁজে বেড়াই
কাথাও পড়েছে কিনা পায়ের আঁচড়

কা'কে যে সে চেয়েছে নিরন্তর
অবসর বিকেলে অথবা তুষারসিক্ত রাতে।
বাইশ বছর ধরে আমি তো ক্রমাগত
বিদ্ধ হয়েছি অভিমানে ; আজ
আর যেতে পারি না কোথাও
শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে নিজের নির্বাসনে খুঁজি
গভীর ঘুম ; ক্লান্ত হলে সুদেষ্ণা
অভিমান থামিয়ে বলে না, 'তুমি যাবে কতদূরে ?'

প্রত্যুম্ন মিত্র

প্রেমের সন্ত্রাসে

ইচ্ছার ভিতরে ছিলো জটিল বালক,
নির্মম মরণশীল হাওয়া এসে ভরে দিলো ঘর ;
চারিদিকে অতিক্রান্ত বিকেলের কয়েক পলক
ঝরিয়ে গিয়েছে আরও কিছু নীল বিবর্ণ অক্ষর ;
মৃত আগুনের নিচে হয়তো বা হৃদয়ের শব
প্রেমের সন্ত্রাসে থেকে জন্ম দেয় ইচ্ছার বিক্ষোভ

তবু স্মিত অবসিত বিভ্রমের মতো চন্দ্রালোকে
আহ্বত আহ্বত তার লুপ্ত এলোবেশে
তটগ্রীবা গাঢ়তাকে ঢেকে বা অক্লেশে
বিবর্ণ অক্ষরগুলি পুষ্পিত করেছে তার
যুবকের শোকে।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

অচিনপুর

আহা, কোন্ অচিনপুরে পা দিয়েছিস্
ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না,
শুভ্রতাব কোন্ হাসিতে মিলিয়ে আছিস্
সজল চোখে দেখা যায় না।
এ কোন্ সময় ? ঘুমিয়ে আছিস্
জানলেও যে ঘুম পায় না।

মঞ্জুভাষ মিত্র

ধ্বনিত ধ্বনির বেদনারা বাজে

ধ্বনিত ধ্বনির বেদনারা বাজে এইখানে সারাদিন
ছায়ামরালেরা জলের হৃদয়ে শুয়ে থাকে উদাসীন
লাজুক মাছেরা শ্যামলার বুকে পুরোনো রেখাটি দেখা যায়
স্ফটিক স্বচ্ছ নির্ভীক চোখে আকাশের নীল চোখে চায়
যদি নেমে আসে সেই অপরূপ সপ্তরঙীন পাখী
ঠোঁটে করে দূরে মেরুন সাগরে একদিন নেবে নাকি !
খিল খিল করে হেসে চলে যায় নিষ্পাপ জল ঝাঁঝি
শিকড়ের ব্যথা শরীরে তাদের কখনো ওঠেনা বাজি
নেমে এসে রোদ করে অনুরোধ ফুলগুলি ঝরে যায়
সম্মতি ভরা মৌন বাকলে তরুণী তরুটি চায়
আর ফেরে এক বর্বর ব্যাধ হাতে নিয়ে কালোতীর
চারদিকে জমে দৃশ্যের দেহ, মৃত ও মৃতের ভীড়
গুহাগহ্বরে মুখটি লুকিয়ে ভয়ে সব হ'ল ক্ষীণ
ধ্বনিত ধ্বনির বেদনারা বাজে এইখানে প্রতিদিন ।

রমা ঘোষ

ক্ষণিক বিভ্রম থেকে

জলের সরের তুল্য ক্ষণিক বিভ্রম থেকে মুক্ত কর প্রভু!

দুঃখপুঞ্জ জড়ো করে শৈত্যবাহী ফেনায়িত করুন জলদ।
হৈমন্তিক জীর্ণপত্র হলুদ উল্কির ছাপ কদাপি চাইনি।
নীল জ্বরে শোষমান বিশাল শরীর রক্ত গ্রন্থির বন্ধন!
আশার দুহাত লুঠে পায়েস পাতার গন্ধ নিয়ে যায় বায়ু।
মুখের সারল্যে ঘুন, কেশগুচ্ছ খসে খসে শূন্য রোমকূপ!
খামারে গোধূম নেই, ধান নেই, রিক্ততনু শিমূল দাঁড়িয়ে,
দুর্বাদল মরে গ্যাছে, দুর্বার অভাবে মৃত শান্ত চোখ গাভী।
নির্বিশেষে সব যায়, যাওয়ার নিত্য অর্থ ক্ষণিক বিভ্রম
বাষ্পায়িত জলকণা ফিরে আসে, পুনঃ ফেরে ষোলকলা চাঁদ,
অযথা কেন যে দুঃখ আঁকি বুঁকি তিক্ত স্বাদ বিপন্ন সংশয়!
জটিল বিলাসে তুমি আমার সহিত খ্যালো মায়াবদ্ধ পাশে,

জলের সরের তুল্য ক্ষণিক বিভ্রম থেকে মুক্ত কর প্রভু!

মহম্মদ রফিক

বকুল

কোথায় আমার হারিয়ে গেলে
বকুল বেলার বকুল—
আমাকে কেউ বলতে পারো নিদাঘ দুপুর বাতাসে
কেমন করে ঝরে পড়লো সেই বকুল

অন্ধকারকে বুকে রেখে ফুটিয়েছিল পূর্ণিমা রাত
সেখানে আমার নিমন্ত্রণ।
বলেছিল সিঁড়ির সোপান পার হয়ে এসো
বিকেল হবার আগেই চয়ন করে নিও তোমার বকুল।
আমি তো ছুটেছিলাম—
বন্ধুর অতিক্রম করে
গন্ধ ছড়ানো ফুটন্ত সেই বকুলের কাছে
কিন্তু কোথায় আমার বহু সাধনার আজন্মলব্ধ ধন সেই বকুল।
তবে কি আমারই অপেক্ষায় পরিশ্রান্ত হয়ে
অন্যের মালায় নিজেকে করেছে সমর্পন?

প্রদীপ রায়চৌধুরী

এখন একা

তোমাকে স্মরণ করি এখনও কবিতায়।
সঙ্গোপনে প্রেম রাখি হৃদয়ের ভ্রমরকৌটোয়
এতদিন পর এখনও আঁধারে বৃষ্টির ছন্দ শুনি
মোমবাতি জ্বালাই ধীরে অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে
দমকা হাওয়ায় উড়ে যাওয়া আধ-ফোটা কবিতার কথা
তুলে আনি টেবিলের পর এখনও একা একা
শুধু ধুলো-ঝড়ে ঢাকা চশমার কাচ মুছতেই
তোমার আঁচল খুঁজি নিজেরই অজান্তে
ভীষণ একা একা।

স্বপ্না মজুমদার

হাওয়া এসে ডেকেছিল

আমার বন্ধ ঘরের জানলায় হাওয়া এসে ডেকেছিল।
এ জানলা থেকে ও জানলা ; এ দরজা থেকে ও দরজায় ডাক
দিতে দিতে
এসেছিল সেই মুক্তিদূত,
উৎসবে সবাইকে নিয়ে যেতে।
তার ডাক শুনে,
আমার বহুদিনের বন্ধ ঘর খুলেছিলাম ;
আর স্নান করে বাগানে গিয়েছিলাম,
শিউলি ফুল তুলে উৎসবে নিয়ে যাবার জন্য।
স্বার্থপর দৈত্যটার কথা তখনও ভাবি নি।

কিন্তু কি হলো,
উৎসবে গিয়ে দেখি,
স্বার্থপর দৈত্যটা অদূরে দাঁড়িয়ে আছে,
আর তার ডাকে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে ;
আমার হাত থেকে শিউলি ফুলগুলো ক্রমশঃ পড়ে যাচ্ছে
এক, দুই, তিন······
আর তবুও তোমরা বলছ,
ব্যাপারটা নাকি খুবই স্বাভাবিক॥

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

তোমার কাছে হাত পেতেছি

শেষ আলোতে তোমার মুখের ছায়া
দুলছে
প্রথম আঁধারে তেমার ভালবাসা
আলেয়া আঁকছে
একের পরে এক প্রতিবিম্ব নিয়ে
তোমার কাছে হাত পেতেছি
নিঃসঙ্গ ভালবাসার সিঁড়ি বেয়ে
অনেক নীচে নেমে এসেছি
ফিরে দ্যাখো
শেষ আলোতে তোমার
প্রতিবিম্ব দুলছে।

অজন্তা মিত্র

কবির কাছে প্রশ্ন

গোলাপগুচ্ছ থেকে
একটি ছিঁড়ে নিলে,
কেমন লাগে?
—'স্বপ্নময় পবিত্র সুখ!'
বন্য প্রকৃতি থেকে
একটি বাঘ বা ময়ূর?
অসীম সমুদ্র থেকে
একটি রঙিন মাছ?
—সদাস্ফীত আনন্দ ও সুখ।
(আর) তোমার কবিতাগুচ্ছের
শুধু একটি চুরি গেলে?

ঢাকা পেইন্টার্সের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী : চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় হল, ঢাকা, বাংলাদেশ ॥

প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের একটি উক্তির অনুসরণে বলতে হয় যে শিল্পকলা মানুষের অন্তর্নিহিত মূল সৃষ্টি শক্তির উৎসাহ থেকেই উৎসারিত হয়। রসভাবের অভিব্যক্তির ক্ষুধাই তার কারণ, উচ্চ আদর্শের আর্ট জ্ঞানীকে আকর্ষিত করে এবং রসভাব জাগায়। আর্টকে সৌন্দর্য্য পূর্ণ করবার বহুপূর্ব থেকেই রূপায়িত হতে থাকে মানুষের মনের মধ্যে এবং তখনই তা সত্য হয়ে প্রকাশিত হয়। আর মহান আর্ট নিজস্ব সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সব সময়েই অতি সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, কেননা মানুষের প্রকৃতিতে রূপায়িত করার বিশেষ শক্তি প্রছন্ন থাকে এবং তা ক্রমে ফুটে উঠে তার কাজে প্রত্যেকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনুসারে।

সম্প্রতিকালে বাংলা দেশে ঢাকা শহরে চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের দশজন ছাত্র-ছাত্রীর চিত্র প্রদর্শনী চলেছিল ২০শে থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত। এই প্রদর্শনী এদের প্রথম প্রচেষ্টা। এদের ভাষায় কিছুটা দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। ঢাকা পেইন্টার্স নামের আড়ালের এই গোষ্ঠির দশজন শিল্পীর ৫৯টি চিত্রের এই প্রদর্শনী এদের খানিকটা উৎসাহ জুগিয়েছে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে বলতে হয় এই প্রদর্শনীর কিছু কিছু ছবির মধ্যে অনেকের সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। এই সঙ্গে এই কথাও বলতে হয় অনেকের ছবি প্রদর্শ হিসাবে দেবার আগে চয়নের অবকাশ ছিল। এ বিষয়ে প্রবীনদের উপদেশ ও সাহায্য নেওয়া উচিত বলে মনে হয়।

আলাদা আলাদা ভাবে শিল্পীদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ উত্তম দে অঙ্কিত জলরং-৪নং ছবিটি উডকাট

১ ও ২ নং, তরুণ কুমার ঘোষের জলরং ১ ও ২নং নজরুল হোসেনের স্কচ্-২নং, বিমল বনিকের পুরানো ঢাকা ১নং, স্কেচ, মাসুদ উল আলমের জলরং ৪নং, উডকাট, রওশন হক দিপার ড্রইং ১ ও ২ নং, শাহনাজ নাসির কুহু কলেজ প্রাঙ্গণ, জড়জীবন, সুকুমার পালের রামপুরা, রায়ের বাজার ২নং জেলে পাড়া প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর লক্ষ্যনীয়।

মাসুদ উল আলমের জলরংয়ে আঁকা পোর্ট্রেট, রওশন হক দিপার আঁকা ছবির রং নির্বাচন এবং সামগ্রিক effect উল্লেখযোগ্য। তরুণ কুমার ঘোষের জলরংয়ের ছবি ২টির রং নির্বাচন ও Perspective সম্পর্কে ধ্যান ধারণা, অনুরূপ ভাবে বিমল বনিকের পুরানো ঢাকা-১নং ছবিটির Perspec·ive সম্পর্কে জ্ঞান এবং স্কেচের ড্রয়িং ও detail ও সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা মনে করিয়ে দেয়। শাহনাজ নাসির কুহু ও সুকুমার পালের অঙ্কনের মধ্যে বলিষ্ঠতার ছাপ থাকলেও এদের অনুকরণপ্রিয়তা ভীষণ ভাবে চোখে লাগে। বিশেষ করে শাহনাজ নাসির কুহুর ছবিতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও সুকুমার পালের নিসর্গ চিত্রের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী জয়নাল আবেদিনের চিত্রাবলির অন্ধ অনুকরণ বলে মনে হয়। কাজী রকিবের জলরং ১নং ও উডকাট ১নং এবং ২ নং ছবিটি শিল্পীর নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছে। নজরুল হোসেনের স্কেচ্ ২নং ছবিটি সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে গেলে আর্টে বিভিন্ন ষ্টাইলের বিষয়ে কোন বিশেষ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন এক শিক্ষকের কাছে বহু ছাত্র পাঠ নিলেও সকলের সৃষ্টির ধরণ এক নয়। ষ্টাইল শিল্পীর অজ্ঞাতেই জন্মায়। জোর করে কোন ষ্টাইলের নকল করলে তার নিজস্ব শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। এর জন্য চাই অনুসন্ধানী মন এবং সত্যিকারের শিল্পী সুলভ প্রচেষ্টা।

আলোচ্য প্রদর্শনীর শিল্পীরা সকলেরই বয়স এবং অভিজ্ঞতায় নবীন। এদের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে ধ্যান ধারণার জন্য আরও অনেক

প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের (Mıstet Painters)ছবি দেখা। এদের অঙ্কন প্রণালী রঙ নির্বাচন, বিষয় বস্তুর মৌলিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজেদের অনুশীলন করলে ভবিষ্যতে এই জাতীয় প্রদর্শনী হয়ত আরও সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এই সূত্রে আরও একটা কথা মনে পড়ল এবং ভালো লাগলো যে শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বেশ কিছু ছবি বিক্রী হয়েছে, যা কলকাতায় কোন প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনীতেও চোখে পড়ে না।

সর্বশেষে একটা কথা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে কিছুকাল পূর্বে যে মূল্য দিয়ে এই স্বাধীন দেশটি সৃষ্টি হয়েছে সেই মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারে এই কথাই বলা যায় শিল্প সৃষ্টির জন্য শিল্পীদের মানসিকতা অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এর মধ্যেও তরুণ শিল্পীরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করে চলেছেন এর জন্য এদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমরা আশা করব এদের পরবর্তী প্রদর্শনী আরও বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

অসীমকুমার ঘোষ

পরিমল চক্রবর্তী

উইলিয়ম শেক্সপীয়র, সনেট তেত্রিশ

অনেক গৌরবময় প্রভাতকে দেখি নিরন্তর
দোলায় পর্বতশীর্ষ সার্বভৌম দুই চক্ষু দিয়ে,
এবং চুম্বন ক'রে স্বর্ণ মুখে সবুজ প্রান্তর
স্বর্গীয় দ্যুতিতে ম্লান স্রোত ধারা যায় যে রাঙিয়ে ;
আর না, সম্মতি করো, তুচ্ছ মেঘও উর্দ্ধপানে যাক
কুৎসিত ক্ষতকে নিয়ে আপনার দিব্য মুখশ্রীতে,
এবং সুদূর হ'তে তার সেই মুখশ্রী লুকাক,
পশ্চিমে অদৃশ্য থেকে এই তীব্র অসম্মান নিতে :
এভাবে আমারও সূর্য জ্বলেছিলো প্রথম প্রহরে
আমার ললাটে নিয়ে সর্বজয়ী গৌরবের আলো ;
অথচ, হায়রে ভাগ্য! সে তো ছিলো শুধু ক্ষণতরে,
সম্প্রতি আংশিক মেঘ তাকেও যে করে দিলো কালো।
অথচ আমার প্রেম তবু তাকে করে নাই হেয় ;
পার্থিব সূর্যেরা সব কলুষিত, যখন স্বর্গে-ও।

উইলিয়ম শেক্সপীয়র, সনেট আঠারো

গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুল্য তুমি, কী ক'রে তা ভুলি ?
আরো বেশী রমণীয়, আরো বেশী পরিমিত তুমি :
দোলায় দুরন্ত বায়ু বৈশাখের প্রিয় কুঁড়িগুলি,
এবং গ্রীষ্মের লগ্ন, আয়ু তার বড়োই মৌসুমী।

কখনো স্বর্গের চক্ষু বড়ো বেশী তপ্ত হয়ে জ্বলে;
এবং প্রায়শঃ তার স্বর্ণ-আভা মলিন, পাণ্ডুর ;
এবং প্রত্যেক রম্য নেমে আসে রম্যতার স্থলে
দৈবাৎ, অথবা স্থির প্রকৃতির গতি যে বিধুর ;
অথচ তোমার চির গ্রীষ্ম ঋতু মুছে যাবে নাতো,
অথবা সে-সুন্দরতা হারাবে না যা তুমিও চাও,
অথবা তোমাকে মৃত্যু মাতাবে না যদি দূরে মাতো,
যখন শাশ্বত রেখা সময়ের হয়ে আয়ু পাও ।
যতদিন মানুষেরা বেঁচে থাকে, চক্ষু দেখে যায় ।
এ-ও বাঁচে ততদিন, আর প্রাণ দেয় তা তোমায় ।

অসিত দত্ত

অন্ধার দাভিচো

॥ ১ ॥

আমরা বেড়ে উঠলাম, শিক্ষক আর গোলাপের ভিতর,
চকোলেট, চুমু, পিতামাতার সহবিষে
যাঁরা সব সময়ই কোন কিছুর জন্য প্রস্তুতি নিতেন।
বেড়ে উঠলাম দিনে গাছে।
দিনে অন্ধকার বাগানে।
গাছে সাদা শয্যায় ।
এবং চমকে আর আঘাতে বিপুল গোপনতা, জটিলতা
মাসতুতো পিসতুতো বোন, মাসিপিসি, রাঁধুনী, কাকীমা
এবং পিতামহের ভয়াবহ গল্পে ।
যেখানে সেই দৈত্য মাটির নিচে বাস করে
আর নরঘাতক।

আর চাষীদের গল্পে, যারা সার্বিস বলে।
কেননা নির্বোধ তারা।

রাত্রে আমাকে, সৎ শিশুদের, পরী এসে পাহারায়
রাজপুরী, স্বপ্ন
এবং শহরের পুলিশ।
ঈশ্বর অবশ্য আলমারির আড়াল থেকে দেখতেন
আমরা হাত দিয়ে
লেপের তলায় কী করি।

বৃথা। সবই বৃথা।
আমাদের স্বপ্নের মধ্যে সব সময়
লৌহনির্মিত, সুকেশ রূপকথার দুই লিলিপুট
মৃদু পদক্ষেপে এসে প্রশ্ন করত ভারী গলায়
কে আমাদের বলেছে পিতামাতার মতো
পিতামাতার মতো...
লজ্জা না পেয়ে
কী করে শিশুর জন্ম হয়।

আমরা বেড়ে উঠলাম, অতি, দ্রুত, দমবন্ধ
দিনের সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো
অশান্তি আর ভয়ের সাথে
এবং প্রার্থনা করে, ভরা আশায়
যেন আমরা অতি দ্রুত
'বো' আর দাড়ি
দেখাতে পারি, যেন টুকরোগুলি
গুঁড়ির থেকে দূরে না ছড়িয়ে পড়ে।

॥ ২ ॥

পিতামহ মারা গেলেন,
খুব স্বাভাবিক।
যেন কিছুই নয়।
যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন।
যেন তিনি কাল
খুব ভোরে
সকালে বাজারে যেতে
জেগে উঠবেন।
পিতামহ খুব হঠাৎ মারা গেলেন,
অতিথিরা সবে মাত্র গেছেন,
মা চিৎকার করে
পড়লেন,
আর আমাদের গলায়
পাথরের খোঁচা লাগল,
যেগুলি আদৌ
পাথর নয়।

তখন জ্বলন্ত মোমবাতির এধারে ওধারে জ্বলতে শুরু করল,
তখন স্কন্ধকাটা মাকিরা ঝড়ের মতে উড়ল
সব ঘরে
উপরে
নিচে
কোনকিছু অন্বেষণে—
হায়, তারা প্রায় অধিকৃত
কোন কিছু খুঁজে পেতে।

চি ঠি প ত্র

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা ও পত্রাবলী

[সঞ্জয় ভট্টাচার্য একটি ধ্রুপদী-ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে সেখানে উত্তর আকাশের সেই পরিচিত আলোক বিন্দু এ কথা ঘোষণা করলে নিঃসন্দেহে অগ্রজদের কাছে এবং আগামীকালে আমি ভৎসনা পাব না। পত্রাবলী মাত্র কয়েকখানিই প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রের অনেক অংশ বাদ দিয়েছি প্রসঙ্গ যেখানে একান্ত ব্যক্তিগত।

উত্তরসূরি-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অরুণ ভট্টাচার্য আমাকে দায়বদ্ধ করলেন এই অপ্রকাশিত কবিতা ও পত্রাবলী উত্তরসূরিতে প্রকাশ করে। আমার আনত কৃতজ্ঞতা ছাড়া আমি আর কিই বা দিতে পারি। দেবপ্রসাদ ঘোষ]

১৬.৬ দেশিমগুর রোড
কলকাতা ৩১
১০ই চৈত্র, ১৩৭১

ভাই দেবপ্রসাদ,

তুমি কাল গেলে পরই বৃষ্টি এলো। পথে অসুবিধায় পড়েনি তো?

তোমার কবিতা দুটো বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে পড়লুম। 'ঘর' প্রথম পাঠেই ভালো লাগল। মাঘ সংখ্যায় দিলুম। ওখানে বন্দর কথাটা মনোরম। দেখবে মাঘেই…কবিতায় বন্দর আছে কিন্তু বিধ্বস্ত।

কাল আষাঢ়ের আবহাওয়াই ছিল; তবু আষাঢ় অনল (২) যেন চর্যাপদের ছোঁওয়ায় মনে মেঘদূতের ছোঁওয়া মুছে দিতে চেষ্টা করছে। আষাঢ় এলে ও কবিতাটা আবার পড়ব।

এই নাও তোমার '২৬শে জানুয়ারীর কবিতা':

[দ্রাবিড় শহিদদের উদ্দেশে নিবেদিত]

তাঁদের অনেক রক্ত ফুলে তুলে রাখি
আমার ফ্লাওয়ার ভাসে, পাছে ভুলে যাই।
রক্তজবারঙে ভাসে বাঁধি লাল রাখী।
ইমনে বাজাই মনে ভোরের শানাই ঃ
যে সুরে অলকনতি বাহির ও ঘর
কল্যাণ কামনা করে মিলিয়েছে, তাই।
আজতো চিনিনে আর কে আপন পর,
বিলিয়ে দিয়েছি সব, যাছিল বা বাকি।
শহিদের নাম মুছে প্রজার সহিত, পরস্পর
তবুতো চিনিনে, স্বীয় গতি ছাড়া নাই।
ইচ্ছে হয়, রক্তকরবীর গুচ্ছ, ভাসে যা সাজাই
তুলে এনে দুই হাত স্মৃতি রক্ত মাখি।।

ভাই দেবপ্রসাদ,

তুমি যে ধরণের কথা ভাবছ তা বোধ হয় 'উর্ব্বর উর্ব্বশী'তে পাবে। ভারতীয় দৃষ্টিতে Fertility cult কে দেখতে চেয়েছি ওই দীর্ঘ কবিতায় অনেক কারণে। মাঘে বইটা আমার বার করতে হবে। আধুনিক কবিতার ভূমিকা বইটা আমার কাছে এনে রেখেছি।

ইতি—
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাশা
৭৬।৬ সেলিমপুর রোড কল-৩১
১-৪-৬৫ ইং

ভাই দেবপ্রসাদ,

তোমার আগেকার চিঠির উত্তর দিয়েছি? ২৮।৬ তারিখের চিঠি কাল পেলাম?

প্রাক বৈদিক, বৈদিক যুগ থেকে সম্প্রতিকাল পর্য্যন্ত নর নারীর প্রেমে ও ভারত ভূমিতে যে উর্ব্বরতা ও অনুর্ব্বরতার দ্বিধারা চলেছে 'উর্ব্বর উর্ব্বশী' লেখবার সময় তা-ই আমার মনে ছিল। ষাটের দশকের কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা। পূর্ব্বাশারও।

ইতি

শুভার্থী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

২১-১০-৬৫ ইং

কল্যানীয়েষু

ভাই দেবপ্রসাদ,

কাল তুমি আসবে ভেবেছিলাম। তোমাকে নয় তোমার I, L, কে পেলাম। 'উর্ব্বর উর্ব্বশী' সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য আমি কার্ত্তিক সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখেছি, যে সম্পাদকীয়র নাম 'আমার ঐতিহ্য।' তোমার ও নরেশের চিঠির ফলেই আজ তা লিখলাম। কার্ত্তিকে তোমার ছোট প্রবন্ধটি যাবে আর শারদীয় আশ্বিনে তোমার 'সেই আমি' কবিতা যাচ্ছে।...কবে যে আশ্বিন সংখ্যা বার করতে পারবো জানিনে।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

অনুজ প্রতিমেষু

পেছনে আঁধার থাক্ সম্মুখে আলোক।
যাত্রী, যাত্রা চায় নব অনির্ব্বাণ চোখ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

১লা জানুআরি

১৯৬৬ ইং

শ্রীদেবপ্রসাদেষু,

কোকিল পায়না কিন্তু
বসন্তবিহনে কোন রস
খড় কুটো নিতে আসে শীতে
বয়স্ক বয়স ॥

(জন্মদিনে) সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

পিছু ডাক শুনবার
নেই অবসর
সম্মুখে জাগ্রত যদি
নতুন বছর ॥

সঞ্জয়দা

১লা বৈশাখ

১৩৭৩

শ্রীতিভাজনেষু

'অমর' আগুন আমার রচিত একটি 'Waste Land, এ ছড়িয়ে দিয়েছে— তোমার তোমার আষাঢ় আগুনের প্রতীক্ষায় আছি দেখতে চাই তোমার নাচিকেত অগ্নি। উর্দ্ধে ওঠো—এই চাই-ক্ষুধিত কুকুর চন্দ্র দেখে চিৎকার করুক, কী ক্ষতি? ভবিষ্যতে আমার আশা আছে তোমারই আমার ভবিষ্যত।

শুভেচ্ছা নাও।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রীতিভাজনেষু

দেবপ্রসাদ তুমি চলে যাবার পর হাতে এক ঘণ্টা সময় ছিল। তখন তোমার 'আষাঢ় অনলের' কয়েকটি কবিতা পড়লাম। তাতে আমার এই ধারণা হয়েছে জীবনানন্দের পর সার্থক কৃষি-জীবনের কবিত তুমিই লিখতে পারবে। মাটীর উর্বরতার সঙ্গে তোমার যে ঘনিষ্ঠতা, তা বিফল হবে না বলেই আমার আশা। আষাঢ় অনলেরই মাস, পৃথিবী যখন রজঃস্বলা হয়। কামরূপ পীঠের যোগীনি-তন্ত্রের এই মতসারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল কৃষি সভ্যতার উন্মেষের দিনে। আমরা যদি কৃষির পুনরুজ্জীবন চাই—তা হলে তোমার কবি মনের আদর নিঃসন্দেহ।

ইতি
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কল্যানীয়েষু

ভাই দেবপ্রসাদ,

তোমার ২৭শে অক্টোবরের চিঠি পেলাম। আশ্বিনের পূর্ব্বাশা ২০ ফর্ম্মা হয়ে গেল, একটি নাটিকা বাদ দিয়েও। বরাদ্দ ফর্ম্মার চাইতে ৫ ফর্ম্মা বেশী। তার মানে ৩০০ টাকা ঘাটতি। আমরা আর কুলোতে পারছিনে। পূর্ব্বাশা সব সময়ই লেখক ও তাঁদের পাঠকদের কাগজ। সম্পাদক ও প্রকাশক পরিবেশক মধ্যস্থ ব্যক্তিমাত্র। আমার অনুরোধ, পূর্ব্বাশার ভার লেখক ও তাঁদের পাঠকরা গ্রহণ করুন। এসো একদিন এ সম্পর্কে আলাপ করা যাবে।

আজ সকালে তোমার জন্য একটি কবিতালেখা হলো (দয়াসিনী)

সঞ্জয়দা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কবিতা ছুটি চিঠিপত্র দেবপ্রসাদ ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
সম্পাদক : উত্তরসূরি।

আধুনিক কাশ্মীরী কবিতা

কাশ্মীরী সাহিত্যের পাঠক যে প্রায় নেই-পর্যায়ের, এ কথা স্বীকার করতে বা জেনে নিতে কুণ্ঠা হ'লেও তা দিনের আলোর মত সত্য। শিক্ষিতরা উর্দু হিন্দী বা ইংরেজি নভেল নাটক ছোটগল্প পড়ে থাকেন কিন্তু কাশ্মীরী রচনা পড়বার কথা কাশ্মীরীদের মনে আসে এসব পড়া শেষ হবার পর। আর গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যখন এই অবস্থা তখন কবিতা পড়বার লোক তো আরও কম। কিন্তু খুবই আনন্দের কথা, কাশ্মীরী কবিতা আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের সব থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছয় শতাব্দী আগে সুফী দর্শনের হাত ধরে কাশ্মীরী কবিতার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজও অব্যাহত রয়েছে। যন্ত্রণাজর্জর যুগের আশা নিরাশা সুখ দুঃখ প্রবঞ্চনা শূন্যগর্ভতা সব কিছুই বিধৃত হয়েছে আধুনিক কাশ্মীরী কবিতায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাশ্মীরী সাহিত্য বলতে শুধু-মাত্র কবিতাই বোঝাত; ইদানীং অন্যান্য শাখায় সৃজনধর্মী রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতা প্রায় সর্বস্তরের লোকেরাই লিখে থাকেন। যাঁরা বই বাঁধান, গাড়ি চালান, এমন কি চাষ-আবাদ ও কুলিগিরি করেন তাঁদের স্তর থেকেও অনেকে কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।

সুফী দর্শনে বিশ্বাসী কিছু কবির কবিতা সম্প্রতি বেরিয়েছে। জিন্দা কওল ও শংকর কওল নামে দুই বর্ষীয়ান কবির প্রশস্তি সংবলিত "জু উ স্তাদ" (জে-এন-বকসী রচিত), স্বামী গোবিন্দ কওলের "গোবিন্দ অমৃত", সতুরা ত্রলের "দীওয়ানী সুফী রজব হামিদ" এই দর্শন সম্পর্কিত তিনখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। স্বামী গোবিন্দ কওল মনে করেন "পনই তস বনী যস বনী জানিয়ে" (আপন

চেষ্টাতেই জ্ঞানলাভ হয়)। তরুণ সজ্‌দ সয়লানীর "শহজর" কাব্য-গ্রন্থে "বক" (বক কবিতায় প্রকাশভঙ্গীর এক সুপ্রাচীন বিশিষ্ট আঙ্গিক) এর সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। সজ্‌দের বক নূনে ধরনের ; শব্দপ্রয়োগ রীতিমত বিস্ময়কর। সজ্‌দ ছোট ছোট ছন্দে লিখতে ভালবাসেন। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসে লেগেছে বর্তমান যুগের রূঢ় বাস্তবতার ছোঁয়া। তিনি বিশ্বাস করেন এ যুগের দুঃখ প্রবঞ্চনা মানুষকে ব্যথাই দেয়, এ যুগ মানুষকে আশার আলো দেখায় না। তাই তিনি অনেক কবিতায় মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখতে নীতিবাদ প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—কখনো সহজ সরল ভাষায়, কখনো ব্যঙ্গের মাধ্যমে। তাঁর মোহভঙ্গ ও হতাশার চিত্র নিচের পংক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ;

অসী গোরমুত ওয়াস বুস তাজমহল কস আস খবর পেবি ছলি ছলি জানূহ্ (কে জানত আমাদের তৈরী সাধের তাজমহল এমন করে ভেঙে যাবে ?)।

দীননাথ নাদিম "জঙ্গবাজ খবরদার" ও "মে ছাম আস পগস" ইত্যাদিতে যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ রেখেছিলেন, "কুর" (চোর) বা "গসাতুল" (ঘাসের পাতা) ইত্যাদিতে সেই বলিষ্ঠতা নেই, তার পরিবর্তে এসেছে পরাজয়ের মনোভাব ও তজ্জাত গ্লানিবোধ।

দোহ্ দাইন গুজারোবুম জোনুম মে লোব······
প্রেঠ কুনি তুব দিঠ গব কুর

(দিনের পর দিন ভেবেছি সবই আমার আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে কিন্তু চোর এসে সব নিয়ে পালিয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু এক তাল বরফ)।'

ইয়থ বাসাতুলিস গঈ ম্যায়নে ওয়ানন ক্রেছার হেথপ্রাওয়ান আপাজাঈতেহ্। এই ঘাসের পাতাটিরও আমার মত কত পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ ঝড়বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের পাতাগুলি যেমন নির্জীব হয়ে যায়, তেমনি নানা দুঃখে প্রবঞ্চনায় আমারও শোচনীয় অবস্থা)।

ফরহাদ জিলানীর কাছে যুগের অবক্ষয় ব্যক্তিসত্তায় সঞ্চারিত হচ্ছে: সেতি নো ওয়েন টিম আয় ওয়ক্তন হায়বে বদলার্দ রাগ রঙ্গ (সময়ের রং প্রতিনিয়ত বদলায়, মানুষও আগের মত নেই। আমার মধুর যৌবনের শক্ত গাঁথুনি এই বুঝি ভেঙে পড়ল)।

আবদুল আহাদ ফরহাদ ডাল হ্রদের উপর সূর্যাস্ত দেখে মনে করেন কসাইখানায় তাঁর গলাটা কারা যেন আধখানা কেটে দিয়েছে আর তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়চ্ছেন, চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে পড়ছে। নিজের জীবনের ভার আর বইতে পারছেন না (শাম)। বশির বদগামী মনে করছেন তাঁর অস্তিত্বই আজ বিপন্ন, অন্তরে দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে (মাথ)। মশালে সুলতানপুরী উপাসনালয়ে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে বৃথাই মাথা কুটেছেন বলে অনুতাপ করছেন। চমনলাল চমনের মতে ঘৃণা, হিংস্রতা ক্রমবর্ধমান হয়ে মানুষকে বিষধর সর্পের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। মহিউদ্দীন গওহর তাঁর স্রষ্টার কাছে এই বলে অভিযোগ পেশ করছেন স্রষ্টা তাঁকে বিনা উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। রঘুনাথ কোস্তুর জীবনে প্রেমের সন্ধান পান নি। প্রেমকাতর কবি যন্ত্রণা বঞ্চনায় আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত:

শরতে প্রতি বছর বসন্তের প্রতীক্ষা করি
শীতগ্রীষ্মের দোলায় দুলে কেমন করে বাঁচি?
বুকের রক্তে বাগান সেঁচে নিঃস্ব হলাম আজ
এত করেও ছলচাতুরি রোখাই হ'ল দায়।

জীবনভর তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাঁকে বাঁচার কঠোর মন্ত্র শিখিয়ে দেয়:

চোখের জলে বসন ধুয়ে নাও
সময় ভাল নয়,—
এরই মধ্যে কোন মতে বেঁচে থাকতে হবে।

তাই বলে কবি বেদনায় ভেঙে পড়তে রাজী নন। তিনি পরম

আশাবাদী, তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস অন্ধকার কেটে গিয়ে আসবে সূর্য-সোনালী দিন—

যত খুশি আমায় বকতে পারো।
যত খুশি পথে ছড়াও কাঁটা।
থামবে নাতো আমার পথ চলা।
হৃদয় আমার অনেক গভীর সমুদ্দুরের মত
অন্ধকার জেনো।
থাকবে না চিরদিন।

মধুর ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই তিনি নিজের প্রতি আস্থা ফিরে পান, প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পান ঈশ্বরকে —

বসন্তেরই গোলাপ দেখে হঠাৎ মনে হল
গোলাপ হ'য়ে থরে থরে তুমিই ফুটে আছো।

"মাস মোদোর" (সুগন্ধি বাতাস) কোস্তুরের বিশিষ্ট কবিতা-সংকলন। মাহজুবা ফাতিমা প্রশ্ন করেছেন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে কি লাভ? আবদুল আজিজ সাহির সেই সব পাখির কথা ভুলতে পারেন না যাদের পাখা গরমে ঝলসে যায়, ভুলতে পারেন না সেই সব মুখের কথা যে সব মুখ চরম শীতে জমে বরফ হয়ে যায়। -বাসুদেব রেহ্ আধুনিক কবিদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি শাশ্বত প্রাচীন মূল্য-বোধে আস্থা হারান নি।

শম্ভু মিত্র

Regd. with the
Registrar of Newspapers
for India. 8571/57